অমৃতা

বাণী বসু

অমৃতা

বাণী বসু

অমৃতা

....

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

Click here

ঠিক বেরোতে যাচ্ছে, আজকে ফার্স্ট আওয়ারেই ক্লাস আছে, এমন সময়ে ফোনটা বাজল, শ্বশুর ফোনটা ধরেছিলেন, চেঁচিয়ে বললেন—আবার তোমার বন্ধু, অমৃতা।

'আবার'টা উনি কেন বললেন অমৃতা বুঝতে পারল না। আজকে তো তার কোনও বন্ধু এর আগে ফোন করেনি! এ বাড়িতে এখন সবচেয়ে বেশি ফোন অবশ্য তারই আসে। খুব স্বাভাবিক। কলেজ ইউনিভার্সিটি ধরলে অনেক বন্ধু তার। সকলেই যে এক পর্যায়ের তা নয়। খুব ঘনিষ্ঠ, খানিকটা ঘনিষ্ঠ, পড়াশোনার সূত্রে বন্ধু, গানবাজনার সূত্রে বন্ধু... এইরকম অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে। তারা ফোন করে, করবেই। অমৃতা বেশিক্ষণ কথা না বলে বুঝিয়ে দেয় আগে যেমন ফোনটাকে একটা গল্প করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত তারা, এখন আর তা চলবে না, চলে না, কিন্তু প্রাণ ধরে কিছুতেই কথাটা সোজাসুজি বলে দিতে পারে না সে কাউকে।

শ্বশুরমশাই অদূরে বসে কাগজ পড়ছেন। রিটায়ার্ড মানুষ। সারাদিন ধরে শুধু খবরের কাগজই পড়েন, উল্টে পাল্টে, পাল্টে উল্টে। দুপুরবেলা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সন্ধেবেলায় অমৃতা চা নিয়ে যেতে হন্তদন্ত হয়ে বললেন—'কাগজটা, কাগজটা অমৃতা! কাগজটা কোথায় গেল?' আচ্ছা, অমৃতা তো দশটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, ঢুকছে এই পাঁচটায়। সে কী করে জানবে কাগজটা কোথায়! উনি কখনও খাবার টেবিলে পড়েছেন, কখনও বসার ঘরে পড়েছেন, কখনও শোবার ঘরে। অমৃতা সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে, আর উনি বলতে থাকেন—'পার্সপেকটিভটা পড়া হয়নি, কড়চাটাও বাদ পড়ে গেছে, এ হে হে, আজ সেন্টারস্প্রেডে সুনন্দ সান্যালের লেখাটার কনক্লুশন হল। দুটো মিলিয়ে না পড়লে...' যেন কাগজগুলো এইটুকু বাড়ি থেকে একেবারে ছুঁ-মন্তরে উড়ে গেছে।

কাগজটা শেষে বাথরুম থেকে পাওয়া যায়। রাজা-উজিররা বাথরুমে বই পড়তেন, বা রইস নেতা ব্যক্তিরা এখনও পড়ে থাকেন এমন কথা অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু তার শ্বশুরমশাই অনুকূল গোস্বামী যদি তাঁদের চার বাই আট সরু লম্বা টয়লেটে কমোডের পেছনে সিসটার্নে কাগজটা রেখে আসেন, তাহলে ধরে নিতে হয় তিনিও বাথরুমে কাগজ পড়ে থাকেন। হোক সে জায়গাটা অপরিসর। পড়াশোনার ব্যবস্থা সেখানে না-ই থাক।

কাগজটা নিতে সে সময়ে কেমন একটু গা ঘিন ঘিন করে অমৃতার। অপরিষ্কার কিছু নয়। তাকে নিজেকেই চানের আগে দুটো বাথরুম ধুতে হয়। কিন্তু একটু পুরনো হতেই কমোড, সিসটার্ন, বেসিন সব কিছুতেই একটা বিবর্ণ ভাব এসে গেছে। মানুষের মল-মূত্রের কথাই কেন কে জানে তার মনে পড়ে যায় বারবার। তার বাবার যখন পা ভেঙেছিল, বাবাকে সে বেডপ্যান দিয়েছে, সামান্য একটু ঘেন্না কি আর করেনি? কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ছিল বাবার জন্য দুশ্চিন্তা, যত্ন এবং সেবা করার আগ্রহ, ঠিক সেই ভাবটা শ্বশুরবাড়ির টয়লেট এবং শ্বশুর-শাশুড়ির মলমূত্র সম্পর্কে তার নেই, এটা বুঝতে পেরে একটু লজ্জাবোধ সে করে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ঘেন্নাটাকে আটকাতে পারে না। তবে, সেটা সে বুঝতে দেয় না। ঘেন্নাটাকে জয় করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে অনলস। বাথরুম পরিষ্কার করার সময়ে, চান করে রাঁধতে রাঁধতে সেখান থেকে কাগজ আনবার সময়েও।—কে ফোন করল এখন?

—হা লো—

—অমৃতা, আমি রে! আজ তোর ছুটি কটায়?—শম্পার গলা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে শুনলে চিনতে পারবে সে।

—সওয়া চারটে—শ্বশুরের দিকে আড়চোখে চেয়ে সে বলে।

—ইস্‌স্‌, দশটা থেকে চারটে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিস না ফ্যাক্টরিতে দিনমজুরি করছিস রে!

—ওই কাছাকাছিই হল।

—এত কাঠ-কাঠ করে কথা বলছিস কেন রে? হাতের কাছেই কেউ আছেন বুঝি?

—হু।

—আমাকে আড়াইটে নাগাদ একটু সময় দিতে পারবি?

—হুঁ।

—আবার হু!

—ঠিক আছে, ছাড়ছি—রিসিভারটা রেখে দিল অমৃতা।

তার আসলে আড়াইটেতে ছুটিই আজ। শম্পাকে সময় দিতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে সে ছুটির সময়টা জানায় না। এইটুকু, সারাদিনে এইটুকু সময় সে চুরি করে।

—বাবা আসছি—চটির স্ট্র্যাপে পা গলাতে গলাতে সে বলে। শ্বশুরমশাই ওরই মধ্যে একবার খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে নেন। তিনটে বড় বড় ক্যাসেরোলে ওঁর আর শাশুড়ির দুপুরবেলার খাবার-দাবার গুছিয়ে রেখেছে অমৃতা। টেবিলের ওপর টেবল ক্লথ, তার ওপরে ম্যাট পাতা, সেখানে কাচের প্লেট উপুড় করে রাখা, একটা করে কাচের বাটি। দুটো হাতা ও চামচও পাশে রেখে দিয়েছে সে।

দশটার ক্লাসটা বোধহয় গেল। এগারোটারটা করতেই হবে, জে. বি.-র ক্লাস না করলে, এত কম সময় পড়াশোনা করে, অর্থাৎ এত ফাঁকি দিয়ে এম. এ.-টা টপকাতে পারবে না সে। অথচ, টপকানো দরকার, ভী-ষণ দরকার।

ঠিক পুকুরের ধারে নিমগাছটায় ফুল এসেছে। সাদা সাদা গুঁড়ির মতন। একটা মৃদু গন্ধ পেয়ে মুখ তুলেছিল। দেখতে পেল। এখন যদি যাদবপুর-হাওড়া মিনিটা ধরতে পারে তাহলে ভাল হয়। সোজা এসপ্লানেড চলে যাবে, সেখান থেকে কলেজ স্ট্রিট। নইলে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অটো, তারপর চেঞ্জ করতে হবে। এখন আর নিমফুল-টুলে মন দিলে তার চলবে না। রাস্তা দিয়ে যে মানুষগুলো চলাফেরা করছে, খুব মড মেয়ে, মিনিস্কার্ট, কিংবা মডেলিশ চেহারার যুবক, শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় বা টিপ ধেবড়ে যাওয়া প্রৌঢ়া, এই সমস্ত দেখতে, সব কিছুর দিকে মন দিতে তার ভীষণ ভাল লাগে। মনে মনে গল্প ফাঁদে। ওই প্রৌঢ়া যাঁর সিঁদুর টিপ ধেবড়ে গেছে? উনি সিঁদুর-টিপ পরেছেন কেন? আজকাল তো সব্‌বাই পেছনে আঠা লাগানো বিন্দি পরে। উনি পরেছেন সিঁদুর-টিপ। অথচ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উনি অফিস যাচ্ছেন, ডালহাউসির টিকিট কাটলেন। অর্থাৎ বেশ আধুনিক। বেশিদিন একভাবে পরলে বিন্দির পেছনে চামড়ায় একটা দাগ হয়ে যায়। উনি বোধহয় এই দাগটাকে ভয় পান। আর তা নয় তো সিঁদুর-টিপ না পরলে বিবাহিতত্ব, সতীত্ব এ সব জাহির করা যাবে না মনে করেন। অনেকেই আজকাল কপাল থেকে সিঁদুর টানেন। এরকম মহিলা এখনও কত আছেন, প্রগতিশীলরা জানেনও না। কিংবা, এই সবচেয়ে সহজ সমাধানটাই তার মনে আসেনি। উনি হয়তো ভিতু মানুষ, কুসংস্কারও আছে, কিন্তু ওঁর একজন শাশুড়ি আছেন, শাশুড়ি ভিতু হোন বা না হোন আরও কুসংস্কারে ভর্তি। সেই সেকেলে শাশুড়িই ওঁকে সিঁদুর-টিপ পরতে বাধ্য করেছেন। ইস্‌স্‌, এখনও শাশুড়ির সর্দারি! কত বয়স হবে ভদ্রমহিলার। পঞ্চাশের এদিক ওদিক, ওঁর শাশুড়ি হয়তো ঠিক বাহাত্তর। বাহাত্তুরে। এম. এ.-টা পাশ, তারপর চাকরি, ব্যাস, তারপর তার শাশুড়ির খবরদারি থেকে সে মুক্তি খুঁজবে।

আর ওই যে মডেল চেহারার যুবক। শার্টের ওপরের বোতাম খোলা রেখেছে। ভেতরে ওর

বক্ষকেশ দেখা যাচ্ছে। এই যুবকটি ভেবেছে যেহেতু তার প্রকৃতিদত্ত গড়নটা আছে, এবং ব্যায়াম-ট্যায়াম করে সে তাকে আরও সংগঠিত করে তুলেছে, সেহেতু সে তার শার্টের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বোতাম খোলা রেখে বক্ষকেশের পৌরুষ যথাযথ দেখাতে পারলেই মেয়েরা সব একেবারে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠিক তার বর অরি, পুরো নাম অরিসূদন, যেমন ভাবে। তবু তো অরির এ যুবকটির মতো মুখশ্রী নেই। দেহখানা ভাল হলেও এমন সুসংগঠিতও নয় মোটেই। অরি ভাবে, পৃথিবীর যেখানে যত মেয়ে আছে, ওকে দেখলেই কাত হয়ে যাবে।

মিনিস্কার্ট পরা মেয়েটাকে অসহ্য লাগে অমৃতার। ও কী ভেবেছে কী। অতখানি পা বার করে রাখলে ওকে খুব সুন্দর লাগবে? সুন্দরও নয়, সেক্সি। এই এক হয়েছে আজকাল। সেদিন দোকানে গিয়েছিল। নিউমার্কেটে। বাচ্চাদের পোশাকের দোকানে দাঁড়িয়ে ও আর মিলি, ওর রমণী চ্যাটার্জি পাড়ার বন্ধু, এখন যাদবপুর পাড়ার বউ, মিলির ভাইঝির জন্মদিনে দেবার জন্যে একটা ফ্রক দেখছিল। পাশের ভদ্রমহিলা বললেন—দেখি দেখি। এরকম আর আছে?

দোকানি আর একটা ওরকম বার করে দিলে নিজের বছর চারেকের মেয়ের গায়ে ফেলে, অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে মহিলা বললেন—ওহ, ইটস নট সেক্সি এনাফ।

মিলিব এত রাগ হয়ে গেল যে ফ্রক ওরা আর কিনলই না। খেলনার দোকানে গিয়ে একটা পেল্লাই টেডি-বেয়ার কিনে ফেলল। টেডিটা আবার মিলির এত পছন্দ যে ও বলছে ওটা প্রাণ ধরে কাউকে সে দিতে পারবে কি না সন্দেহ। আজকাল এখানেই চমৎকার চমৎকার সফ্‌ট টয় তৈরি হচ্ছে।

মেয়েটা ছোট স্টেপ কেটেছে চুলে। ওপরের টপটা ওর ঢিলে। কিন্তু স্কার্টটা হাঁটুর ওপর। সবাই তাকাচ্ছে। এই গড়িয়াহাট পাড়াতেও। সবচেয়ে আধুনিক পাড়া বলে যার নাম। চাউনিতে ঠিক যে কোনও লোভ আছে তা নয়। যেটা আছে তাকে বলে ডিসগাস্ট, ছেলেগুলো বোধহয় মনে-মনে মজা পাচ্ছে। মুখে কিছু জানতে দিচ্ছে না। শি ডাজ্‌ন্‌ট নো শি হ্যাজ মেড হারসেল্‌ফ এ পিস অফ এগজিবিট। আচ্ছা ওর কি মা নেই? যিনি ওকে বলে দেবেন, এটা কলকাতা, কলকাতা এখনও লস এঞ্জেলেস নয়, এবং কলকাতার অফিস-টাইমের রাস্তা, ডিসকোথেকও নয়, চ্যানেল ফাইভও নয়। ওর মা নিশ্চয়ই তার শাশুড়ির মতো, যিনি তাঁর দুই বাচ্চার মা মেয়ের বেলায় একেবারে অন্ধ। মেয়ে যখন পিঠ-খোলা, হল্টার ছাঁট ব্লাউজ পরে ঘোরে কিছুই বলেন না, কিন্তু তার বেলায় সালোয়ার-কামিজ পরাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

কী সুন্দর সালোয়ার-কামিজগুলো সে করিয়েছিল বিয়ের আগে। কালো জর্জেটের ওপর মেটে লাল কারুকাজেরটা পরেই তো সে অরিসূদনের সঙ্গে আলাদা সাক্ষাৎকারে গিয়েছিল বালিগঞ্জ কোয়ালিটিতে। শ্বশুর-শাশুড়ি যেদিন দেখতে আসেন সেদিন ঘটনাচক্রেই একটা নীল টাঙ্গাইল পরে ছিল। ওরা তো জানত না ওঁরা আসবেন। অতর্কিতে এসে তাকে প্রসাধন-বিনা দেখতে চেয়েছিলেন নাকি। ইস্‌স্‌ সেদিন যদি সে একটা স্কার্ট পরে থাকত। তখন নাকি ওঁদের ওকে খুব পছন্দ হয়েছিল। এখন আর পছন্দ হয় না বোধহয়।

ইস্‌স—যাই-ই দেখুক, যাই-ই ভাবুক, যত দূরেই যাক—সেই শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-বর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে তার মনে। কত ছোট্ট হয়ে গেছে তার পৃথিবীটা, কত ছোট হয়ে গেছে তার জীবন, মনও কী!

বাসটা খুব স্পিডে এসেছে। এমন স্পিডে আসছিল এক এক সময়ে যে ভয় করছিল, বাসটা আবার না খবর হয়ে যায়। সেইসঙ্গে তার সহযাত্রীরা এবং সে-ও। আজকাল এরকম আকছার ঘটছে। স্টপে এসে থামতে, কী শান্তি। কী মুক্তি। পুরনো আকাঙ্ক্ষাগুলো ফিরে আসতে থাকে হুড় হুড় করে। সেই পরিচিত, চিরপরিচিত কলেজ স্কোয়ার, সেন্টিনারি বিল্ডিং, বিধ্বস্ত দর্শন আশুতোষ বিল্ডিং এক ঝলক, অমৃতা ছুটতে লাগল, মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে, জে. বি. নিশ্চয়ই ঢুকতে দেবেন। দৌড়তে দৌড়তে, সত্যিকার গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ক্লাসে ঢুকল সে।

—আসতে পারি, ম্যায়াম?

—এসে তো পড়েইছ, আর অনুমতির দরকার কী!

ক্লাসসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। যাক্ বাবা, মজার ওপর দিয়ে গেছে। জে. বি. মোটেই সবদিনে এরকম মুড-এ থাকেন না। এ নিয়ে ক্লাসে প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

—দ্যাখ, এ. আর. রাগী মানুষ এটা আমরা জেনে গেছি। চোখ সব সময়ে রাগে গোল গোল হয়ে থাকে। পি. এম. আবার বড্ড হাসি-খুশি, হাসকুটে বললেই হয়। একটা কোনও মজার উপলক্ষ পেলে সেটাকে আর ছাড়তে চান না। তখন চুলোয় যাক মঙ্গলকাব্য, ক্লাসে খালি হাসির হর্‌রা ওঠে, কিন্তু জে. বি. যে কখন কী রঙে থাকবেন সেটা কেউ বলতে পারবে না। এমন কেন রে উনি? এই ঝড় এই বাঁশি। এই আগুন এই জল! বুঝি না বাবা।

অমৃতা কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা বোঝে। এগুলো প্রোফেসর জে. বি.-র পেছনে যে সংসারী জে. বি. আছেন, তাঁর সেই বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতার উপচোনি, যাকে বলে লেফ্‌ট-ওভার। যেদিন সকালে সকালে কিছুর জন্য কিছু না বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়, কি শাশুড়ি কি শ্বশুরের সঙ্গে একচোট সেদিন জে. বি. বিরক্ত হয়ে থাকেন। ভীষণ দায়িত্বশীল টিচার তাই লেকচারের ওপর সে সবের বিশেষ প্রভাব পড়ে না, কিন্তু লেকচারের বাইরে যেটুকু অবকাশ, সেখানে পড়ে। এগুলো যে জে. বি. তাকে ডেকে বলেছেন তা নয়। কিন্তু সে জানে। নিশ্চিত জানে।

এ কথা অমৃত যদি বন্ধুদের, মানে সহপাঠীদের বলে ওরা রৈ রৈ করে উঠবে একেবারে।

—প্রবলেম সবাইকার আছে অমৃতা, তার মানে এই নয় যে বাড়ির ঝালটা তুমি ক্লাসে ঝাড়বে।

'প্রবলেম সবাইকার আছে' এটা একটা কথার কথা হয়ে গেছে আজকাল। কেউ বুঝে বলে না, অনুভব করে বলে না। কী অভিজ্ঞতা আছে ওদের? কতটুকু? বাস্তবের কী জানে ওরা?

শর্মিষ্ঠার প্রবলেম কী? না ওর মা-বাবা চান ও দারুণ রেজাল্ট করে, রিসার্চ-টিসার্চ করে একটা অধ্যাপিকা-টিকা হোক, মা-বাবার এই চাওয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার চাওয়া একদম মেলে না। শর্মিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে স্রেফ আড্ডা দেবার জন্য। অধ্যাপিকা হয়ে সারাজীবন পড়াশোনা করা আর পড়ানো?—ওরে বাবা। তার চেয়ে কলেজ স্কোয়ারে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করাও ভাল—ও বলে থাকে।

কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে ও বরাবর ভাল রেজাল্টটাও করে যাচ্ছে। ও এই ব্যাপারটা নাকি বাবা-মাকে বোঝাতে পারে না।

তিলকের কী প্রবলেম? না এত বড় ক্লাসে মাত্র নটি ছেলের অন্যতম ও। ওর বন্ধুরা যখন ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস এই সব পড়ছে, তখন ওকে বাংলার মতো একটা রদ্দি সাবজেক্ট পড়তে হচ্ছে। রদ্দি কেন রে? তুই জে. বি.-র ক্লাস, এ. কে. বি.-র ক্লাস, এ. আর.-এর ক্লাস উপভোগ করিস না? ভাল লাগে না তোর রবীন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে পড়তে? ভাল লাগে না আধুনিক কবিতা বুঝে নেবার সুযোগ? —হ্যাঁ, লাগে, ভালই এনজয় করে, কিন্তু কোনও প্রসপেক্ট তো নেই! ভবিষ্যতে কী হবে এই ভাবনায়, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়ে-ক্লাসে পড়তে বাধ্য হবার কমপ্লেক্সেই ছেলেটা মুখ শুকিয়ে থেকে থেকে নিজের মনের ওপর অহেতুক চাপ বাড়াচ্ছে।

অনিন্দিতার প্রবলেম তো আর এক। ওর দিদিকে ওর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর, তাই লেখাপড়ায় তাকে ওর ছাড়িয়ে যেতেই হবে। বোঝো? এটা একটা প্রবলেম হল? দিদিটা তো তোরই, না কী!

অমৃতার একেক সময় মনে হয় নিজের দিনরাতগুলো সে ওদের ধার দেয়। ওই অনিন্দিতাকে, ওই তিলককে, শর্মিষ্ঠাকে, রণিতাকে, চঞ্চলকে। ধার দেয় অন্তত একটা সপ্তাহের জন্য। তখন হয়তো বাস্তব সত্যি সত্যি কী, ধারণা ওদের হবে।

আপাতত কল্লোল যুগ এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং জগদীশ গুপ্ত। অমৃতা ক্লাসে মন দেয়।

বেল বাজল, ক্লাস শেষ হচ্ছে। জয়িতাদি অর্থাৎ জে. বি. হঠাৎ বললেন—অমৃতা ব্যানার্জি।

—হ্যাঁ—সে উঠে দাঁড়াল, বাধ্য বিনীত মেয়ের মতো।

—আজ তিনটের সময়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার। সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে থাকব।

সর্বনাশ! আবার দেখা-টেখা করতে বলেন কেন রে বাবা! বন্ধুরা বলতে লাগল—তোর ব্যাপারই আলাদা অমৃতা, তুই জয়িতাদির চোখে পড়ে গেছিস। এখন রোটেশন-এ উনিই হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট। তোর ফার্স্টক্লাস বাঁধা...

বিরক্ত অমৃতা যতই ওদের মন্তব্যগুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে, ততই ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকে ওরা।

তিলক বলল—অধমের দিকে একটু কৃপাবর্ষণ করিস রে অমৃতা, একেই তো স্কুলমাস্টারি ছাড়া আর কিছু জুটবে বলে মনে হচ্ছে না।

অমৃতা রেগে-মেগে বলল—স্কুলমাস্টারি তোর মতো ছেলেদের না জোটাই উচিত। তাগড়া স্বাস্থ্য কর দিকি, রিকশ কি অটো চালাবি এখন, বেশ পুরুষালি কাজ। অন্তত নাকে কাঁদবার সময়টা পাবি না।

অমৃতার বাবা স্কুল-টিচার। স্কুল-টিচিং নিয়ে এসব কথা বললে ওর গায়ে লাগে। তিলকের মতো বা অনিন্দিতার মতো ও কমপ্লেক্সে ভোগে না। উচিত জবাব দেয়।

আজকে অর্থাৎ দুটো অ্যাপো। আড়াইটের সময়ে শম্পা, শম্পাকে সাধারণত ক্যানটিনেই দেখা করতে বলে ও। তো তারপর ছুটতে হবে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। খুঁজে বার করতে হবে জয়িতাদিকে। কেন ডেকেছেন কে জানে বাবা! বুকটা গুরগুর করছে। শম্পা আবার কথা শুরু করলে থামতে জানে না। কোথাও কমা, ফুল স্টপ নেই ওর। কথার সূত্রে কথা, তার সূত্রে আরও কথা, আর কাউকে কিছু বলতেই দেবে না ও। অর্থাৎ ফার্স্ট থিং ওকে আজ বলতে হবে,—শম্পা আমার সময় নেই, তিনটের সময়ে জয়িতাদি ডেকেছেন। মাস্টারমশাই, বুঝিস তো?

চৈত্র শেষ হলেও দিনটা বেশ ফুরফুরে আজ। হাওয়া-টাওয়া দিচ্ছে। দুটোয় ছুটি হতে ওরা সবাই কফিহাউজ যাচ্ছে, তুমুল আড্ডা হবে সেখানে, যে যার পকেট থেকে ব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা বার করবে। মোগলাই আসবে, পকোড়া আসবে, কফি তো আছেই। ইংরেজির তিশান ছেলেটা আসলে আরও জমবে। তিশান হচ্ছে একটি সবজান্তা হামবড়া ছেলে। ভীষণ আঁতেল-আঁতেল ভাব করে। তো আঁতেলমিটাও তো কোথাও না কোথাও ফলাতে হবে। তিশান খুব সম্ভব এই তাদের গ্রুপটাকে সে জন্য বেছে নিয়েছে। তিশানের আসল নাম নিশান। এ হচ্ছে আর্ট বিষয়ে অথরিটি। সব জানে। প্রি-র‍্যাফেলাইট, ইমপ্রেশনিস্ট, পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম, সুররিয়্যালিজম, ডাডাইজম স-ব। তা ও 'তিশান-তিশান' করত, অমৃতাই একদিন জিজ্ঞেস করে তিশান কে রে? কোন দেশের? কবেকার? তখনই বোঝা যায় ওরা যাকে টিশিয়ান বলে জানে তাঁর নামের আসল উচ্চারণ নাকি তিশান। ওরা যাকে জিয়োতো বলে, তাঁর নামটা উচ্চারিত হবে জত্তো। র‍্যাফায়েল নয়, র‍্যাফেইল। ওদের মুখে 'গয়া' শুনে তো নিশান বাঁকা হেসে মুখে একটার পর একটা মৌরি ফেলতেই লাগল, ফেলতেই লাগল, শেষে বলল—শুধু গয়া বলছিস কেন? 'গয়াগঙ্গাপ্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী মথুরা' সবগুলো বল। গয়া নাকি উচ্চারণ নয়। ওটা হবে 'গোইয়া'। তো সেই সূত্রেই শর্মিষ্ঠা ওর নাম দেয় তিশান। সেই তিশান আসলে আড্ডাটা ভাল জমে ওঠে। পারস্পরিক ঠাট্টায়, কথার পরে কথার খেলায়, তিশান তাদের যে জ্ঞান দান করে সেগুলোও নেহাত ফ্যালনা নয় : ভার্জিনিয়া উল্‌ফ নাকি একটা করে উপন্যাস লিখতেন আর পাগল হয়ে যেতেন, লরেন্স নাকি ভেগেছিলেন তাঁর নিজের মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে, শুধু অসকার ওয়াইল্ড নয়, ফরস্টার সাহেবও ছিলেন সমকামী, শেলির প্রথম বউ নাকি শেলির অবহেলায় বারনারী হয়ে গিয়েছিলেন...এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি কি পাগলামি না থাকলে না কি কোনওরকমের শিল্পীই হওয়া যায় না। সে যাক, আজ হয়তো তিশানের সঙ্গে ওদের খুব

জমবে, কিছুটা সময় তরলভাবে কাটতে পারত, কিন্তু অমৃতার তা কপালে নেই। শম্পা তার স্কুলের সময়কার বন্ধু। চিরকালই দুজনে যত ঝগড়া, তত ভাব। শম্পার ধারণা, অমৃতা হল যাকে বলে 'লাকি'। সেই জন্যেই বরাবর অমৃতার রেজাল্ট শম্পার চেয়ে ভাল, সেইজন্যেই অমৃতার মা-বাবা দুজনেই জীবিত, এবং সেইজন্যেই অমৃতার এত অল্পবয়সে অত ভাল বিয়ে হয়েছে। শম্পা চিরকালের 'আনলাকি'। বিধাতাপুরুষ আঁতুড় ঘরেই তার কপালে ট্যাঁড়া দিয়ে রেখেছেন তাই তার অল্পবয়সে বাবা মারা যান, তাই তার মামারা তাকে দেখে না, মাকে চাকরি করতে এবং ভীষণ ভুগতে হয়, তাই-ই শম্পা কালো, তাকে দেখতে ভাল না, অমৃতার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও তাই-ই তার রেজাল্ট অমৃতার চেয়ে খারাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে সম্পর্কটা ঈর্ষার। ইচ্ছে করলে অমৃতাও শম্পাকে হিংসা করতে পারত ঠিক যে যে কারণে শম্পা তাকে হিংসে করছে সেই সেই কারণেই। শম্পার মা চাকরি করেন বলে অমৃতার মায়ের থেকে তিনি অনেক বাস্তববোধসম্পন্ন, কাণ্ডজ্ঞান তাঁর অনেক বেশি, স্বাধীন ইচ্ছার মানুষ। শম্পা কালো বলেই তার চেহারার শ্রীটুকু চট করে চোখে পড়ে না, না হলে হয়তো অমৃতার মতোই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। অমৃতার যেমন ভাষাজ্ঞান, সাহিত্য-জ্ঞান ভাল, শম্পার যে তেমন অঙ্কের মাথা অনেক ভাল, যে কারণে সে বি.এসসি করেই কম্পুটার ট্রেনিং নিয়ে মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করতে পারছে। সেও তার ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবে। শম্পা জানে না অমৃতার তুলনায় সে কত বেশি ভাগ্যবতী। একমাত্র দুর্ভাগ্য তার বাবার অল্পবয়সে মারা যাওয়াটা। সেটা মানতেই হয়। কিন্তু, অমৃতা জানে এসব কথা সে শম্পাকে বোঝাতে পারবে না। কখনও না।

ওই তো আশুতোষ বিল্ডিং-এর গেট দিয়ে শম্পা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। একটা হালকা রঙের ছাপা সালোয়ার কামিজ আর একটা পরিষ্কার বিনুনিতে শম্পাকে কত হালকা কত সুশ্রী, নির্ভার, স্বাধীন সুন্দর দেখাচ্ছে তা যদি ও জানত!

—অমৃতা, বাঃ এই তো তুই পাংচুয়ালি এসে গেছিস। চল কফিহাউজে যাই।

—না রে আমাকে আজকে প্রোফেসর বাগচি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে তিনটের সময়ে যেতে ডেকেছেন। তোর কী বলবার আছে তুই তাড়াতাড়ি বল বরং। আমরা একটু ওইদিকে দ্বারভাঙার সিঁড়িতে বসি চল।

—এত তাড়া করলে হয়? এভাবে কিছু বলা যায়? আমি, তুই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস প্রতিদিন...

এ নালিশও শম্পার বহুদিনের। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। অমৃতা বলল—কী করব বল, প্রোফেসর ডেকেছেন, না করতে তো আর পারি না। তুই বল না। আমি শুনছি। শুধু একটু ছোট করে বল। তোর নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কথা আছে।

—জরুরি, বলে জরুরি। শম্পা মুরুব্বির মতো হাত আর কান নেড়ে বলে। কানে খুব বড় সাইজের রিং পরেছে ও। ওর মুখের পক্ষে অনেক বড়। কিন্তু রিংগুলো ওর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলতেই অদ্ভুত ভাল লাগে ওকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অমৃতা মনে মনে গেয়ে ওঠে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' গানটা যে কবে গলা থেকে মনে চলে গেছে ও টের পায়নি। এখন যেন আর গানের দিন নেই।

—তোকে একটা কথা বলিনি অমৃতা, প্লিজ কিছু মনে করিস না, আমার ইমিডিয়েট বস, অর্থাৎ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর বেশ কিছুদিন ধরে খুব মানে বেশ ইনট্রেস্ট দেখাচ্ছে আমার ওপর। তোর কী মনে হয়?

—আমার কী মনে হবে? সিচুয়েশন তোর, মনে হওয়াটাও তোর।

শম্পার চোখে অভিমান ঘনিয়ে আসে তক্ষুনি।

—কথাটা তোকে বলিনি, কারণ আমি খুব শিওর ছিলাম না। রাগ করছিস কেন?

—আরে! রাগ করিনি। কিন্তু আমি যে ভদ্রলোককে দেখলুম না, তোর সঙ্গে তাঁর ইনটার-অ্যাকশন দেখলুম না, কী করে আমার কিছু মনে হবে, বল!

—তোর সঙ্গে শিগগির একদিন আলাপ করিয়ে দেব, বুঝলি? খালি একটাই ভয় করে। তোর সঙ্গে আলাপ হলে হয়তো আর আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

অমৃতা উঠে দাঁড়াল, বলল—বাজে কথায় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই রে শম্পা। তোর কথা যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো এবার আমায় ছেড়ে দে।

তার হাত ধরে টানল শম্পা—কথা শেষ হয়নি, আসল কথাটা বলাই হয়নি। শোন প্লিজ। আমরা। মানে আমি আর ও, সৌমিত্র দাস, দু-চারটে সিনেমা একসঙ্গে দেখেছি, ওয়ালডর্ফে খেয়েছি কয়েকবার, এখন একটা উইক-এন্ড ও দিঘায় যেতে চাইছে আমাকে নিয়ে।

অমৃতা চমকে উঠল।

—ছেলেটা, মানে লোকটা কিন্তু ভীষণ ভাল। কোনওদিন একবার হাতটাও ধরেনি। ও বলছে আমাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ফাইন্যাল বোঝাপড়ার জন্যে অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। মা মত দিয়ে দিয়েছে। তুই কী বলিস!

অমৃতার চোখদুটোয় ক্রোধের জ্বালা। সে বলল—এটা যে অত্যন্ত অসম্মানজনক প্রস্তাব সেটা বোঝবার জন্যে তোর আমার কাছে আসতে হবে? শম্পা তুই দিনকে দিন অবোধ শিশু হয়ে যাচ্ছিস, না কী বল তো!

—শোন, আমি জানতুম তুই রাগ করবি। প্রস্তাবটা ওইরকম শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু সৌমিত্রকে দেখলে, জানলে তুই কথাটা বলবার আগে দুবার ভাবতিস। হি ইজ সো অনেস্ট অ্যান্ড অনারেব্‌ল। অফিসে ওর খুব নামডাক।

—সে যেমনই হোক, এটা যে 'তোর' পক্ষে অসম্মানজনক একটা প্রস্তাব, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তুই 'না' করে দিবি শম্পা।

—কিন্তু, কিন্তু তা হলে ও যদি বিয়ের প্রোপোজ্যালটা ফিরিয়ে নেয়?

—নিলে নেবে। শম্পা তোর বছর বাইশ বয়স হবে। এখনই কি তুই এমন অরক্ষণীয়া হয়ে গেলি যে তোকে বিয়ের জন্য একটা লোকের সঙ্গে উইক-এন্ড কাটাতে হবে?

—তোর বিয়ে হয়ে গেছে। তুই সেফ অ্যান্ড সিকিওর, তুই আমার কথাটা বুঝবি না ঠিক। কে আমার বিয়ে দেবে বল? বিনা যৌতুকে আমার মতন একটা কালো মেয়েকে কে-ই বা বিয়ে করবে?

—তুই পাগল হয়ে গেছিস শম্পা। তোর কথা শুনে আমার ছি ছি করতে ইচ্ছে করছে।

—তা তো করবেই। অমৃতা, তোর বিয়েতে মাসিমা মেসোমশাই কত ডাউরি দিয়েছিলেন, কী কী আইটেম আমি কিন্তু সব জানি।

রাগে জ্ঞান হারাল অমৃতা।

—তা তুই কি তা হলে ডাউরি নেই বলেই, সেই ছেলেটাকে বিয়ের আগে দুটো রাত উপহার দিতে চাইছিস?

—আর একটাও কথা তোর সঙ্গে আমি বলব না, শম্পা বলল।—তোদের ক্লাসকে আমার খুব জানা হয়ে গেছে। আরও জানা হয়ে গেল। তোরা সেই যাকে বলে না 'নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি' সেই। যা তুই ভাল মেয়ে তোর প্রোফেসরের কাছে নোটস নিগে যা। শুধু যাবার আগে একটা কথা শুনে যাস, যে সৌমিত্র দাসকে না দেখেই চূড়ান্ত একটা অপমানকর মত দিয়ে দিলি সে মানে হি ইজ এ পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান, তোর বরের মতো এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার না হতে পারে, কিন্তু ওর লাইনে ও-ও বহু দূর পর্যন্ত উঠবে, উঠবে, উঠবে।

শম্পা রাগে গরগর করতে করতে উড়ুনিটা উড়িয়ে, কানের রিং দুলিয়ে চলে গেল।

একটা অনেক কষ্টে তৈরি করা শান্ত দুপুর ভেঙে খান খান হয়ে গেল। যাঃ। সে-ই একমাত্র জানে কত সাবধানে, নিজের সমস্ত শক্তি কতখানি প্রয়োগ করে তবে এইরকম একটা শান্ত দুপুরে পৌঁছনো যায়। এখনও চারিদিকে স্তব্ধতার তরঙ্গ। আড্ডা-পিয়াসীরা ক্যান্টিনে কিংবা কফিহাউজে, পড়ুয়ারা ক্লাসে। একজন বৃদ্ধমতো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছেন।—মা, অফিসটা কোথায় বলতে পারো?

—অফিস তো একটা না! আপনি কী কাজে এসেছেন বলুন।

—এই একটা রিভিউয়ের অ্যাপিল জমা দেওয়া হয়েছিল, ছেলের বি.এ. পরীক্ষার।

ঠিক উইন্ডোটাতে ওঁকে নিয়ে গেল অমৃতা। ফেরবার সময়ে আবার সেই অনর্থক চিন্তা তাকে খোঁচাতে লাগল। এই ভদ্রলোকের ছেলে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে? এঁর তো নাতির বি.এ. দেবার কথা। অদ্ভুত তো, ভদ্রলোকের শেষ বয়সের ছেলে বোধহয়, হঠাৎ হওয়া, তখনও কি নিরোধ-টিরোধ বেরোয়নি? আবার দেখো মজা, ছেলে নিজে আসেনি, বাবাকে পাঠিয়েছে। নাতিপ্রতিম ছেলের প্রতি হয়তো ভদ্রলোকের ভীষণ মায়া। আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন একেবারে। এ ছেলের কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হবে না।

সে-ও তো বাবা-মা-র একমাত্র সন্তান। খুবই আদরের। কিন্তু জীবনকে মুখোমুখি একটা লড়াই দেবার চেষ্টা তো সে করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে নিরন্তর। মা অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। অনেক কিছুই নিজের হাতে করে নিতে অভ্যস্ত সে। নিজের ইউনিফর্ম বরাবর নিজে কেচে পরেছে। পি.টি-র জন্য কেডস-এ চক লাগানো, নিজের টিফিনটা গুছিয়ে নেওয়া, বাবাকে সময়মতো চা বা অন্য কোনও স্বাস্থ্য-পানীয় দিয়ে আসা, লোক না আসলে বাসন-টাসন মেজে নেওয়া। কোনওদিন এসব কাউকে বলতে যায়নি সে। কোনও নালিশও ছিল না—কে জানে তার ভাগ্যবিধাতা এইভাবেই তাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন কি না।

এই সময়ে সেন্টিনারি বিল্ডিং-এর দিকে যেতে দেখল সে জয়িতা ম্যাডামকে। উনিও তাকে দেখতে পেয়েছেন। দাঁড়িয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সে—আমি আসছি ম্যাডাম। উনি বললেন—ঠিক আছে লাইব্রেরিতে আর আসতে হবে না। আমার তোমাকে একটা ছোট্ট কথা বলার ছিল। সেটা বলেই ছেড়ে দেব। বলছিলাম—রোজ অত লেট করো কেন? থাকো কোথায়?

—যাদবপুর। মানে যাদবপুরের কাছে।

—দূর, মানছি। কিন্তু দূরত্বটা যখনই হয়ে গেছে তখন তো সময় হাতে নিয়েই বেরোতে পারো।

—না, ম্যাডাম, আসলে...

—অন্য কিছু না। তোমরা ভাল ছাত্রীরা, ভাল মেয়েরা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাও এটা আমার ভাল লাগে না। অমৃতা, দুটো যদি না পেরে ওঠো, তা হলে একটাই চুজ করে নাও। স্বামীসঙ্গ বা লেখাপড়া। দুটো একসঙ্গে হয় না।

জয়িতাদি লিফ্‌টে উঠে চলে গেলেন। অমৃতা সেখানেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রোধ, নিজের ওপর, ম্যাডামের ওপর, তারপর নিদারুণ দুঃখ, নিজের জন্য, বাবার জন্য, মায়ের জন্য, তার পরে আবার ক্রোধ, নিজের ওপর, সম্পূর্ণ নিজের ওপর, একটা কথাও স্বপক্ষে বলতে পারল না বলে। ওই যে ছোট করে চুল ছাঁটা, ঈষৎ চৌকো মুখের আধা-ফর্সা, ভীষণ ব্যক্তিত্বঅলা মহিলা, যিনি এখন সম্ভবত তাদের ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে সমর্থ, সবচেয়ে আন্তরিক শিক্ষক, আসেন নিজস্ব একটা সাদা মারুতি এইট হানড্রেড নিজে চালিয়ে, উনি কী জানেন, কতটা জানেন, তার মতো একটি প্রায়ই-লেট ছাত্রীর জীবন সম্পর্কে? কী বোঝেন? যদি না-ই জানেন এবং না-ই বোঝেন তো কড়া-কড়া মন্তব্য করেন কেন? যেন উনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে অমৃতা স্বামীর অফিস যাবার সময়ে দীর্ঘক্ষণ তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। কিংবা স্বামীর আহ্বানে তার অফিসে যাবার

আগেই একবার...। সিঁথির মধ্যে সরু সিঁদুরের রেখা দেখেই উনি সব বুঝে নিলেন? বাঃ।

উনি কেমন করে জানবেন তার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির একটি কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য লোকটিরও আসার কোনও ঠিক নেই। আসবে না এই ভয়ে সাত সকালেই তাকে তিনখানা ঘর আর খাবার-জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে রাখতে হয়। শ্বশুর রিটায়ার্ড, কোনখানটা ঝাড়া ভাল হল না, কোন জায়গাটা ঝাঁট পড়ল না এসব ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য সে সময়ে তিনি হাজির থাকেন। শাশুড়ি স্কুলে চাকরি করেন। ভোর সাড়ে ছটায় আরম্ভ। তার আগে উঠে তাঁকে চা-জলখাবার তৈরি করে দেওয়া তার কর্তব্য। তার পরে শ্বশুর। তার স্বামী আর সে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে বলে চা আর বিস্কুট ছাড়া আর কিছু খায় না সকালে। তার পরেই তাড়াতাড়ি চান সেরে তাকে দুটো গ্যাস জ্বালিয়ে সংসারের রান্না শেষ করে, ঠিক নটায় স্বামীকে খেতে দিতে হয়। তিন-চারখানা ক্যাসেরোলে বাকি দুজনের খাবার ঠিক করে রাখতে হয়, এতসব করে, রান্নাঘর ঝকঝকে করে মুছে অনেক সময়ে তার নিজের খাবার সময়ই থাকে না, কোনক্রমে কয়েক দলা ভাত গলার ভেতর পাঠিয়ে সে যেমন আছে তেমন বেরিয়ে আসে। সকালে চান করেই সে কলেজে যাবার কাপড় পরে নেয়। এপ্রন তো তাকে কেউ কিনে দেবে না, তাই একটা তোয়ালে ব্লাউজের দুপাশে কাঁধের কাছে পিন দিয়ে আটকিয়ে কোমরে গুঁজে একটার পর একটা কাজ সারতে থাকে সে। স্বামীসঙ্গই বটে!

বিকেলে বাড়ি ফিরবে। ছটা পর্যন্ত চায়ের জন্য অপেক্ষা করবেন ওঁরা। তবু নিজেরা করে নেবেন না। ছটা বেজে গেলে, করবেন, শুধু নিজেদের জন্য। তাকে তার নিজেরটা করে নিতে হবে। লোক না এসে থাকলে বাসন মাজো, ঘর মোছো। তারপর আবার বসে যাও রাতের রুটি তরকারি বানাতে। ফ্রিজ খুললেই তার শাশুড়ি বলেন—বউমা কী নিলে?—ওঁর ভয় যদি অমৃতা ফ্রিজ থেকে দুধ বা কোনও ফলটল নিয়ে খেয়ে ফেলে! অথচ তার শাশুড়ি একজন স্কুল-টিচার! স্কুল টিচার!

সওয়া তিনটে বেজেছে এখন। কিছুটা সময় হাতে আছে এখনও। সাড়ে চারটেয় ক্লাস ছুটি কবুল করা আছে তার। হঠাৎ সে টের পেল খিদেয় তার বত্রিশ নাড়ি পাক খাচ্ছে। আজ কাজ সারতে সারতে দেরি, তারপর শম্পার ফোন আসায় তার বরাদ্দ লপ্‌সিটা খেতে বেমালুম ভুলে গেছে সে। ভুলে গেছে জয়িতাদির ক্লাস করবার আগ্রহে, তাড়ায়। যে জয়িতাদি, সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ক'মিনিট আগেই রায় দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ তার মায়ের কাছে যাবার একটা তীব্র ইচ্ছে হল। কিন্তু তার নিজের মা এখন অনেক দূর, সল্টলেক করুণাময়ী, সে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলে মায়ের আবার না হার্ট-অ্যাটাক হয়। অথচ ভেতরে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা মা মা ডাক! সে গড়িয়াহাটের মোড়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো নেমে গেল, ডোভার লেনে তার ছোটবেলার বন্ধু সম্পদের বাড়ি। সম্পদ ছিল তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, এখন আই.আই.টি. কানপুর। হঠাৎ সে দেখল সে সম্পদের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের রাস্তাটা সে কীভাবে এসেছে, কীভাবে পার হয়েছে, কিছুই মনে নেই তার।

—তুই? অমৃতা? আজকে কোন দিকে সূর্য উঠল রে! মাসি অবাক হাসিতে মুখ ঝলমলিয়ে বললেন।

উত্তরে অমৃতা বলল—মাসি, আমাকে কিছু খেতে দেবে?

২

রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। চৈত্রেও, ফাল্গুনেও, এমনকি বৈশাখেও। প্রথম আলো ফোটবার সময়ে। মা বলে তার শরীরে ক্যালসিয়াম কম আছে তাই। পেছনে একটা কীসের যেন কাদের যেন কারখানা আছে। সেখানে একটা চিমনি আছে। চিমনি দিয়ে লকলকে আগুন

আর কালো ধোঁয়া ঠিক কখন বেরিয়ে আসবে, কখন বেরিয়ে আসে সে জানে না। খুব সম্ভব রাতে, যখন সে ঘুমোয়, একটা অতীন্দ্রিয় আঘ্রাণ তার স্বপ্ন জুড়ে, ঘুম জুড়ে থাকে, কিংবা হয়তো দুপুরে যখন সে বাড়ি থাকে না। সন্ধেবেলায় জানলা খুললে একটা উৎকট পোড়া-পোড়া গন্ধ সে পায়। সত্বর বন্ধ করে দেয় জানলার কপাট। কিন্তু এটুকু অসুবিধে সে সহ্য করে নিতে রাজি, যদি প্রতিদিন ভোরবেলায় স্রেফ জানলার জাফরির মধ্য দিয়েই ভোরের কমলালেবুকে একটু একটু করে কাঁসার জামবাটি হয়ে উঠতে দেখার অমূল্য সুযোগ সে পায়, এবং যদি কারখানার মালিকরা যত করোগেটের চালি, যত কুশ্রী ভাবেই তুলুক না কেন, দোলনচাঁপা গাছটা তার সতেজ পত্রসম্ভারের সবুজ নিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে! মৃদুল গন্ধের ওই ফুল আর গাঢ় সবুজ পাতার ওই গাছ যেদিন ওরা আরেকটা টিনের চালি কি আর একটা চিমনি বসাবার জন্যে কেটে ফেলবে, উঃ ভাবতেও গা শিউরোয়, মন ছমছম করে, তা সে যাই হোক সেই দিন থেকে সে পুবের জানলা বন্ধ করে দেবে, অন্য কোনও জানলার আশ্রয়ে চলে যাবার কথা ভাববে। ভাবলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় মিলে যাবে তার কোনও স্থিরতা নেই, এটুকু বাস্তববোধ তার আছে। খানিকটা অপেক্ষা করার ধৈর্যও তার মধ্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই দোলনচাঁপা, ওই কমলালেবুর আকাশে ওঠা, এই মিঠে রোদে পিঠ পাতা— এগুলো তার চাই-ই।

পিওন, শোনো, না না রানার, রানার!

রানারের জন্যে আমি কান পেতে আছি। কারণ তোমার চিঠি ওইরকম গতানুগতিতে আসবে না। হোক দেরি, কিন্তু রানার চাই। তার থলির ভেতর থেকে সাবধানে বার করবে, আমাকে শুধু আমাকেই দেবে আর কাউকে না, এমনকি চিঠি-বাক্সকেও না, তারপর? তারপরই ভেবেছ চিঠিটা আমি তাড়াতাড়ি খামের মুখ ছিঁড়ে পড়ব? ভুল ভেবেছ। চিঠিটাকে আমি অনেকক্ষণ ওম দেব, পাখিমায়েরা যেমন ডিমে তা দেয়! কত কাজ আমার করার থাকে। টেবিল গুছোনো, বই গুছোনো, বুদ্ধদেবের মূর্তি পালিশ করা, ডোকরার যে মূর্তিটা কিছুতেই চকচকে হবে না সেটাকে নিয়েও রোজ আমার পড়ে থাকতে হবেই। তারপর বাপি ডাকবে, বাপিকে খেতে দেবার সময়ে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়। আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে রানারের চিঠিতে তা দিতে দিতে এই বসে থাকা। আমার বাপি খুব সকাল সকাল বেরিয়ে যায়। বেচারি! আমাকে আর মাকে সুখে রাখবার জন্যে বাপির কী কষ্ট! কী চেষ্টা! আমি তো বলি দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। আর কেন তুমি এত কষ্ট করো।

—এ হল সিন্দবাদের বুড়োর জোয়াল, বুঝলি তো? একবার কাঁধে নিলে আর নামানো যায় না। তা ছাড়া তুইও তো আছিস। তোকে পার, উঁহু সুখী করতে হবে না?—বাপি বলে।

এইখানটায় আমি আমার লুকোনো হাসিটা হাসি। এ কী রকমের হাসি জানো? ঠোঁটদুটো ছড়ায় না। অন্তত বাইরে নয়। ভেতরে, মুখের গভীরে হাসি। কেন তা তুমি নিশ্চয় জানো। দিদির বিয়েতে বাবাকে অনেক অ-নে-ক দিতে হয়েছে। সব ওরা মুখ ফুটে চায়নি। কিন্তু অন্য কোনওভাবে, হাবেভাবে, বডি-ল্যাঙ্গোয়েজে চেয়েছে। বাপি তো দিদিকে দিতই। গয়নায় রানি করে দিত একেবারে। কিন্তু তুমিই বলো, ওদের বাড়িতে কি টিভি নেই? সি.ডি. প্লেয়ার নেই? ওয়াশিং মেশিন, পি.সি. হয়তো না-ও থাকতে পারে। কিন্তু এ কেমন কথা যে একজন ম্যানেজমেন্টের মাস্টার্স ডিগ্রি-করা, পঁচিশ-তিরিশ হাজার মাইনে পাওয়া লোক মানে ছেলে এসব শ্বশুরবাড়ি থেকে নেবে? পার্থদা অবশ্য চায়নি। কিন্তু বাবা যখন পার্থদার বাবার বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ বুঝে এসব দিল, আপত্তি করেনি তো! আমি যদি পার্থদা হতাম, তা হলে শুধু লজ্জা নয়, রাগ পেত আমার। তক্ষুনি সব ফিরিয়ে দিতাম।

ধুস কী সব লিখছি, এক্কেবারে ধুত্তোর ছাই। এসব কি তোমার আমার কথা না কি? আমার মুখের ভেতরের হাসিটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এসব বলতে হল আসলে।

ফোন বাজছে। আসছি এবার। নিশ্চয় আমার ফোন।

—হ্যালো।

—হ্যাঁ দোলা, আমিই তো বলছি।

—হ্যাঁ, কয়েকদিন অমৃতা আসছে না। বোধহয় তিন দিন। না, আমরা কিছু ভাবিনি তো। সরি মাসি, সত্যি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। তুমি সাত দিন খোঁজ পাওনি? ও ফোন করছে না? তুমিও পাচ্ছ না? ওদের ফোন খারাপ?

—অ্যাঁ? তোমার গলা শুনেই রং নাম্বার বলে রেখে দিচ্ছে? আর ইউ সিওর ওটা অমৃতাদেরই ফোন? ওর শ্বশুরের গলা? তুমি ঠি-ক চেনো? আচ্ছা, আমি দেখছি। কিন্তু তুমি, তোমরা একবার যাচ্ছ না কেন? আবার তোমার বেডরেস্ট? যাঃ।

মাসির হৃদয় কেন এত ঠুনকো, কিছুই তো বয়স নয়, তার মায়ের থেকে বেশ কিছু ছোটই হবেন। আশ্চর্য! ওই ভয়েই অমৃতটার সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারা বন্ধুরা খুব খেপিয়েছিল অমৃতাকে সে সময়ে। অমৃতা বলেছিল—'আমাকে কেন? আমার বাবা-মা-কে খেপাগে যা। আমার পেছনে লাগলে ভাল হবে না।'

তা বেশ তো, তারা না হয় গিয়ে অমৃতার বাবা-মা-কেই খেপাল। সে এক্তিয়ার তাদের আছে। 'আচ্ছা মেসোমশাই, গৌরীদান করলেই তো পারতেন। এত ভাবনা যখন অমৃতাকে নিয়ে!'

মেসোমশাই পরীক্ষার খাতাগুলো সরিয়ে রেখে বললেন—'গৌরীদান? তা-ই বটে। তোমাদের মাসিমাকে বোঝাও। তাঁর ধারণা তিনি যে কোনওদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন। তখন মেয়েটাকে দেখবার তাঁর কেউ-ই থাকবে না। আ'য়্যাম নট রেস্পনসিব্‌ল এনাফ।'

বলতে বলতে মেসোমশাই যে সত্যি-সত্যিই খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন এটা ওরা বুঝতে পেরেছিল। অমৃতার মা কিন্তু সত্যিই খুব অসুস্থ। হাই ব্লাড প্রেশার থেকে হার্ট খারাপ, এর ওপর যখন ব্লাড সুগার হল, উনি আর অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না। মেয়ের বিয়ের জন্যে পাগলিনীপ্রায় হয়ে উঠলেন। তা সত্ত্বেও তারা মাসিমাকেও খেপিয়েছিল।

কিন্তু অমৃতা? অমৃতাই বা রাজি হয়ে গেল কেন? ও যদি সেভাবে আপত্তি করত তা হলে জোর-জবরদস্তি করে তো আর ওঁরা বিয়েটা দিতে পারতেন না। আসল কথা, অমৃতাও বোধহয় ভয় পেয়েছিল। কিংবা এ-ও হতে পারে অরিসূদনকে দেখে ও তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

এরকম হয়, হয়েই থাকে, সে জানে। অমৃতার বাবা-মা-র যেমন প্রেমের বিয়ে। অমৃতার মা দেখতে কী সুন্দরী! কী সুন্দরী! সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু ওঁদের সময়ে ওই রূপের জোরেই তো ওঁর অ-নে-ক ভাল বিয়ে হতে পারত। কিন্তু ওই যে প্রেম! প্রেমে পড়লেন। অমৃতার বাবা তখন এম.এ.-র ব্রাইট স্টুডেন্ট, মাসিকে পড়াতেন। মেসোমশাইয়ের আগেকার ছবি সে দেখেছে। সাধারণ ভাল-ছেলে ভাল-ছেলে ভাবটা। অত রূপসী মাসি যে কী করে...। না, এভাবে বাবা মা-দের সম্পর্কে ভাবাটা ঠিক না। বরং নিজের উদাহরণটাই তার ভাবা দরকার। গেল পার্থদাদের ক্লাবের স্টিমার পার্টিতে, সরু সিঁড়িটা দিয়ে আপার ডেকে উঠছে, সিঁড়ির ওপরে যেন নিজের নিয়তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। প্রথম, একেবারে প্রথম দর্শনে এমনটা হতে পারে সে কোনওদিন ভাবেনি। সারাটা স্টিমার-পার্টি ছলচাতুরি করে ও-ও যেমন তার কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করেছে, তেমনি সে-ও করেছে। নির্লজ্জের মতো। এক টেবিলে খেতে বসেছে খুঁজে খুঁজে। এক একটা টেবিলে চারজনের করে জায়গা। ওরা দুজন ছাড়া ছিলেন দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁদের নিয়ে ঠারে-ঠোরে কী ঠাট্টা ওদের। কেটারারকে বলে যখন এক্সট্রা মাছটা ও তার পাতে দেওয়াল, তখন সেই মাছের টুকরোটা রাগের ভান করে সে কি ওর মুখে গুঁজে দেয়নি! পাতেই তো তুলে দিতে পারত! ওভাবে মুখে গুঁজতে গিয়ে তার ডান হাতের সব আঙুলগুলোর আগা যে ওর মুখের মধ্যে চলে গেল সে শিহরনের কথা জীবনেও ভুলবে না কি সে? ও-ও হয়তো ভুলবে না। হুল্লোড়বাজ, চঞ্চল, অস্থির, খেয়ালি, তবুও ও-ও ভুলবে না। সে স্থির জানে। আর এই ভাল লাগা, এই শিহরন, এই ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখার

ইচ্ছে, ফিরে ফিরে সামান্য ঘটনাগুলো ভাবার ইচ্ছে, এ একজনের সঙ্গেই হয়। সেই একজন যত দিন না আসে, তত দিন অনেককে ভাল লাগে, অনেকের দিকে একটু একটু ঝোঁকে মন, কিন্তু সে যখন আসে সিঁড়ির মাথায় ওইরকম বিজলি-চুম্বকের মতো তখন বোঝা যায় আরগুলো সব মিথ্যে, হাস্যকর রকমের ছেলেমানুষি। এইটা সত্য। এইটা অমোঘ।

অমিতকে দেখে তার যা হয়েছিল, অরিসূদনকে দেখে অমৃতার যদি তার কণাও হয়ে থাকে, তা হলেই বোঝা যাবে, কেন উনিশ বছর মাত্র বয়সে, ফাইন্যাল পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর, মা শয্যায়-শোওয়া, অমৃতা হঠাৎ বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। নইলে অমৃতার মতো অত লেখাপড়ামুখি মেয়ে, অত সিরিয়াস, তারপরে অমন মা-অন্ত প্রাণ, মাকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখত যে, বাবা-মার অমন বুকের ধন যাকে বলে সে কেন...

মাসি বেপথু হাতে ফোনটা নামিয়ে রাখছেন, বুঝতে পারল দোলা। অনায়াসে। এখন মানুষের মনের অনেক কথা, শরীরের অনেক ভাবের কথা সে চট করে বুঝতে পারে। প্রেম তাকে এই শক্তি দিয়েছে। একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে এটা অমিতেরই দেওয়া। অমিতাভ। অমিতের জন্য সারা শরীরে একটা সজলতা নিয়ে, আর সীমা মাসি অর্থাৎ অমৃতার মায়ের জন্য একবুক করুণা নিয়ে, আর অমৃতার জন্য একমাথা ভাবনা নিয়ে সে অমৃতার ফোনটা ঘোরাল। রিং হচ্ছে, রিং হয়ে যাচ্ছে ওদিকে। ফল্‌স রিং না কি?

—হ্যাল্লো—একটি বয়স্ক নারীকণ্ঠ জবাব দেয়।

—অমৃতা আছে?

—কে বলছেন?

—আমি দোলা, মাসিমা, অমৃতার বন্ধু। দিন তিনেক কি চারেক হল ওর য়ুনিভার্সিটি কামাই হল, তাই...

—ধরো, ডাকছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অমৃতার গলা ভেসে এল—দোলা?

—হ্যাঁ আমি, তুই তিন দিন আসছিস না কেন?

উত্তরে অমৃতা বলল—জয়িতাদি খোঁজ করছিলেন? ও।

দোলা বলল—তোর শরীর-টরীর খারাপ না কি?

অমৃতা বলল—তোর আবার জ্বর হয়েছে? কতদিন বলেছি ঠাণ্ডা লাগাস না!

দোলা বলল—ব্যাপারখানা কী বল তো। মাসি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ফোন করেছিলেন। তোদের ফোন পাচ্ছেন না। পেলেও রং নাম্বার বলে কে নামিয়ে রাখছে!

—হ্যাঁ ঠিক আছে। রাখছি—

ফোনের মধ্যে একটা চাপা রাগত গলার 'এবার রাখো' শুনতে পেয়েছিল দোলা। সেটা নারী-কণ্ঠ কি পুরুষ-কণ্ঠ সেটা বুঝতে পারেনি।

অমৃতার সমস্ত কথাবার্তাই অসংলগ্ন। তার ওপর ওই 'এবার রাখো'। দোলা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করল। কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব?

মা জিজ্ঞেস করল—অমন করে খাচ্ছিস কেন দোলা? তেতো দিয়ে ডাল মাখলি যে!

—ওঃ ভুল হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি মা,

—বুঝতে পারিসনি ওটা নিম-বেগুন? মাথায় কী ঘুরছে বল তো! ঠিক করে খা। ও ভাতটা সরিয়ে রাখ। আরেকটা মাছ ভাজা দেব?

দোলা বলল—এই তো, ঠিক আছে। খেয়ে নিচ্ছি। উঃ আরেকটা মাছ? বলে একটাই খেতে পারছি না।

মা নিজেও দোলার সঙ্গে খেতে বসেছে। বাবা সাত সকালে বেরিয়ে যায়। দোলা য়ুনিভার্সিটি যেতে আর মা মায়ের শখের নার্সারি স্কুলে যেতে একই সঙ্গে বসে। তবে দোলার কোনও কোনওদিন দেরিতে ক্লাস থাকে। সেদিনগুলোতে মা খেয়ে বেরিয়ে যায়। দোলা নিজের মতো বেরোয়। নিজের মতো খেয়ে। ওদের বাড়ির কাজের লোক অর্থাৎ অণিমাও কাজ করে, সকাল দশটার মধ্যে সব রান্না-বান্না সেরে গুছিয়ে, নিজে খেয়ে সে-ও চলে যায়, কোনও গেঞ্জি কারখানায় তৈরি গেঞ্জির সুতো কাটতে। আবার সন্ধে সাতটায় আসবে।

দোলাদের বাড়িটা এমন জায়গায় যে কোনও বাসের টার্মিনাস থেকে ওঠার উপায়ই নেই। এক যদি হাওড়া চলে যেতে চাও! ও অবশ্য পাতাল রেলে করে যায়। অটোয় করে কালীঘাট স্টেশনে উঠে ও সেন্ট্রালে নামে, কলুটোলাটা হেঁটে পার হতে হয়, পেছনের দরজা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে ও।

—খিড়কির দরজা দিয়ে কারা আসে জানিস?—নিলয়, ওদের ক্লাসের সবচেয়ে বিচ্ছুটা বলেছিল একদিন।

—কে?—দোলা ওর ফিচেল হাসি থেকেও কিচ্ছু আন্দাজ করতে পারেনি।

—জমাদার।

—আমি জমাদার? আমি জমাদার?—চড় তুলে তাড়া করলে তো নিলয় পালাবেই। পালিয়ে কিন্তু বেশি দূর যাবে না পাজিটা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলবে—কেন? জমাদার খারাপ? স্ক্যাভেঞ্জার, সংসারের যাবতীয় আবর্জনা, জাল-জঞ্জাল যে পরিষ্কার করে আমাদের জন্য তাকে খারাপ বলছিস? দাঁড়া, জ্যোতিবাবুদের বলে দেব।

তখন অমৃতাই বলে—তুই কিচ্ছু জানিস না নিলয়, খিড়কি দরজা দিয়ে আরও অনেকে আসে, আসে ফুচকাওলা, আসে পাঙ্খা বরফ। দোলাটা তো নির্ঘাৎ ফুচকাওলা। ওর কাছে ফুচকাগুলো যা মচমচে না, আ-হ।

আবার অমৃতা। অমৃতার কথাতেই মাথাটা এখন ভর্তি হয়ে গেছে। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে ক্লাসে ঢোকবার মুখে স্বভাবতই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শর্মিষ্ঠা, তানাজি, নিলয়, অনিন্দিতা, লাবণি, তিলক—এক দঙ্গল একেবারে।

কাকে বলবে? নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা? শর্মিষ্ঠাকে সে আদৌ নির্ভরযোগ্য মনে করে না, অনিন্দিতাটা অতিশয় তরল প্রকৃতির। লাবণিকে বলা যেত। কিন্তু সময় চাই। এখন ভিড়ের মধ্যে থেকে ওকে ডাকলেই সবগুলো শেয়াল একসঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে।

—কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে? অ্যাঁ? আমরা বুঝি কেউ নই। কিছু নই!

তিলক পাশে বসেছিল বলে তিলককেই বলে ফেলল কথাটা দোলা।

—তিলক শোন, অমৃতার নির্ঘাৎ কোনও প্রবলেম হয়েছে।

—তিন চারদিন আসেনি! হ্যাঁ কোষ্ঠকাঠিন্য তো অন্ততপক্ষে বটেই!

—অসভ্যতা করিস না। ওর শ্বশুরবাড়িতে কাউকে ফোন ধরতে দিচ্ছে না। ওর মাকেও কথা বলতে দিচ্ছে না। আমি অনেক কষ্টে কনট্যাক্ট করেছি, উল্টো পাল্টা বকল।

—সর্বনাশ! তিলক বলল, —মাথাটা গেছে। যত বলি, অত পড়িসনি অমৃতা, অত পড়িসনি। আজ বলছি না কি?

—তুই কি কখনও সীরিয়াস হবি না?

—ইন্টারভিউয়ের চিঠি এলে নির্ঘাৎ হব।

—শোন তিলক, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কারুর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দিচ্ছে না, ব্যাপারটা খুব ফিশি লাগছে।

তিলক বলল—দেবে তো না-ই। শ্বশুর-টশুর টের পেয়েছে আমার মতো একটা লাল টুকটুকে ছেলের সঙ্গে ও পড়ে। সন্দেহ, স্বাভাবিক! তোর শ্বশুর-শাশুড়ি হলেও এগজ্যাক্টলি এমনিই করত।

দোলা কিছু না বলে তিলকের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে বলল। এক্ষুনি এ. আর. অর্থাৎ অশেষ রায়ের ক্লাস শুরু হবে। এসেই আগে উনি ডিসিপ্লিন সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেবেন। ছেলেরা বলে উনি অশেষ না আরও কিছু, উনি হলেন শেষন। নিজেও শেষ হবেন, আমাদের সবাইকেও পণ্ডিত বানাতে না পেরে শেষ করে দেবেন।

অমৃতার সঙ্গে দোলার বেশিদিনের বন্ধুত্ব নয়। বি.এ. ক্লাসেই। যাতায়াতের রুট এক হলে এইরকম বন্ধুত্ব কারও কারও সঙ্গে হয়ে যায়। তখন অমৃতারা থাকত রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, দোলারা থাকত হিন্দুস্থান রোডে। এত কাছে থাকত অথচ কলেজে পড়তে যাবার আগে ওদের ভাব ছিল না। দোলার খুব ভাল লাগত অমৃতাকে রাস্তাঘাটে দেখে। হয়তো একটা শাড়ির দোকানে ঢুকল, কিংবা রাস্তা পার হচ্ছে। অনেক সময়েই ওর সঙ্গে ওর মাকেও দেখেছে। পোর্সিলেনের মতো রং মাসির। চোখ-মুখ-নাক খুব সুন্দর, বোঝাই যায় এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন, তবু ওঁকে ছেড়ে অমৃতার দিকেই চলে যেত চোখ। সুশ্রী তো বটেই, কিন্তু ভারী মিষ্টি। পুতুলের মতো মিষ্টি নয় কিন্তু। ওর চোখের চাওয়ায়, ঠোঁটের হাসিতে মিষ্টত্বের সঙ্গে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যে ব্যক্তিত্বটা অত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ওর মায়ের ছিল না। অমৃতাকে হয়তো ওই ব্যক্তিত্বের জন্যই দূরের মানুষ দূরের মানুষ লাগত। হয়তো বা একটু উন্নাসিক। অন্তত দোলা তো কোনওদিনই যেচে ভাব করতে যায়নি।

আশ্চর্য! দুজনে যখন একসঙ্গে এক কলেজের ক্লাসে মুখোমুখি হয়ে গেল, তখন অমৃতাই জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গড়িয়াহাটের আশেপাশে কোথাও থাকো না?

—তুমিও তো কাছাকাছিই, আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।

অমৃতাটা খুব ফাজিল ছিল, বলেছিল—আমি কিন্তু তোমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, বন্ধুদের নিয়ে ফুচকা খেয়েই যাচ্ছ, খেয়েই যাচ্ছ, ঝালমুড়ি খেয়েই যাচ্ছ, আইসক্রিম খেতে খেতে বেরোচ্ছ, রোল কিনে গলির দিকে গেলে। তোমার রোজ কত টাকার ফুচকা লাগে?

দোলা হেসে হেসে বলেছিল—আজ প্রথম দিন বলে কিন্তু কিছু মনে করছি না। পরে ফুচকা তুলে কথা বললে আড়ি হয়ে যাবে।

অমৃতার সঙ্গে ভাব হওয়ায় দোলার এত ভাল লেগেছিল। যেন কোনও দূর গ্রহের সঙ্গে নিজের কক্ষপথে দেখা হয়ে যাওয়া। গ্রহ কিংবা নক্ষত্র। তার পর মেলামেশা করতে করতে সেই গ্রহত্ব নক্ষত্রত্ব কেমন আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়। কেন অমৃতার ওইরকম ব্যক্তিত্ব, অনেক টাকা বা অনেক বুদ্ধি থেকে নয়, মা চিররুগ্ণ বলে, মায়ের মা হয়ে থাকতে হয় বলে, এ সব দোলা ধীরে ধীরে বুঝেছে। আসলে ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা বা ওপর-ওপর দেখাটা কিছু না। একটা মানুষের সামান্য একটু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, সে কে, সে কী এবং কেন। অমৃতা দোলাকে কোনওদিন লক্ষ করেছে বলে দোলার মনে হয়নি, অথচ দেখো, ও দোলার সম্পর্কে দোলার চেয়ে বেশি জানত। জানত দোলা খুব আদুরে, জানত দোলা অনেক বন্ধুর সঙ্গে ঘোরাফেরা, হইচই করতে ভালোবাসে। কিন্তু দোলার মধ্যে যে একটা ভাবুক দোলা, কাঙাল দোলা বসে আছে, অমৃতার বন্ধুত্বের জন্য কাঙাল, তা সে কোনও দিনও বোঝেনি।

বন্ধুত্ব এমন একটা জিনিস যার মধ্যে আবার অন্যান্য আবেগ অনুভূতির কিছু কিছু মাত্রাও থেকে যায়। কখনও থাকে করুণা, কখনও থাকে শ্রদ্ধা, কিন্তু প্রায় সব সময়েই থাকে আস্থা, নির্ভরতা। এটা যদি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটা বন্ধুত্ব নয়, খালি সঙ্গীত্ব। কিছুক্ষণের সঙ্গ দেওয়া নেওয়া।

অমৃতার সঙ্গে দোলার যে বন্ধুত্ব তার মধ্যে দোলার মনোভাবে খানিকটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আছেই। অমৃতা দোলার মতে দোলার চেয়ে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল, কেমন একটা ধৈর্য একটা রোখ আছে

তার জীবনযাপনে। তারও চেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হল ব্যক্তিত্ব। এটা হয়তো ওই রোখ, ওই ধৈর্য থেকেই আসে। আরেকটা কথা, অমৃতা নিজের কথা একদম বলে না। বলার অভ্যাসই নেই। তবে অন্যের কথা শোনে মন দিয়ে। অন্যের সমস্যার সমাধান করতে ওর কোনও আলস্য নেই। দোলা ওদিকে বক্তিয়ার, কোনও কথা পেটে রাখতে পারে না, যদি কারও ওপর রাগ বা অভিমান হয়, যেমন বন্ধুদের মধ্যে হয়েই থাকে, তাহলে দুদিন বড় জোর অপেক্ষা করবে তারপর নিজেই ওপর-পড়া হয়ে বলবে—এই জানিস আমার না তোর ওপর ভী-ষণ রাগ হয়েছে। কেন রাগ, কখন থেকে রাগ, রাগের মাত্রা কতটা এ সব নিয়েও সে রীতিমতো একটা বক্তৃতা দেবে, তারপরে বলবে—কী, এত কথা বললাম, আমার কাছে ক্ষমা চাইলি না? চা, ক্ষমা চা, সরি বল।

দোলা এমনই।

শেষনের ক্লাস হয়ে গেল, প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ পি.এম.-এর ক্লাস হয়ে গেল। তারপর একটা ক্লাস বিরাম। কাকে বলবে দোলা? তিলকের তো ওই ধরনের ফিচেল-ফাজিল প্রতিক্রিয়া।

লাবণির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল সে। —এই লাবণি, লাবণি, একটু দাঁড়া। প্লিজ।

—কেন রে? আমি কমনরুমে যাচ্ছি, অনেকক্ষণ থেকে টয়লেট পেয়েছে।

—তা চল। কিন্তু রাস্তার দিকের বারান্দাটায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, টয়লেট সেরে আসিস একবার। ভী-ষণ দরকার আছে।

লাবণি আসতে যতটা পারে খুলে বলল কথাগুলো দোলা।

লাবণি বলল—দ্যাখ শ্বশুরবাড়ি-টাড়ির অনেক কমপ্লিকেশন থাকে, চাপা গলায় 'এবার রাখো'টা তুই ঠিক শুনেছিস?

—সেটা তো ঠিক শুনেছিই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মিস্টিরিয়াস হল অমৃতার কথাবার্তা।

—কথাবার্তা মোটেই মিস্টিরিয়াস নয়, লাবণি বলল, বোঝাই যাচ্ছে সামনে এমন কেউ দাঁড়িয়ে আছে যার সামনে ও মুখ খুলতে পারছে না।

—কিন্তু মাসিকে ওই রং নাম্বার বলে ফোন নামিয়ে রাখা!

—মাসি ঠিক নাম্বার ঘুরিয়েছিলেন কি না দ্যাখ। ও রকম অনেক সময়ে নার্ভাস হয়ে গেলে হয়। আর অমৃতার মা তো নার্ভাস থার্টি।

—তা হলে তুই বলছিস ভাবনার কিছু নেই?

—না, তা কিন্তু বলিনি। আচ্ছা ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেমন কিছু জানিস?

—টিপিক্যাল বাঙাল। বউ আসতেই রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—এই খবর্দার বাঙাল বলবি না। আমি বাঙাল তা জানিস?

—তোদের নিয়মকানুন তা হলে তুই-ই ভাল বলতে পারবি। যে বউ য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে, তাকে দিয়ে সকালে বিকেলে সব রান্না করানো এটা আমাদের ঘটিদের মধ্যে স্বাভাবিক নয়। চলে না।

লাবণি বলল—আমার তো দুই মাসতুতো বউদি আছে। খোদ শ্যামবাজারের। দুজনেই বেরোয়। রান্নার লোক আছে, তবে বউদিরাও ছোটখাটো ব্যাপারে যেমন চা-ফা করা বা লোক এলে ভাল কিছু এ সব করে। তাই বলে পুরো রান্না...

—তোরা মডার্ন। তা ছাড়া কোনকালে পিওর বাঙাল ছিলি রে? ওর শ্বশুরবাড়ি বোঝাই যাচ্ছে সেকেলে। দোলা বলল।

—তা ওঁরা কি চান না ও পড়াশোনা করুক!

—সেটা ভাই আমি জানি না। অমৃতা কোনওদিন বলেনি। যাবি?

লাবণি বলল—সেটা কি ঠিক হবে? চিনি না জানি না...

দোলা বলল—আহা, অমৃতা কেন যাচ্ছে না সে খবর নিতে যেতে পারি না! চল লাবণি প্লিজ।

পরের ক্লাসটা ওরা আর করল না। যদিও জয়িতা বাগচির ক্লাস। পাতাল রেল ধরল দুজনে,

কালীঘাট স্টেশনে নেমে একটা যাদবপুরগামী বাস পেয়ে গেল। লাবণি এখনও বলে যাচ্ছে—লোকেদের শ্বশুরবাড়ি। যাই বলিস, আমার যেতে কেমন-কেমন লাগছে।

ধৈর্য রাখতে পারে না দোলা, ঝাঁঝিয়ে ওঠে—ঠিক আছে, যা, তুই নেমে যা।

—নেমে গিয়ে করবটা কী? বাড়ি কতদূর বল তো!

—তাড়াতাড়ি নেমে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবি।

লাবণি গোমড়ামুখে বলল—অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আসলে আমার খুব বাজে লাগে। তাই বলছিলাম। অমৃতার জন্যে দুশ্চিন্তা আমারও কিছু কম হচ্ছে না।

তবে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। ওরা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখল 4/1/A, সেন্ট্রাল পার্কের এক নম্বর ফ্ল্যাটে তালা মারা। কোল্যাপসিব্‌লটা এমন করে বন্ধ, এমন করে তাতে সাত লিভারের বড়সড় একটা তালা লাগানো যেন কোনওদিন কেউ ওখানে ছিল না। ও বাড়ি বহুদিন খালি পড়ে আছে, বিক্রি হয়ে যাবে এবার।

অমৃতাদেরটা একতলার ফ্ল্যাট, দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটা পাশ দিয়ে চলে গেছে।

লাবণি হঠাৎ বলল—চল না, দোতলার ফ্ল্যাট-ট্যাটে জিজ্ঞেস করি।

দোলার ভীষণ দুর্ভাবনা হচ্ছিল, সে বলল—হঠাৎ এত স্মার্ট হয়ে গেলি যে!

উত্তর দিল না লাবণি—দোতলায় উঠতে থাকল। বাড়িটা ছোট। তিন তলায় তিনটে ফ্ল্যাট।

দোতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল টিপল ওরা। এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন।

—কে আপনারা?

—আমরা নীচের ফ্ল্যাটের অমৃতা মানে ওঁদের বাড়ির বউয়ের বন্ধু। ওর কাছে এসেছিলাম, দেখছি তালা মারা। আপনারা যদি কেউ কিছু জানেন।

—তালা মারা? সকালেও তো ভদ্রলোককে বাজার বেরোতে দেখেছি। তবে, কিছু মনে করো না ভাই, তোমাদের তুমিই বলছি, ওঁরা যেন কেমন। কারও সঙ্গে মেশেন না। বউটিকেও মিশতে দ্যান না। প্রতিবেশীর সঙ্গে তো প্রতিবেশীর স্বার্থের খাতিরেই একটু মেলামেশা করতে হয়। ওরা সেটুকুও করেন না। এসো না ভেতরে, বসো।

দোলা লাবণির দিকে তাকাল। লাবণি দোলার দিকে। এক পা এক পা করে এগোল, সোফার দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—বসো, বসো না। তোমরা মেয়েটির বন্ধু! মেয়েটিকে কিন্তু ভাল বলেই মনে হয়। একদিন আমি বেরোচ্ছি, ও-ও বেরোচ্ছে। বলল—বউদি, আপনাকে তো বেরোতে দেখি না!

—আমি বললাম—আজ একটু ব্যাঙ্কে যাবার আছে ভাই। এই পর্যন্ত বলেছি, দরজার ভেতর থেকে ওর শ্বশুরই বোধহয় ডাকলেন, অমৃতা অমৃতা, একটা কথা শুনে যাও। অবভিয়াস আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবেন না।

—আশ্চর্য তো! দোলা বলল।

লাবণি বলল—উনি কথা বলতে না দেবার কে? উনি না বললেন আর অমৃতাও শুনে গেল? এত ভিতু মেয়ে তো আমাদের বন্ধু নয়? কেন, আপনাদের সঙ্গে ওঁদের কি কিছু নিয়ে কোনও মনোমালিন্য...

—আরে আলাপ হবে সম্পর্ক হবে তবে তো মনোমালিন্য। আচ্ছা, আমাদের না হয় ওঁরা পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনতলা? তিনতলার ফ্ল্যাটের সঙ্গেও ওঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। আশপাশের কারও সঙ্গে আছে বলেও জানি না। বউটি, মানে তোমাদের বন্ধু কিন্তু ভাল। দেখো, হয় তো সবাই মিলে কোথাও বেরিয়েছে, তাই তালা। সবাই-ই তো কোল্যাপসিব্‌ল টেনে তালা দিয়েই বেরোয়।

ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। একতলায় নেমে লাবণি আবার জানলা-টানলা দিয়ে একটু উঁকি মারার চেষ্টা করল, জানলাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। খুব স্পষ্ট যে ভেতরে কেউ নেই।

রাস্তাটা পেরিয়ে একটা পুকুরের ধার পর্যন্ত ওরা এসেছে। একটা ছেলে হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। বছর পনেরো ষোলো হবে। বোধহয়, সবে গোঁফ গজিয়েছে। একটা টি শার্ট আর পায়জামা পরা।

ছেলেটা অমনি উর্ধ্বশ্বাসে বলে গেল—অমৃতা বউদির খুব শরীর খারাপ, কোনও হাসপাতাল-টাতালে নিয়ে গেছে। যখন নিয়ে গেল খুব সম্ভব অজ্ঞান মতো ছিল, একটা সাদা অ্যামবাসাডর। অরিদার অফিসের গাড়ি। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল নয়।

বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে, দোলা বলল—কী হয়েছে অমৃতার? দিন তিনেক য়ুনিভার্সিটি যায়নি। কিন্তু আজ সকালে আমার সঙ্গে কথা বলল, তখনও তো কোনও শরীর খারাপের কথা বলেনি! তুমি কে?

—আমি সীজার, ওদেরই তিনতলায় থাকি। হেয়ার স্কুলে পড়ি তো, একসঙ্গে যাতায়াত করি। সেই থেকে ভাব হয়ে গেছে খুব। আমি জানি বউদির শরীর খারাপ। কোনও মেয়েলি ব্যাপার, তাই আমাকে বলতে পারেনি।

ছেলেটি একটু লাল হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর বলে উঠল—আপনারা প্লিজ ওর বাবা-মাকে খবর দিন।

বিমূঢ়ের মতো খানিকটা হেঁটে লাবণি ডাকল—এই সীজার, সীজার, শোনো-ও।

অনেকটা রাস্তা চলে গিয়েছিল ও, রাস্তার কোনও চলতি লোক ওদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ও আবার ছুটে এল। লাবণি বলল—তোমার, মানে তোমাদের ফোন নম্বরটা দাও।

—ফোর টু-ফাইভ টু থ্রি সেভেন ওয়ান।

—তোমাকে ডাকলে বাড়ির সবাই ডেকে দেবেন তো?

—হ্যাঁ, আপনি...

—আমার নাম লাবণি দে, থাকি গোয়াবাগানে। ফোন নম্বরটা মনে রাখা সোজা। ট্রিপ্‌ল্ ফাইভ-ওয়ান টু ফোর থ্রি। কোনও খবর থাকলে আমাকে জানিও। একটু নজর রাখবে বাড়িটার দিকে।

—সে তো রাখবই—দোলার দিকে ফিরল ছেলেটি, আপনারটাও দিয়ে দিন।

—দোলা রায়, ফোন ফোর সিক্স ফোর নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান।

—আপনি তো তাহলে কাছেই থাকেন! ঠিকানাটা বলবেন?

দোলা ঠিকানা বলল।

সীজার বলল, ঠিক আছে। আমি এদিকে কোনও কিছু হলে জানাব।

—কোনও কিছু হলে মানে?

—কেন? আপনারা কাগজ পড়েন না? বধূ হত্যা টত্যা...

—তুমি বলছ কি?—দোলা শিউরে উঠে বলল, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

লাবণি বলল—এ কথা তোমার কী করে, কেন মনে হল সীজার?

—কী জানি! মনে হল! বউদির এত সুন্দর চেহারা ছিল, কী রোগা হয়ে গেছে, ওকে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ করায়। আমি জানি। খেতে দেয় না।

—কী করে জানলে? ও তোমাকে বলেছে?

—কিছুই বলেনি। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—বউদি, ডায়েটিং করছ না কি? বিউটি-কম্পিটিশনে নাম দেবে? তাইতে ও হেসে বলল—অনেকে ডায়েটিং করে, অনেককে কপাল করায় বুঝলি? তখন কথাটা সিরিয়াসলি নিইনি। এখন মনে হয়েছে। এই ক'দিনই মনে হচ্ছিল।

৩

অমৃতার কথাটা সর্বক্ষণ মাথায় ঘুরছে—'তোর ডাউরি নেই বলেই কি বিয়ের আগে দুটো রাত উপহার দিতে চাইছিস?' সৌমিত্র দাস যখন প্রস্তাবটা দিল, দিল এইভাবে—চলো শম্পা একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

শম্পা তো বেড়াতে পেলে আর কিছু চায় না। বলল—কোথায়?

—দ্যাখো ডায়মন্ডহারবার পুরনো হয়ে গেছে। আরেকটু দূর। ধরো দিঘা। পুরো রাস্তাটা গাড়িতেই যাব। এখনও খড়্গপুর টু দিঘা, বা এখানকার যে বাসগুলো স্ট্রেইট দিঘা যায়, সেগুলো তেমন ভাল হয়নি। খড়্গপুর টু দিঘাগুলো তো লজঝড়। আমার মারুতি জেন শাঁ শাঁ করে চলে যাবে। এ. সি.। তুমি বাইরের ধুলো, পলিউশন, গরম কিচ্ছু টের পাবে না। ঠিক দুদিন আগেই সৌমিত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। শম্পা কিছু বলেনি, মনে মনে বলেছে—ইস্ সত্যি?

মুখে সে বলেছে—কেন?

—কেন মানে?

—বিয়ে করতে চাইছেন কেন?

—চাইছি কেন? আশ্চর্য! তুমি এতদিনেও বুঝতে পারোনি, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাইছি! আজকে শুধু মুখ ফুটে বললাম এই পর্যন্ত।

শম্পার গলা ধরে গেছিল, সে বলেছিল—কী আছে আমার? কেনই বা আমাকে...

—তোমার এই কমপ্লেক্সগুলো আমার ভাল লাগে না শম্পা। সত্যি বলছি তোমার এই পার্টটাই সবচেয়ে ডিপ্রেসিং। তুমি একটা অ্যাট্রাকটিভ ইয়াং উওম্যান, পার্ফেক্টলি এডুকেটেড, ডুয়িং এ গুড জব, তোমার ভেতরে আজকালকার মেয়েদের তুলনায় কিছু বস্তু আছে। কেন তোমার এই সব কমপ্লেক্স আমি জানি না। তুমি কি বুঝতে পারো না আমাদের ললিত শা, অভিনাশ চোপরা—এরা তোমার সঙ্গে আলাপটা এগোতে খুবই ইচ্ছুক, খালি আমি তোমার প্রতি দুর্বল জানে বলেই এগোতে পারে না!

—ও তো পুরুষদের একটা মেয়ে দেখলেই র‍্যাগিং করার টেনডেনসি থাকে—

—নাঃ শম্পা, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না, আসলে তোমার বাবা অল্প বয়সে মারা গিয়েই, তোমার একটা পার্মানেন্ট সেন্স অফ ইনসিকিওরিটি এসে গেছে।

—বোঝেন যদি তো বলেন কেন?

সেদিন ওরা ব্লু-ফক্সে গিয়েছিল। ওয়লডর্ফ নয়।

মৃদু আলোর মধ্যে ওদের কথাবার্তা খুব জমেছিল।

যে লোকটা তাকে এত বোঝে, তার এত গুণের কথা খেয়াল করেছে, তার একমাত্র দোষের কথাও সরবে বলে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে, তার প্রস্তাবটা কুপ্রস্তাব বলে মানতে মন রাজি হয় না।

মা, তার মা, নানা বিপদে-আতঙ্কে দিশেহারা বেচারি মা তার জীবনের অর্ধেক ব্যাপারই বোঝে না। বাবার মৃত্যুতে বাবার জন্য চাকরি একটা পেয়েছে, কিন্তু তা তো আর বাবার চাকরি নয়! মা পেয়েছে মায়ের বিদ্যে-বুদ্ধিমতো একটা কেরানির চাকরি। নেহাৎ টাটাদের কনসার্ন, ভাল পয়সাকড়ি দেয় বলে তাদের চলে যায়। ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটাও আছে। যৌথ পরিবারের বাড়ি। তার বাবাই ভাগ করে পাঁচিল-টাচিল তুলে গিয়েছিলেন—তাই। তা নয় তো, ও পারে তার জ্যাঠতুতো জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার তাদের কী অবস্থা করত তা একমাত্র ভগবানই জানেন। এখনও যথেষ্ট নাক গলায়। সৌমিত্রকে সে একদিনও বাড়িতে আনেনি। মায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে বাইরে,

সুতানুটি উৎসবে গান-টান শুনতে গিয়ে। মা তো এক কথায় মুগ্ধ। অত সুন্দর পুরুষালি চেহারা, অত ভাল চাকরি করে? সেই ছেলেকে তিনি যে কোনও মূল্যে জামাই পেতে চান।

সৌমিত্রর প্রস্তাবটা শম্পা খুব হেলায়-ফেলায় রেখেছিল মায়ের কাছে। মা জানো, দিঘাতে একটা কাজ আছে আমাদের কম্প্যানির। সৌমিত্র বলছে আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে।

—মানে তুই ওকে হেল্প করবি? না কি?

—তাই দাঁড়ায় ব্যাপারটা।

—আরে কে যাবে?

—আবার কে? আমি আর ও।

চমকে উঠল মা।

—তুই আর ও? অফিসে কথা হবে না এ নিয়ে?

—সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে মা। দিনকাল বদলে গেছে টের পাও না?

—তা ছাড়া ও তো তোকে বিয়ে করবে কথা-ই দিয়েছে। তবু-তবু শম্পি ওখানে গিয়ে কিন্তু কাছাকাছি ঘরে থেকো না। আর সাবধানে থেকো। বিয়ের আগেই যদিও স্বামীর মতো ব্যবহার করতে চায়, তুমি কিন্তু রাজি হয়ো না।

—আচ্ছা মা, আমার বুদ্ধি-বৃত্তি, আমার আত্মসংযমের ওপর এতটা আস্থা তোমার এল কী করে?

—শম্পা মনে মনে ভাবে। এ কি আস্থা? না দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, কিংবা দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দেওয়া! তাই, তাই-ই সে অমৃতার কাছে গিয়েছিল। অমৃতা এককথায় না করে দিল, বিষ উগরে দিল। সে বিষ কি তাকে, বিশ্বাসকেও আক্রমণ করেনি?

—কী? আমরা যাচ্ছি তো এই উইক-এন্ড-এ। —আবারও ব্লু ফক্স।

—এ সপ্তাহে যদি না যাই, তো কী হয়? শম্পা সৌমিত্রর চোখ এড়ায়।

—কী হয় মানে? আর আমার সময় হবে না কি? তুমি কি জানো না উইক-এন্ড-এও দস্তিদার আমার ওপর কী কাজ চাপিয়ে রাখে? আর তারপর তো আমাদের বিয়ের দিন এসেই যাবে। এই বৈশাখেই।

—আপনি তো আপনার বাড়ির কারও সঙ্গে পরিচয় করালেন না? আপনি স্থির করলেই স্থির হয়ে যাবে?

—ওহ, ইয়েস, হু এলস ইজ দেয়ার এনিওয়ে? দিদি জামাইবাবু থাকেন বম্বেতে, একটা বোন আছে সে জার্মানিতে, জার্মান বিয়ে করেছে। এগুলো তো তোমায় আমি বলেছি, বলিনি?

—না, দিদির কথা বলেছেন। আবছাভাবে বম্বের কথাও। তবে ছোট বোনের কথা, তার জার্মান সাহেবকে বিয়ে করার কথা বলেননি। তা আপনাদের পরিবারে সাহেব-জামাই থাকার জন্যই কি আপনারা এত পারমিসিভ?

প্রথমটা হাঁ হয়ে গেল সৌমিত্র। তারপর বলল—বাহ্ বাহ্ এই তো মাটির পুতুলের মুখে খই ফুটছে। গড নোজ কোনও ভেন্ট্রিলোকিস্ট মিষ্টি পুতুলটাকে নিজের কথা বলবার জন্য ব্যবহার করছে কি না!

—ঠিক আছে। তাই—শম্পার চোখ এবার জল চকচক—ভেন্ট্রিলোকিস্ট-ই ব্যবহার করছে, তাই বলে আপনিও ব্যবহার করবেন?

—কী বলছ শম্পা? কী বলছ তুমি জানো।

—হতে পারি আমি মাটির পুতুল. তো সেই মাটির পুতুলটাকে ভেঙে দেবেন না সৌমিত্রদা।

চোখ থেকে জল এবার উপচোচ্ছে। শম্পা উঠে দাঁড়াল। সামনে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে স্মোক্‌ড হিলসা, বাটার নান। চিকেন দো পিঁয়াজা।

—আরে আরে শম্পা, চললে কোথায়? ডোন্ট ক্রিয়েট আ সিন প্লিজ।

—পরে যাতে এর চেয়েও বেশি সিন ক্রিয়েট করতে না হয় তাই, আমি কোয়ায়েটলি চলে যাচ্ছি। আপনি বসুন।

—এই এত খাবার আমি একা খাব?

—খেতেই তো পারেন। ছেলেরা তো একটু বেশিই খায়। কয়েক পেগ হুইস্কি নিয়ে নিলেই পেরে যাবেন। আর নেহাৎ না পারেন আর কাউকে ডেকে নিন না, কোনও কাচের কি পোর্সিলেনের পুতুলকে, কোনও বার্বি ডলকে যে আপনার সঙ্গে দিঘা যেতে রাজি হবে!

ক্রুদ্ধ হতভম্ব সৌমিত্রকে একা বসিয়ে রেখে বেরিয়ে এল শম্পা। ভেতরে এক বুক কান্না। তাদের মায়ের মেয়ের ভীষণ বিয়ের শখ। বিয়ে হলে একটা পুরুষ হবে তাদের সংসারে। সে মাকে এনে রাখবে নিজের কাছে তার বর যদি মায়ের বাড়ি থাকতে না-ও চায়। কিংবা মায়ের কাছাকাছি থাকবে। একটা সমর্থ পুরুষের যে কী ভীষণ দরকার জীবনে, তা তার বাইশ বছরের জীবনে হাড়ে হাড়ে বোঝে শম্পা। সে জানে না, সে ঠিক করল কি না। সৌমিত্রর হয়তো কোনও অসৎ উদ্দেশ্যই ছিল না। সে হয়তো এখনই তাকে বউ ভাবতে শুরু করেছে। কিংবা হয়তো সে তার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করত। ওরা সত্যিই একটু হাই-সোসাইটির মানুষ। তারা যেমন বিয়ের আগে অদূরে ভাই কি মেসোমশাইকে বসিয়ে রেখে, মুখোমুখি বোঝাপড়া করে, ওদের সমাজে হয়তো সেটাই হয় এই রকম উইক-এন্ড ট্যুরে গিয়ে। আজকে সে তার আপাদমস্তক মধ্যবিত্ততাই প্রমাণ করে দিল সৌমিত্র দাসের কাছে।

পার্ক স্ট্রিট রাস্তাটা পার হওয়া খুব শক্ত। বিশেষত শম্পার চোখ ঝাপসা, মন বোধবুদ্ধি সবই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে। রাস্তার আলোকস্তম্ভ, যেখানে হলুদ, সবুজ, লাল সংকেত জ্বলে নেভে সে সেটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলেও বুঝতে পারছে না যেন পুরোপুরি।

'ব্লাডি বাস্টার্ড, ডার্টি হোর'—সে জেব্রা দিয়ে পার হচ্ছিল না, মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা দেখে পার হতে যাচ্ছিল। প্রায় চলে যাচ্ছিল একটা ফিয়েট য়ুনোর চাকার তলায়। গাড়ির বনেটের ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শ ঠিক মৃত্যুর স্পর্শের মতো তার কোমর ও ব্লাউজের মাঝখানের খোলা অংশে লেগে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর স্পর্শের কিছু শব্দ তার শরীর হিম করে দিল। গাড়িটা তাকে পাশ কাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একেবারে শাঁৎ করে চলে গেল। মুখে পাইপ এক মধ্যবয়সী মনে হল। না কি মধ্যবয়সী নয়? খুব বয়স্ক না কি? বিপরীত দিকের পেভমেন্টে সে এলই বা কেন? তাকে তো যেতে হবে উত্তরে, পার্ক স্ট্রিটটুকু সিঙ্গারের শোরুম আর এশিয়াটিক সোসাইটির পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গি রোডে পড়া। তারপর ট্রাম গুমটির দিকে যাওয়া, এই তো তার পথ। কেন সে রাস্তা পার হতে গেল। 'ব্লাডি বাস্টার্ড'টা না হয় পথ-চলতি মুখের কথা সাধারণ গালাগালি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু 'ডার্টি হোর?' তাকে একটা নোংরা পণ্য মেয়ের মতো মনে হচ্ছে লোকের? আজকাল? সাধারণত সে সালোয়ার কামিজই পরে, আজ পরেছে মায়ের একটা লাল রঙের সিল্ক। ঘন গাঢ় রক্তের মতো রংটা, এটা পরে তাকে খুব ভাল দেখায়। সবাই বলে। সৌমিত্রও আজ বলেছিল। একটা মোটা বিনুনি এখনও তার মাথার পেছনে, সৌমিত্রর খুব ইচ্ছে সে স্টেপ কাটে। কিন্তু অতগুলো চুল! একেবার স্টেপ কাটলে আর কিচ্ছু করার থাকবে না। তাই সে প্রাণ ধরে কাটতে পারছে না চুলটা। মাথার পেছনে হাত দিল সে, হেয়ার পিন দিয়ে কতকগুলো লাল গোলাপ আটকানো। পার্ক স্ট্রিটের মোড়েই ফুলগুলো গছাল একটা অল্পবয়সী ছেলে। সৌমিত্র কিনল। নিজে অবশ্য পরিয়ে দেয়নি। হাত স্টিয়ারিং-এ। বলল—পরে নাও শম্পা প্লিজ। এই ফুলগুলোই কি ওই গালাগালের কারণ! তার ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক। গরম পড়ছে বলে সে অন্য কোনও প্রসাধন করে না। চোখে ম্যাসকারা লাগায়নি। খালি হালকা বাদামি একটা আই শ্যাডো ব্যবহার করেছে আর আইব্রো পেনসিল দিয়ে চোখের ওপর পাতায় পলক ঘেঁষে একটা সরু লাইন। বোঝাই যায় না কিন্তু চোখে একটা শ্রী আসে। এতেই তাকে 'ডার্টি হোর'-এর মতো দেখাল? সৌমিত্ররও তা হলে ওই জাতীয় কিছু

লাগে নিশ্চয়ই। একটা সস্তা মেয়ে যাকে উইক এন্ডে এ. সি. গাড়ি করে দিঘা নিয়ে গিয়ে কিছু ফুর্তি করা যাবে? ছি, ছি, বিয়ের আগ্রহে, একটা নোঙরের আগ্রহে সে এমন চোরাবালির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে?

একটা ভাঙাচোরা পুতুল। হ্যাঁ, একটা মাটির পুতুল চোখের জলে যার অর্ধেকটা গলে গেছে, আর ক্রোধের আগুনে যার বাকিটা জ্বলে গেছে। এই হল শম্পা, বাড়ির রাস্তা পার হয়ে সে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের দিকে চলে যেতে থাকল। আসলে তার বাড়ি সে পেরিয়ে গেছে সে খেয়ালই তার হয়নি। নিজের রাস্তা সে চিনতে পারছে না।

—এই শম্পাদি কোথায় যাচ্ছিস রে?—শম্পা সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার—'এই শম্পাদি' শুনে তাকে ফিরে তাকাতেই হয়।

বাবুল। প্রতিবেশী এই ছেলেটি একেবারে এক নম্বরের ভাল ছাত্র। এবার জয়েন্টে সেকেন্ড এসেছে। যাদবপুরে বোধহয় কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং কি ইলেকট্রনিক্স এরকম কিছু পড়ছে। বাবুলের ফর্সা নিষ্পাপ চশমা পরা মুখটার দিকে তাকিয়ে শম্পা যেন একটু একটু করে তার চেনা পৃথিবীতে ফিরে এল। ওই তো বাবুলদের বাড়ি, গায়ে গায়ে লাগা সুপ্রিয়াদের বাড়ি। সে তার বাড়ি পেছনে ফেলে এসেছে।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।

—তার মানে! আমি তো ভাবলুম তুই আমাদের বাড়িতেই আসছিস, দিদি এসেছে খবর পেয়েছিস।

—না, আমি মিন্টির কাছে যাচ্ছি না। কোথাও যাচ্ছি না। বাড়িও যাচ্ছি না।

বাবুল ওর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল—তুই কি কেঁদেছিস না কি রে, গালময় জলের দাগ। তোর পাউডার ধেবড়ে গেছে।

—পাউডার আমি মাখি না।

—মেয়েরা পাউডার মাখে না! এটা তুই আমাকে খাওয়াতে পারবি না।

—ঠিক আছে, আমায় বিরক্ত করিস না।

—আরে মাসিমা বকেছেন তো হয়েছে কী? এমন বকলেন যে তুই লাল শাড়ি পরে একেবারে সুইসাইড করতে চললি! কোন সাইটটা বাছলি। হেদো তো পেছনে ফেলে এসেছিস? দেশবন্ধুর পুকুরই এখন নিয়ারেস্ট। তা মাইল দুয়েক তো হবেই! হ্যাঁ রে পুকুরটা এখনও আছে তো!

শম্পা বলল—আমাকে বিরক্ত করিস না।

—ও বুঝেছি। ট্রাম লাইনে মাথা দিবি। জীবনানন্দকে চাপা দেবার পর থেকে ট্রাম কোম্পানি খুব সাবধান হয়ে গেছে রে! একে তো লালবাতি জ্বলতে চলেছে তার ওপর যদি আরও কলঙ্ক বাড়ে...

শম্পা ফিরে দাঁড়াল। —ঠিক বলেছিস।

—কী ঠিক বললুম!

—ওই যে সুইসাইডের কথাটা!

—সত্যি তুমি সুইসাইড করতে যাচ্ছিলে?

—যাচ্ছিলাম না, কিন্তু তুই সাজেস্ট করতে এখন মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ আ বেস্ট ওয়ে।

—একটা সাজেশন যখন নিলে শম্পাদি, তখন আরেকটাও নাও।

—মানে?

—আমি বলছিলুম তুমি সুপ্রিয়াদির সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা মেরে এসো। চমৎকার একটা সুইসাইডের অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

শম্পার মুখে একটা ফিকে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের সুপ্রিয়া চাটুজ্জে একটি বিখ্যাত বিশ্বনিন্দুক এবং ঝগড়ুটে। ওর মতে একজন যদি হয় ডাফ লেনের ছাগল তো অন্য আরেকজন বেথুন রো-এর আরশুলো। বাবুলকে দেখলেই বলে—কী রে, যাদবপুর তো হয়ে গেল? এখনও মাস্টারগুলোকে তেল মারছিস? অবশ্য বাবুলকেই একমাত্র কথাটা সামনে বলে, অন্যদের ক্ষেত্রে বলে পেছনে। কে পাকা কুমড়ো কিন্তু কচি শশাটি হবার সাধ হয়েছে, কে আবার কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম, কে বা কাকিনী, এই রকম। সুপ্রিয়াদির গুণমুগ্ধ একটা ছোট দল যে পাড়ায় নেই, তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগই ওর এই স্বভাবে বিরক্ত। বাবুল যেমন শম্পাও তেমন ওকে এড়িয়ে যায়। সামনে পড়ে গেলে হয়তো বলবে—কী রে, মায়ার ছোটপিসির মতো ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস না কি? দেখতে পাই না কেন আজকাল? এর পরই মায়ার ছোটপিসির গল্পটা সবিস্তারে বলবার জন্যে ছটফট করবে সুপ্রিয়াদি। তখন তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়াই এক দুষ্কর ব্যাপার। প্রতিভার তোড় এসেছে তো!

বাবুলই বলে—কবিরা যেমন প্রেরণার তোড়ের মাথায় যা আসছে তা লিখে ফেলতে না পারলে খেপে যায়, সুপ্রিয়াদিও তেমন নিন্দের তোড় এলে আর সামলাতে পারে না। কাপড়-চোপড়ে হয়ে যায়, বুঝলি?

শম্পা এখন বলল—ভাল বলেছিস। সেই অর্জুনের আত্মঘাতী হবার জেদ চাপল আর কৃষ্ণ অমনি তাকে বুঝিয়ে দিলেন, বেশ খানিকটা আত্মপ্রশংসা করে নাও, তা হলেই আত্মহত্যার কাজ হয়ে যাবে!

বাবুল বলল—এটাও আমার অরিজিন্যাল রাখতে দিলি না? তোরা মহাভারত-টারত এত পড়ে রাখিস কেন রে? নাঃ এবার ল্যাটিন অ্যামেরিকান পড়তে হবে। নইলে আর তোদের কাছে পাত্তা পাচ্ছি না।

বাবুল পাশে পাশে হাঁটছে। যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, আবার সবার সঙ্গে মেলামেশাও করে খুব। চমৎকার হালকা কথাবার্তা বলতে পারে। হঠাৎ শম্পার মনে হল—এই যে নিষ্পাপ, হাসিখুশি বাবুল এ-ও তো ভাল পড়াশোনা করছে, সেই সুবাদে ভাল চাকরি-বাকরিও পাবে, তখন ওরও কিছু সাবর্ডিনেট মেয়ে থাকবে, আর একটা এ.সি. গাড়ি, আর ওয়ালেটে অনেক পয়সা, আর একটা মাত্র উইক-এন্ড ছাড়া ছুটিও থাকবে না। সারাক্ষণ কাজে যোতা। তা, ও-ও কি একটি পছন্দের সাবর্ডিনেট মেয়েকে ওর সঙ্গে উইক-এন্ড-এ দিঘা যেতে বলবে? তো সেই মেয়েটি হয়তো শম্পার মতো ডাফ স্ট্রিটের পুরনো বাড়ির বাপ-মরা লড়াই-করা মায়ের লড়াই-করা বিস্তর কমপ্লেক্সঅলা মেয়ে নয়, সে হয়তো 'দেবাঞ্জলি' কি 'আকাশ প্রদীপ' জাতীয় ফ্ল্যাটে থাকে, অনেক আধুনিক, অনেক মডার্ন। দিঘার হোটেলের ডাব্‌ল বেড এ.সি. রুমে বাবুল কন্ডোম বার করলে হয়তো সে মেয়েটি অবাক তো হবেই না, নিশ্চিন্ত হবে, কারণ তার ব্যাগেরটা আর বার করতে হল না। তারপর হয়তো চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে দুজনে দুদিকে চলে যাবে, বাবুলের অন্য কোনও উইক-এন্ড অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে যুগলে বেড়াতে যাবার পথে হিংস্র ফণা তুলে, কিংবা দুচোখ ভর্তি গরম জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আড়চোখে সে বাবুলের দিকে চাইল। চশমাটা ঠেলে নাকের ওপর ওঠাচ্ছে বাবুল। একটা মোটা-কালো ফ্রেমের চশমা পরেছে। তাতেও তার মুখের ছেলেমানুষি যায়নি। কিন্তু ভী-ষণ সেয়ানা ছেলে। শুধু পড়াশোনাতেই নয়।

—বাবুল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কর না। আবার অনুমতির কী আছে? ওই সুইসাইড সম্পর্কিত নয়তো, যদি আমাকে কয়েক ফাইল সিডেটিভ জোগাড় করে দিতে বলিস, সেটা পারব না কিন্তু।

—বাজে বকিস না। তোরা, মানে তুই মেয়েদের সম্পর্কে কী ভাবিস? বলবি? আমি তোর দিদির মতো!

—তোরা, মানে তুই'টাতে আমার খুব আপত্তি আছে শম্পাদি। আমি হলাম একটা আলাদা ব্যক্তি,

আমি আমার মতো ভাবি, ওরা মানে আমার পেছনে যদি পুরো আমাদের জেনারেশনের ছেলেগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিস তা হলে আমাকে ভেবে ঠিক করতে হবে, মানে একটু বিশ্লেষণ করে নিতে হবে এই আর কি। আমার দ্বিতীয় আপত্তি হল 'দিদির মতো' কথাটায়। মতো টতো কেন? তুই তো আমার একরকম দিদিই হলি, মিন্টির মতো নিজের দিদি নয়, কিন্তু পাড়াতুতো দিদি তো!

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোর পাড়াতুতো দিদি। কিন্তু তুই মেয়েদের সম্পর্কে তোর নিজস্ব ধারণার কথাও বল, আবার একটু জেনার‍্যালাইজও কর, প্লিজ।

বাবুল বলল—এইরকম হাঁটতে হাঁটতে? যদি গাড়ি চাপা পড়ি? কিংবা সুপ্রিয়াদি এসে পড়ে? জানলায় চোখ রেখে দেখছে হয়তো এখন।

—তা হলে কীভাবে বলতে চাস?

—একটু 'গজব'-এ খাওয়া না রে শম্পাদি। হেভি চাকরি করিস তো!

—তুইও তো হেভি স্কলারশিপ পাস?

—আমি? স্কলারশিপ? জানিস না ফ্যামিলির উপার্জন পাঁচ-টাচের বেশি হলে স্কলারশিপটা দেয় না। ওই কুমিরছানার মতো দেখিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে একটা সার্টিফিকেট দেয়।

—তাই বুঝি? জানতুম না তো!

—কত কিছুই জানিস না এ পৃথিবীতে। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানিস বল, অথচ চাকরিতে ঢুকে অব্দি কেমন একটা সবজান্তা, সবজান্তা ভাব করিস। তবে ন্যাশন্যাল ট্যালেন্টেও আমি একটা স্কলারশিপ পাই। তোকে বাজে কথা বলব কেন? তা, সেটা তো বই-টই কিনতেই চলে যায়।

—কী খাবি?

—রেশমি কাবাব চিকেনের। আর আইসক্রিম। তোর রেস্তয় কুলোবে তো? দুজনেই খাব কিন্তু।

সত্যি খিদে পেয়েছে। দা-রুণ! শম্পা নিজের ব্যাগের ভেতরটায় উঁকি দিয়ে বলল—হ্যাঁ হয়ে যাবে। দাঁড়া মায়ের জন্যও একটা প্যাকেট করে দিতে বলি।

অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে, বাবুল বলল—এবার বল তোর হবু বর সৌচিত্র না সৌমিত্র, পদবি জানি না, তোকে এমন কী বলেছে যে তুই কেঁদে মুখের মেকাপ ধুয়ে ফেললি?

এত অবাক শম্পা জীবনে কখনও হয়নি।

সে বলল—সৌমিত্রর কথা তুই কী করে জানলি?

—সবাই জানে পাড়ায়। পাড়ায় জামাই আসছে, সব হাত ধুয়ে বসে আছে, কখন পাতে পোলাও পড়বে।

—সর্বনাশ! আলাপ, একটু বেশি আলাপ হলেই বিয়ে? এই তোর তোদের মেয়ে সম্পর্কে ধারণা?

—তোরা তো ঝুলে পড়তে পারলেই বেঁচে যাস। যে প্রথম অ্যাপ্লিক্যান্ট তারই সঙ্গে।

—সেটা উচিত নয় বলছিস?

—অবশ্যই নয়, প্রেমে হাবুডুবু খাস তো আলাদা কথা, তখন আর তোদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু আদারওয়াইজ একটু বাজিয়ে নেওয়া তো দরকারই।

—তুই, তুই কী ভাবে বাজিয়ে নিবি?

—আমি? আমার কথা উঠছে কেন?—বাবুল চোখ গোল গোল করে বলল।

—কেন, তুইও তো একদিন বিয়ে করবি?

—আমার কথা তো হচ্ছিল না, হচ্ছিল মেয়েদের কথা।

—বেশ। মেয়েদের কথাই বল। কী ভাবিস তোরা মেয়েদের?

—ছিঁচকাদুনে, রাগী, হিংসুটে, তিলকে তাল করা, তালকে তিল করা, কুচুটে...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে আর বলতে হবে না—শম্পা বলল। তার মুখে রাগ নেই। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট পড়া যায়।

—আরে শোনই না, তারপরে মেয়েরা সেলফলেস, স্যাক্রিফাইসিং, অ্যাডজাস্টিং, অসম্ভব টলারেন্স, একটু রক্ষণশীল। খুব নির্ভরযোগ্য।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছি...প্রথমে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে তারপরে তেল মারছিস। তুই যা বললি মানুষ সব মানুষই মোটামুটি এইরকম ভালমন্দের মিশ্রণ...

—এগজ্যাক্টলি। মেয়েরা আলাদা কিছু নয়। ঠিক ছেলেদেরই মতো। ধরন-ধারণগুলো একটু আলাদা, বুঝলি? নইলে এ-ও যেমন সময়ে কুচুটে, ও-ও তেমন সময়ে ক্লিকবাজ। আর এক্সপ্লয়েট করতে পেলে দুজনেই ছাড়বে না। যেমন দ্যাবা, তেমন দেবী। সুপ্রিয়াদি সুবিমলদাকে ভালমানুষ পেয়ে এক্সপ্লয়েট করছে, আবার আমার সমীরকাকু কাকিমাকে দুর্বল পেয়ে এক্সপ্লয়েট করছে। তবে ছেলেরা ছিঁচকাঁদুনে নয়।

—ছিঁচরাগুনে তা হলে...

—যা বলিস। আর একটা মস্ত ডিফারেন্স হল তোরা যেমন কাউকে পাকড়াও করতে পারলেই ঝুলে পড়তে চাস, ছেলেরা তেমন পাকড়িত হলেও পকৌড়ি হয়ে যেতে চায়।

—মানে?

—মানে ফুটে যেতে চায় আর কি! খাও, দাও, বেড়াও, এক্ষুনি আবার বিয়ে কী? অমনি তো বউয়ের দাঁত কনকন, পেট কনকন শুরু হবে। কে অত ঝামেলা পোয়ায়? বুঝলি না? তোদের চলনটা সেন্ট্রিপিট্যাল, আমাদের সেন্ট্রিফুগ্যাল। কেন্দ্রা—ভিগ, আর কেন্দ্রা—তিগ বুঝলি তো?

৪

আকাশ। আকাশ কি এমন শাদা হয়? হয়। নীল আকাশ সাদাটে হয়ে আছে, কিংবা সাদা মেঘে-মেঘে সাদা হয়ে গেছে এমনটা দেখা যায়। কিন্তু এমন ধোবার বাড়ির পাটভাঙা থান কাপড়ের মতো শাদা? চারদিকে একটা এমনই শাদা আকাশ। শাদা আকাশের কোলে শুয়ে একটা শাদা প্রেতের মতো মানুষ। চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে আরও কিছু শাদা প্রেত। শাদা শাদা বাসনকোসনে শাদা শাদা জিনিস রান্না করছে প্রেতেরা। নাঃ সে প্রেতেদের রান্নাঘর আর দেখতে পারে না। একটা শাদা ভেলায় সে হাত রাখে, অমনি তার পুরো শরীরটাই ভেলাটার ওপর আড় হয়ে পড়ে। কেউ তাকে ভেলায় তুলে নিতে চাইছে, কিন্তু তার সাধ্যে কুলোচ্ছে না। একটা গলে-যাওয়া ভ্যানিলা আইসক্রিমের কাঠির মতো সে ক্রমাগত সেই শাদা আকাশে না কি শাদা সমুদ্রে পিছলে পিছলে যেতে থাকে। ক্ষীণ কতকগুলো কণ্ঠ অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।

হঠাৎ টলমল করতে থাকে শাদা সিলিংঅলা একটা ঘর। সবুজ পর্দা। শাদা শাড়ি টান টান করে পরা—ক্যাপ মাথায় কড়কড়ে একজন নার্স। তার হাতটা ধরে-থাকা, এপ্রন-পরা এক দোহারা চেহারার ভদ্রলোক। চশমা-পরা, সোনালি ফ্রেমের।

—সিস্টার, আপনি একটু যান তো। আমি পেশেন্টের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সামনে থেকে শাদা ছায়া সরে যায়।

—আপনার নাম কী? মনে করতে পারছেন?

—অম্...রি...তা গোস্।

—থাক ঠিক আছে।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

কোনও উত্তর এল না।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

এবারও কোনও উত্তর নেই।

—আপনি কীভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকঠাক বলুন তো।

—যাইনি।

—অজ্ঞান হয়ে যাননি? তা হলে...

—করে।

—করা হয়েছিল?

পেশেন্ট সামান্য একটু মুখ হাঁ করে, ডাক্তার ফিডিং-কাপ থেকে জল ঢেলে দেন মুখে।

—কত দিন পিরিয়ড বন্ধ হয়েছে আপনার?

—চা চা...

—চার মাস? কাউকে বলেননি?

—শুনুন, আমি বলছি আপনি শুনে যান। চোখদুটো খুলুন। হ্যাঁ সুদ্ধু শুনে যান—আপনার চার মাসের প্রেগন্যান্সি। আপনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে এই নার্সিং হোমে আনা হয়েছে। ওঁরা মানে আপনার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ক্রেইম করছেন, আপনি থেকে থেকেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেগন্যান্সি সুতরাং টার্মিনেট করে দিতে হবে। আপনারও কি তাই মত!

—জা-নি না।

—সত্যি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন?

—না।

—শুনুন, এখন ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আর শুধু শুধু প্রথম সন্তান নষ্টই বা করবেন কেন? উনি আপনার লিগ্যাল স্বামী তো?

—বি...য়ে...হয়।

—বেশ, তা হলে বাচ্চা নষ্ট করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আলট্রা সনো করে দেখে নিয়েছি, বাচ্চা পার্ফেক্ট। এখন শুধু শুধু সম্পূর্ণ বিনা কারণে ভ্রূণ হত্যায় মানুষ হিসেবে ডাক্তার হিসেবে আমার এথিক্স-এ বাধছে। আপনারও কি নষ্ট করাই মত!

—ওর বা চ্ চা।

—শুধু ও কেন? কী আশ্চর্য! আপনারও তো। আপনারও তো ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। অধিকার আছে।

—ওর বা চ্ চা—না।

—অন্য কারও বাচ্চা?

—না, চাই না।

—ও, ওই স্বামীর বাচ্চা আপনি চান না?

পেশেন্ট আবার একটু মুখ হাঁ করে, ডাক্তার জল দেন।

—শুনুন, বুঝতে পাচ্ছি, স্বামীর ওপর আপনার আস্থা নেই। কিন্তু ওই ভ্রূণটির অর্ধেকটা আপনার। মোটেই ও পুরোপুরি আপনার স্বামীর নয়। আপনি ঘুমোন। আজকের দিনটা ঘুমোন। একটু পরেই আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপনাকে দেখতে আসবে। তখন চোখ বুজিয়ে, অজ্ঞান থাকবার ভান করবেন। আপনি আরেকটু সুস্থ হলেই আপনার সঙ্গে আবার কথা বলব।

নার্সটি ঘরে এলেন। ডাক্তার তার সঙ্গে নিম্ন স্বরে কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর চলে গেলেন। নার্স স্যালাইন লাগাবার আয়োজন করতে হাতটা টেনে নিতে চাইল সে। লাগল। সিস্টার এসে তাড়াতাড়ি হাত ধরলেন—স্যালাইন চলবে। হাত ঝাঁকাবেন না। শরীরের যা অবস্থা করেছেন! চুপ করে থাকুন।

কতক্ষণ পরে, তার খেয়াল নেই, সে কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

অরিসূদনের গলা—কেমন আছে এখন?

সিস্টার—ভাল না। স্যালাইন চলছে, দেখছেন না?

অরিসূদন—জ্ঞান ফেরেনি?

—একবার ফিরেছিল, আবার...তবে এটা ঠিক অজ্ঞান অবস্থা নয়, শরীরটা খুব দুর্বল তো, তাই আবার একটা আচ্ছন্ন অবস্থা এসেছে। আপনারা যথেষ্ট যত্ন নেননি, যাই বলুন। ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি।

—স্ত্রীকে কীভাবে যত্ন করতে হবে সে বিষয়ে আপনার মতামত আমি শুনতে চাই না।

—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমি ট্রেইন্ড নার্স, আমার মতামত জানাবার অধিকার আছে।

ডাক্তারের গলা। বাইরে থেকে ভেতরে এলেন বোধহয়। —হ্যাঁ সব ঠিকই আছে মিঃ গোস্বামী। কিন্তু জেনারেল হেল্‌থের অবস্থা ভাল না। একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তার পরে।

অরি—শুনন, পেশেন্ট আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

—সে কী? ডাক্তার হিসেবে আমি সেটা অ্যালাও করতে পারি না।

—আমরা বন্ড সই করে নিয়ে যাব।

—পেশেন্টের পার্টি যদি পাগল হয়, আমরা তো আর পাগলামো করতে পারি না। আই'ল আস্ক ইউ টু গো আউট নাউ, মিঃ গোস্বামী। দ্য পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ ইন ডেঞ্জার, শী মাস্ট বি লেফ্‌ট ইন পিস।

৫

সকাল সাতটা। কোল্যাপসিবল্‌-এ গোঁজা খবরের কাগজ টেনে নিল তিলক। ওর বাবা বললেন—আমাকে আগে দে। বাবা চা-এ চুমুক দিচ্ছিলেন। তিলক বলল—কাল পাকিস্তান-সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা কী হল দেখেই দিচ্ছি। লোডশেডিং-এ তো দেখতে দিলে না।

বাবা বললেন—তোর কি এখনও আশা পাকিস্তান ১৩৫-এর কম করবে; আর ইন্ডিয়ার মরা চান্স আবার জিইয়ে উঠবে? আমি বলে দিচ্ছি দেখে নে পাকিস্তান সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। তিলক বলল—শচীন-সৌরভ একা কী করবে বলো! বোলার নেই একটা। ম্যাচ-উইনিং বোলার দরকার।

বাবা বললেন—আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি—ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নয়, মেন অফ দ্য ম্যাচ করা উচিত। একটা ব্যাটসম্যান আর একটা বোলার। বোলাররা তো পায়ই না। এভাবেই মোটিভেশন নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর যেমনই খেলুক, টাকাটা বাঁধা। শচীনই তো একবার পারফর্ম্যান্স বেজড পেমেন্টের কথা বলেছিল। করুক না সেটা। দেখবে হই-হই করে ম্যাচ জিতে আসছে।

তিলক বলল—যেটা জানো না, সেটা নিয়ে কথা বোলো না বাবা। আ ম্যাচ ইজ আ ম্যাচ। খেলবার সময়ে অত মনে থাকে না কি টাকা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না!

—বেশ মনে থাকে, ইনজামাম অতগুলো ছয় হাঁকড়াল কেন তা হলে তাক করে করে? সুপার সিক্স?

—ভেদড়ুশ মার্কা বোলিং হলে সিক্সার হাঁকড়াবে না তো কী! বলতে বলতে তিলক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাংলা কাগজের প্রথম পাতার তলায় অমৃতার ছবি। হ্যাঁ, অমৃতা-ই তো! নামী নার্সিংহোম থেকে রোগিণী নিখোঁজ। অফিসঘর ভাঙচুর, ডাক্তার প্রহৃত। হেডলাইন থেকে বিশদে যায় সে—গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় অমৃতা গোস্বামী নামে একটি বছর বাইশের রোগিণীকে 'উজ্জীবন' নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। মেয়েটি বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। রাত পর্যন্ত সে আচ্ছন্ন ছিল, তিন নং কেবিনের নার্স মায়াবতী সরকার জানিয়েছেন। সকালবেলায় দেখা যায় তার শয্যা শূন্য। মেয়েটি ঘোরের মধ্যে কোথাও চলে গেছে কি না—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়, খোঁজও শুরু হয়, কিন্তু তিনতলা এই নার্সিংহোম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। অতঃপর ভিজিটিং আওয়ারে রোগিণীর স্বামী

ও শ্বশুর এ কথা জানতে পারলে, স্বামী অরিসূদন গোস্বামী ডাক্তারের চশমা কেড়ে নিয়ে তাঁকে মারধর করেন, বাইরে জনতা জমে। রোগিণী হারিয়ে গেছে এই অভিযোগে জনতা উত্তাল হয়ে ওঠে, ওই নার্সিংহোমের এনকোয়ারি কাউন্টার চেয়ার বসবার সোফা তছনছ করে দেয়। পুলিশ আসার ঘণ্টা দুই পরে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতাল থেকে না হয় কুকুরে গরিব মানুষের বাচ্চা মুখে করে নিয়ে যেতে পারে, গরিব মানুষ তো মানুষ বলেই গণ্য নয়। কিন্তু নামী নার্সিংহোমের মধ্যেও যদি এই জাতীয় কুকুরের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আরম্ভ হয়ে যায়, এবং শিশুর জায়গায় সে কুকুর যদি যুবতী হরণ করতে থাকে তা হলে তো সত্যিকার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়!

—কী হল? তুলু?

—বাবা দেখো।

—কী পাকিস্তান জিতেছে।

—উঃ ও সব নয়, আমাদের বন্ধু, য়ুনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়ি আমরা—অমৃতা গোস্বামী।

—কী হল? সিনেমায় নেমেছে?

—উঃ না, দেখো না খবরটা।

বাবার হাতে কাগজটা তুলে দিয়ে মুখোমুখি সোফাটায় ধপাস করে বসে পড়ে তিলক। হঠাৎ সব বন্ধু-বান্ধবের অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে থেকে ত্রিমাত্রিক ছবির মতো ভেসে ওঠে অমৃতার চেহারাটা। অমৃতা, একটু গম্ভীর, কিন্তু রসকষহীন মোটেই নয়, সেই অমৃতা যাকে কথায় কথায় ওরা খেপাত, জে.বি.-র ফেভারিট অমৃতা গোস্বামী। বিবাহিত মেয়ে বলে গোড়ায় গোড়ায় ওর দিকে বেশি ঘেঁষেনি তারা। কিন্তু দূরত্ব খুব শিগগিরই ঘুচে যায়। কত আড্ডা মেরেছে কফিহাউজে। ওর অবশ্য সব সময়ে একটা তাড়া থাকত, চারটের পর আর বসতে চাইত না। খুব দায়িত্বশীল মেয়ে। কী করল এই ডাক্তার? অযত্নে মেরে ফেলেছে, তারপর বডি কোথাও পাচার করে দিয়েছে? কেন? এতেও তো মার খেল। অযত্নে মরে গেলেও মার খেত। কী-ই বা এমন হল অমৃতার? হঠাৎ? এই গত সপ্তাহটায় বোধহয় ক'দিন আসেনি। তার আগে পর্যন্ত তো এসেছে, সমস্ত ক্লাস করেছে, নোট নিয়েছে, ক্যান্টিনে খেয়েছে। এক প্লেট মাংস নিয়ে পাঁউরুটি দিয়ে খাচ্ছিল। অনেকটা ঝোল নিয়েছিল। ওর পাশে ছিল দোলা, যাকে ওরা আদুরি কিংবা 'দোল দোল দোলুনি/রাঙা মাথায় চিরুনি' বলে খেপায়। দোলা বোধহয় একটা ফিশফ্রাই নিয়েছিল। তিলক বলল—'তোদের বেশ পয়সাকড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে, এ অধমের দিকে একটু তাকা...

দোলা তাকে বলল—আজকে অমৃতা খেয়ে আসতে পারেনি, তা জানিস, ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে, ও বাসভাড়া ছাড়া পয়সা পর্যন্ত আনেনি। অমৃতার দিকে চেয়ে বলল—একটু চেক করে নিবি তো পার্সটা। আশ্চর্য! তারপর আবার তিলককে বলল, আমি ওকে খাওয়াচ্ছি। কিন্তু তিলক, তুই তো আর শ্বশুরবাড়িতে নেই যে শ্বশুরবাড়ির ডিউটি সেরে খেয়ে আসবার সময় পাসনি। আর তোদের তো শ্বশুরবাড়ি হলে তোরা রাজা লোক, তোদেরই সবাই খাওয়াবে আমরা হাঁ করে দেখব...

অমৃতা মন দিয়ে হাড় থেকে মাংস ছাড়াচ্ছিল দাঁত দিয়ে, 'শ্বশুরবাড়ির ডিউটি' বলতে সে শুধু একবার দোলাকে বকেছিল—'আঃ দোলা!' আর একটিও কথা না।

দোলার সাতকাহন শুনে তিলক বলেছিল—খাওয়াবি তো একটা ফিশফ্রাই কি একটা এগরোল। অত বক্তিমে কীসের রে? যাঃ তোকে খাওয়াতে হবে না। তিলক মজুমদারের পকেটেও পয়সা থাকে।

সেই অমৃতা, শেষ! শেষই তো! শেষ ছাড়া কী? কী আর হতে পারে!

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ধরল তিলক—আমি নিশান বলছি। আজ সকালের কাগজটা...।

—হ্যাঁ এইমাত্র দেখলাম। দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি।

—হাইলি সাসপিশাস। বুঝলি? সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং সামহোয়্যার।

—সে তো বটেই।

—সেই বন্দনা মুখুজ্জের কেসটা দেখলি না, আজও সলভ্‌ড হল না। একটা র‍্যাকেট আছে নিশ্চয়ই এর পেছনে।

নিশান ফোন রাখতেই দোলার নম্বরটা টিপল তিলক। দোলারই সবচেয়ে বন্ধু ছিল অমৃতা। দোলা হয়তো কিছু বলতে পারবে।

—দোলা আছে? আমি তিলক বলছি।

—এ মা! আমার গলাটা তুই চিনতে পারলি না? আসলে কাল থেকে ঠাণ্ডা লেগে...

—বাজে কথা রাখ। আজকের কাগজ দেখেছিস? বাংলা কাগজ আনন্দবাজার...

—আমাদের বাড়ি তো আনন্দবাজার শুধু শনি রবিবার নেওয়া হয় রে! কেন পরীক্ষাটা এগিয়ে এল, না কী?

—অমৃতার সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে কাগজে।

—কী—ই—ই—ই? দোলার 'কী'টা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল, উপরন্তু তীক্ষ্ণ আঘাত করল তিলকের কানের পর্দায়।

—হ্যাঁ, 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে নিখোঁজ। রাত্তিরবেলাও আচ্ছন্ন ছিল। ভোরবেলা দেখা যাচ্ছে নেই।

—বলিস কী রে? কালকে আমরা ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। কেউ ছিল না।

—কে কে গিয়েছিলি?

—আমি আর লাবণি। পাড়ার একটা ছেলে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, বলল ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সাদা অ্যাম্বাসাডার-এ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর বরের অফিসের গাড়ি।

—তা হলে তো সব মিলে যাচ্ছে। ডাক্তারটা একটা কেলো করেছে চিকিৎসা নিয়ে...তারপর...

—শোন তিলক, ওই ছেলেটা বলছিল, ওপরের ফ্ল্যাটের ওরাও বলছিল—ওরা লোক ভাল না। ছেলেটা আমাদের ওর বাপের বাড়িতে খবর দিতে বলেছিল।

—দিয়েছিলি?

—না। ওর মায়ের হার্টের অবস্থা জানিস তো? ভেবেছিলাম আজকে য়ুনিভার্সিটি যাব না। ওদের বাড়ি গিয়ে আবার খোঁজ নেব। খবরটা ওঁদের দিইনি।

—ভাল করেছিস। এখন খোঁজ নিয়ে কী করবি? তার তো বডি গাপ্‌ হয়ে গেছে।

—কী আজেবাজে বলছিস। —দোলা ককিয়ে উঠল—না, কক্ষনো না। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে দোলা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মা ছুটে এল, বাপি ছুটে এল। সব শুনল।

বাপি বলল—ও বাড়িতে তুমি আর যেও না দোলা। খুব ফিশি ব্যাপার মনে হচ্ছে।

মা বলল—যাবে না মানে? তুমি তো অমৃতাকে চেনো। অমৃতার অত বিপদ। দোলা ওর বন্ধু। অমনি যাবে না বলে দিলে? ওকে এসকেপিস্ট হতে শেখাচ্ছ? স্বার্থপর হতে শেখাচ্ছ?

বাপি বলল—তারপর দোলা যাক আর অমৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিক। তা হলে তোমার পরার্থকাতরতার লেস্‌নগুলো ঠিক-ঠিক কাজে লাগবে তো?

দোলার হাউ হাউ কান্না তখন ফোঁপানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বাপিকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমার ভীষণ ভয় করছে বাপি। অমৃতাকে ওরা ভাল করে খেতে দিত না। সংসারের সমস্ত কাজ করাত। ওর পাড়ার একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে আমাদের বলে গেল ওর মা-বাবাকে খবর দিন। বধূ-হত্যার কথা কি আপনারা শোনেননি? আমি মাসির হার্ট খারাপ বলে কিছু বলিনি। এখন কাগজে এই খবর দেখে ওঁর কী হবে? কিছু করো বাপি, কিছু করো, কিছু একটা...

মা সব শুনে বলল—ব্যাপারটা তো আরও গোলমেলে হয়ে গেল। নার্সিংহোম থেকে উধাও শুনে ওরাই তো এসে ডাক্তারকে ঠেঙিয়েছে। তো ডাক্তারের সঙ্গে কি কোনও যোগসাজস না কী? লোক-দেখানো মারধর?

বাপি বলল—এ সব কেসে ফট করে একটা জাজমেন্ট দেওয়া খুব শক্ত। পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে সত্য কী। এও বলি—অমৃতার বাবা মা দেখেশুনে একমাত্র মেয়ের ওইরকম বিয়ে দিলেন?

মা বলল—বাইরে থেকে দেখতে শুনতে তো খারাপ না। দোলা তো দেখেছে ওর বরকে? কী করে রে?

—সি.ই.এস.সি.-র এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। বেশ ভাল চেহারা। তবে আমার একটু রাফ লেগেছিল মা। ছবিতে বেশ। সামনে কেমন রাফ।

—তবে? মা বাবার এক ছেলে, ভাল চাকরি করে, চেহারা স্বাস্থ্য ভাল, নিজেদের ফ্ল্যাট রয়েছে। সাধারণ মানুষ আর কী চায়?

—বাইরে নয়, ভেতরে দেখতে হয়। আশেপাশে খোঁজ নিতে হয়।—সব্যসাচী বললেন।

—আশপাশের লোক কি চট করে খারাপ কিছু বলবে? প্রথমত আজকাল এক ফ্ল্যাটের লোক আরেক ফ্ল্যাটের কিছু জানে না, তারপর খারাপ-টারাপ লোকে চট করে বলতেও চায় না। বলবে ভাঙচি দিয়েছে।

—আমার মেয়ের বিয়ের সময়ে কিন্তু আমি সব দিকে খোঁজ নিয়ে তবে এগোব, শার্ট উল্টো করে তার সেলাই দেখার মতো, যাকে বলে ইনসাইড আউট।—সংকল্পে ঠোঁটে ঠোঁট বসে গেল সব্যসাচীর।

বাবা মায়ের কথা শুনে দোলার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ টিপ্ শুরু হয়ে গেল। আজ অবধি মাকে লুকিয়ে তো কিছু করেনি! এই প্রথম। এর সঙ্গে মিশেছে অমৃতার নিরুদ্দেশের খবর।

শম্পাও দেখেছিল খবরটা। সকালবেলা কাগজ খুলেই অমৃতার ছবি। সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

—মা, মা, ও মা!

—কী রে! অমন করে ডাকছিস কেন? পিঠে মশা কামড়াল?

—মা, শিগগিরি।

মা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ছুটে এলে সে শুধু কাগজটা মার হাতে ধরিয়ে দিতে পারল।

নিবেদিতা, শম্পার মা দু-চার লাইন পড়েই কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিলেন। মানে, হাত থেকে পড়ে গেল কাগজটা।

—এ কী খবর? এ কি সত্যি?

শম্পা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল। আলগা গলায় বলল, এই তো গত সপ্তাহেই য়ুনিভার্সিটি লনে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। ও আমাকে কত উপদেশ দিল।...শম্পার চোখ উপচোতে থাকল, ধরা গলায় সে বলল—আমি কত ঝগড়া করলুম।

—কী তবে হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বলেছিল?

—উঁহু।

শম্পা আর কথা বলতে পারছিল না। সে তার ঈর্ষার সবটাই উজাড় করে দিয়ে এসেছিল। কী যে বিশ্রী একটা তুলনামতো করেছিল অমৃতার পতিগর্বে আঘাত দিতে!

—অদ্ভুত অদ্ভুত অসুখ হয় একেক সময়ে। অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাওয়া...নার্ভের কিছু। কিন্তু গেল কোথায়?

শম্পা বোবা গলায় বলল—মা, 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম কোনটা বুঝেছ?

—কোনটা?

—প্রথমে যেটার নাম ছিল 'জীবন'। বাবা যেখানে...মা কতদিন আগেকার কথা। তবু আমার স্পষ্ট মনে আছে ওই নার্সিংহোমটার পেছনে একটা বড় পুকুর ছিল...

—হ্যাঁ, তাই তো! বাঁধানো ঘাট, চারদিকে গাছপালা, নীলরতন সরকারের কম্পাউন্ডে যেমন আছে...অত বড় নয়।

—মা যদি ও ঘোরের মধ্যে চলতে চলতে...

নিবেদিতা মেয়ের মুখের ওপর হাত চাপা দিলেন। অমৃতার ভাগ্যকে তিনিও চিরকাল ঈর্ষা করে এসেছেন। কার ভাগ্যকেই বা করেননি। শম্পাদের ক্লাসে যত জন পড়ত—নূপুর, শর্মিলা, চন্দ্রা, মনীষা...যতজন মেয়ের বাবা বেঁচেছিলেন, যত জন মেয়ে শম্পার থেকে ভাল রেজাল্ট করত। তাঁর মনে হত, সব্বাই বিশেষ সুবিধে পাচ্ছে, আর তাঁর মেয়ে পিতৃহীন বলে, কালো বলে সব্বাই ওর ওপর অবিচার করছে। অমৃতা সেই ছোট্ট থেকেই খুব কর্মঠ, স্বাধীন ধরনের মেয়ে ছিল। বলত—'মাসি, আমরা তো আছি, আমরা সবাই শম্পাকে দেখব।' কথা রাখত অমৃতা। নিজের খাতাপত্র, নোটস সব নির্দ্বিধায় ভাগ করে নিত শম্পার সঙ্গে। ওর বাবা টিচার ছিলেন সায়েন্সের। তাঁর কাছে কত পড়েছে শম্পা। অথচ আজ এই পিতৃহীন মেয়েটাই পাশ করে ভাল চাকরি করছে। তার ভাল বিয়ে হতে যাচ্ছে। অমৃতা কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন—হে ভগবান, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো শম্পাকে, রক্ষা করো অমৃতাকে। আরও যত মেয়ে তাঁর মেয়ের মতো, যে যেখানে বিপদে পড়েছে সবাইকে রক্ষা করো।

কাজকর্ম শেষ করে অল্প একটু ভাত আলু ভাতে দিয়ে খেয়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন সল্টলেকের উদ্দেশে। যখন ওরা ব্রাহ্ম বালিকায় পড়ত, তখন অমৃতারা থাকত মানিকতলায়, তারপর গেল দক্ষিণে রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিট। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তবে ওঁরা একটা আস্তানা নিজের মতো করতে পেরেছেন সল্টলেক পূর্বাচলে। সে বাড়িতে কখনও যাবার দরকার পড়েনি তাঁদের। সম্পর্কটা অমৃতার সঙ্গেই আছে। মাসি মেসোর সঙ্গে নেই।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে মা-মেয়ে যখন পূর্বাচলের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন একতলা ছোট বাড়িটার মাথায় গন গন করছে রোদ। ছোট্ট একটু বাগান, সেখানে সামান্য কিছু ফুলের গাছ। দু-চারটে জবা। কিছু জিনিয়া। ফুল নেই কোথাও, শুধু গাছগুলোই সার। সাবধানে বেল বাজালেন নিবেদিতা। খুব আস্তে। সামান্য একটু পরে দরজা খুলে দিলেন বিশ্বজিৎবাবু, অমৃতার বাবা।

বোঝাই যাচ্ছে স্কুল কামাই করেছেন। গালে না-কামানো দাড়ি। পায়জামাটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বাসিটাই পরে আছেন।

—ও শম্পা, এসো। আসুন আপনি।

—সীমা কই?

—ও ঘরে।

সীমা শুয়েছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন। বিস্রস্ত জামাকাপড়। চোখ মুখ বসে গেছে।

—দিদি কিছু খবর পেলেন?

—না ভাই।

—কী হয়েছিল?

—কিচ্ছু জানি না। কোনও খবরই ওঁরা আমাদের দেননি। মেয়ের শরীর খারাপ হয়েছিল বলেও কিছু শুনিনি। তবে...

—তবে কী?

—ওর একটু অনিয়মিত হচ্ছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল।

—তা হলে তো কনসীভ করেছিল!

—তাও ঠিক জানি না, ভাই। অন্য কোনও লক্ষণ তো ছিল না। খালি বলত খুব খিদে পাচ্ছে, খুব খিদে পায় মা।

চোখদুটো জলে ভরে এল সীমার।

—আমরা সল্টলেকে এসে থেকে তো বেশি আসতেও পারত না। আমাদের যাওয়া তো আরও অসম্ভব। কেন যে রমণী চ্যাটার্জি থেকে চলে এলাম। মেয়েটাকে বোধহয় হাত-পা বেঁধে জলেই ফেলে দিয়েছি।

—কেন? এ কথা বলছেন কেন? ছোট্ট ফ্যামিলি! জামাই অত গুণের!

কোনও কথা বললেন না সীমা। মুখ নিচু করে শুধু নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে আঙুলগুলো ভিজতে লাগল। নিবেদিতার মনে হল কী অপূর্ব সুন্দরী এই ভদ্রমহিলা। কিন্তু কোনওদিন সুখের মুখ দেখলেন না। স্বামী দিবারাত্র কোচিং করেন। উনি দিবারাত্র শুয়ে বসে থাকেন। সকাল সন্ধে নিয়ম করে একটু হাঁটেন, হার্টের ব্যারাম। কোনওদিন ভাল থাকেন, বেশির ভাগ দিনই ভাল থাকেন না। সে ভাবে দেখতে গেলে ওর মেয়েও শম্পার থেকে খুব একটা সুখের ছোটবেলা পায়নি। ক্লাস টু থ্রি-এর মেয়েকে যদি নিজের ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করে পরে আসতে হয়। ফাইভ সিক্সের মেয়ে দুধ জ্বাল দেওয়া, একটু ভাতে ভাত রান্না করাও শিখে নিয়েছিল। তাঁর পিতৃহীন মেয়েকেও অতটা করতে হয়নি।

ওঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে না পারো, অন্তত মেয়েকে ফিরিয়ে দাও। হে ঈশ্বর, ওঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।

শম্পা বলল—আমি তোমার কাছে কয়েক দিন এসে থাকব মাসি?

—কী করবি থেকে? তোর তো অফিসও আছে...

—ছুটি নেব।

—তোর মায়ের অসুবিধে হবে।

—না না আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

নিজের শোক-দুঃখ নিয়ে একলা একলা থাকতেই স্বস্তি। অন্য কেউ এসব সময়ে থাকলে বড় অসুবিধে হয়, মন খুলে কাঁদা যায় না, স্বামীর সঙ্গে এই ঝগড়া-কথা কাটাকাটি আবার দুজনের একত্র শোকবিহ্বলতা এ সবই কেমন আটকে যায়। যতই হোক পরের মেয়ে, অতিথি, তার দিকেও একটু না একটু নজর দিতেই হয়। অথচ সে সামর্থ্য নেই, না মানসিক, না শারীরিক। তিনি অসহায়ের মতো একবার নিবেদিতা আর একবার শম্পার দিকে তাকান।

—দরকার নেই রে! উনি আছেন। হয়ে যায় আমাদের, চলে যায়।

—ঠিক আছে। দরকার হলেই কিন্তু ডাকবে। কোনও সংকোচ করবে না। ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে যোগাযোগ করেছিল?

—হ্যাঁ। আজ সকালেই। জামাই বলল ডাক্তারটা কিছু গণ্ডগোল করেছে। নার্সদের অসতর্কতায় কখন ও উঠেছে, বাইরে চলে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। একটা নামী নার্সিংহোম, এত অসাবধান! ওরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এই বলল, আর কী বলবে?

—নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কেস করা উচিত।

—তা হয়তো করবে।

শম্পা বিকেলের চা করল। খাওয়াল সবাইকে। তারপর ওরা চলে গেল। মা-মেয়ে। বিশ্বজিৎ আর সীমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা অনভ্যস্ত গোপনতা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওঁদের। আজ খুব ভোরবেলায় অমৃতার ফোন এসেছিল—মা, আমি বেঁচে আছি। ভাল আছি, কোথায় আছি এখন বলব না। তবে যথাসময়ে জানতে পারবে। ভাবনা কোরো না। কাউকে বোলো না।

আসলে তার মনের মধ্যে একটা কঠিন সংকল্প জন্ম নিচ্ছে। সেই সঙ্গে আত্মধিক্কার। কেন সে বুঝতে পারেনি। কেন? কেন? শাশুড়ি যখন সেই গোড়ার দিনেই বলে দিলেন, আমাদের নিয়ম—শোবার ঘর বউ ঝাঁট দেবে, রান্না আমরা লোকের হাতের খাই না। এত দিন আমি একা করতাম, এখন তুমি আমি করব।

ওর ভাল না লাগলেও খুব খারাপ লাগেনি। ঠিক আছে, বাড়িতেও তো ছোট্ট থেকে রান্না করছে, ইদানীং একটি লোক রাখা হয়েছে। তাই সে পার্ট ওয়ান-এ ভাল অনার্সটা পেল। গীতবীথি থেকে থার্ড ইয়ারের গানের পরীক্ষাটাও ভালভাবে পাশ করে গেল। ওর খাওয়া-দাওয়ার ওপর যখন খারাপ নজর দিতে লাগলেন শ্বশুর ও শাশুড়ি উভয়েই, সবচেয়ে ছোট্ট মাছটা তার পাতে, সবাইকার ডিম রয়েছে, তারটা কুলোল না, তখন সে বুঝতে পেরেছিল, ইনি শিক্ষিত স্কুল-টিচার হতে পারেন, কিন্তু ইনি সেই সাবেক অন্ধ শাশুড়ি-যুগে পড়ে আছেন। জোর করে চেয়ে নিতে বা এদিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার রুচিতে বাধত। এই রকমই দিনের পর দিন কাটে। স্বামী তাকে যা সামান্য হাতখরচ দেয়, তাই দিয়ে বাইরে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, শাশুড়ি তার ঘরে পর্দা দিতে দিলেন না। ছেলে বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনি অধিকার করে নিতেন। দুজনের কথাবার্তা বেড়ানো এসব এই তিন বছরে এমন পর্যায়ে এখনও যায়নি যে সে বলতে পারবে তার স্বামী অরিসূদন লোকটা কেমন।

চিনতে পারল যখন তার গর্ভে সন্তান আসার কথাটা সে তাকে বলল। অরি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।—এরই মধ্যে বাচ্চা কী? তোমার পরীক্ষা আছে না? সংসারই বা চলবে কী করে?

—সংসার কী করে চলবে ভাবলে তো কোনওদিনই আমাদের বাচ্চা হওয়া চলে না। আর পরীক্ষা, ও আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

বাড়িতে ঘোষণা হয়ে গেল কথাটা। তার পর শাশুড়ি শ্বশুর স্বামী সবাই মিলে তাকে ছি.ছি করতে লাগলেন, যেন সে একটা অবৈধ সন্তান ধারণ করেছে। এরপর আর যা বলল তাতে আর আক্কেল গুড়ুম।

অরি বলল—সে যা হবার হয়েছে। টার্মিনেট করে দিলেই হবে।

—মানে?

—মানে জানো না! চলো খালাস হয়ে আসবে। একটা বেলার ব্যাপার। দিন তিনেক বিশ্রাম নিয়ে আবার নর্ম্যাল লাইফ।

—না। সে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছিল—বিয়ের তিন বছর পরে প্রথম সন্তান। কোন অপরাধে তাকে খুন করব। আমি পারব না।—এই নিয়ে রোজ জোরাজুরি কথা কাটাকাটি চলতেই লাগল, চলতেই লাগল। অবশেষে এল সেইদিন যেদিন অরি বেলা বাড়তেই অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে না দেখে সে অবাক হয়ে কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে ছিল—জ্বর-টর হল না কি?

বিদ্যুৎ গতিতে তার মুখ চেপে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল অরি। নাকে চেপে ধরেছিল, একটা রুমাল। তাতে মিষ্টি কেমন একটা অবাক করা গন্ধ। সে বুঝতে পারছিল তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যস আর কিছু মনে নেই।

গভীর রাত হবে তখন। তার সামনে কড়কড়ে পোশাক-পরা একজন সিস্টার; তাঁকে দেখতে দেখতে সে যেন অনেকদিনের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তার গায়ের ওপর সাদা চাদর টানা। সবুজ পর্দাটা দুলছে। সে তা হলে বাড়িতে নেই। অবশ্য তার বাড়িই বা কোথায়? সেন্ট্রাল পার্কের বাড়িটাও তার বাড়ি না, সল্টলেক পূর্বাচলের বাড়িটাও তার বাড়ি নয়। তার বাড়ি ছিল রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিট। সেই মিষ্টির দোকান, একদিকে পাহারার মতো সেই সরকারি ফ্ল্যাট, তাদের বাড়ির মধ্যে এক চিলতে

লম্বা উঠোনটায় সার দিয়ে দিয়ে কত গাছ! এমনকি সুপুরি গাছও! টগর ঝোপে অজস্র টগর ফুটত সাদা তারার মতো। আর ছিল একটা মুসান্ডা। আর কী ছিল? নয়নতারা তো ছিলই, তুলসী ছিল, তুলসীর পাতা তুলে না ধুয়েই সে কচকচিয়ে খেত বলে মা কত বকেছে! তার আগেও তার বাড়ি ছিল মানিকতলায়। সেখান থেকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে তার ঠিক দশ মিনিট লাগত। সেই বাড়িটাতেও টবের গাছ ছিল দোতলার হাফ-ছাদে। ছাদ-ভরা ফুল, বিশেষত গ্রীষ্মকালের। বাবা যত্ন করত, তাকেও শিখিয়েছিল। তবে যেহেতু তাকে সংসারের অনেক কাজই করে নিতে হত, গাছেদের ভারটা বাবা কোনদিনই তাকে দেয়নি। সেই বাড়ির যে ঘরে সে থাকত, তার একদিকের মেঝের সিমেন্ট একটু ভাঙা ছিল। ভাঙা জায়গার জন্য তার খুব খারাপ লাগত। বন্ধুরা আসবার কথা থাকলেই সে জায়গাটাতে একটা শতরঞ্চি পেতে রাখত। সেই বাড়িগুলো তার। তাদের সঙ্গে তার কত সুখস্মৃতি, কত তুচ্ছ ব্যর্থতা, কত তুচ্ছ সুখ, কত শোকতাপের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মানিকতলার বাড়িতে তার ঠাকুমা মারা গেলেন। ছোট্ট সে তখন। কতদিন পর্যন্ত আশা করে বসেছিল ঠাকুমা আকাশ থেকে নেমে আসবেন, আবার তাকে মালঞ্চমামার গল্প বলবেন, কিংবা সেই একঠেঙে পেত্নী আর থালুমালুর গল্প। রমণী চ্যাটার্জি থেকেই তার বিয়ে হল। মা-বাবার নিত্য কথা কাটাকাটি। বাবা কিছুতেই বিয়ে দিতে রাজি নয়, মায়ের করুণ মিনতি। বাবা রেগে যেত, কেন তুমি শুয়ে থাকতেই কি ও সংসার পড়াশোনা সামলাচ্ছে না? ও পড়বে, প্রোফেসর হবে—তার পর আবার বিয়ের ভাবনা কী?

মা বলত—না গো, কুমারী মেয়ে একবার বাড়ির সংসারে জড়িয়ে পড়লে আর বিয়ে করতে পারে না। এ রকম আমি অনেক দেখেছি। আমি চলে গেলে মাতৃহীন মেয়েটার যে কী দুর্গতি...বলতে বলতে মায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে যেত। সুন্দর চোখদুটো জলে ভরে উঠত।

বাবা বলত—দুর্গতিটা কি ওর আমিই করব? আমিই নিজের স্বার্থে ওকে বেঁধে রাখব বলছ? বাঃ।

—না, না। তুমি রাখবে না, ও ভীষণ দায়িত্বশীল মেয়ে, ও নিজেই তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। মাতৃহীন মেয়ের অনেক সমস্যা...

—আরে বাবা পিতৃহীন তো আর হবে না?

—যদি তা-ও হয়! মানুষের জীবন, কে বলতে পারে?

এই রকম কথা কাটাকাটির মধ্যে অমৃতা একদিন ঢুকে বলেছিল—ঠিক আছে। ঠিক আছে। বাবা কথা বাড়িও না। আমার বিবাহ না উদ্বাহ দিয়েই দাও। রোজ রোজ অশান্তি ভাল লাগে না।

তবে অমৃতার পছন্দ ছিল অধ্যাপক বর। তার বাবা আবার যেহেতু শিক্ষাজগতে আছেন, তার ঘাঁত ঘোঁত জানেন, তাই সে জগতের মানুষদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারতেন না। বেশি কথা নয়, সংক্ষেপে বলতেন,—ওঃ লেকচারার, কলেজের? ওদের আমি চিনি।

তিনিই দেখেশুনে ঠিক করলেন এঞ্জিনিয়ার জামাই। মা-বাবা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। শাশুড়ি এখনও চাকরি করেছেন। স্কুলের টিচার। নিজেদের নতুন ফ্ল্যাট সেন্ট্রাল পার্কে।

অমৃতার পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে শ্বশুর বলে উঠেছিলেন—অবশ্যই। ও ভাল মেয়ে। পড়াশোনা করবে। চাকরি করবে, সেটাই তো আমরাও চাই।

ব্যস, আর কোনও কথার দরকার হয়নি। লাখ কথা ছেড়ে একটা কথাও বোধহয় হয়নি, এত সহজ সরল ছিল বিয়েটা।

অরিসূদনকে অপছন্দ হবার মতো তো কিছু ছিল না। তবে হ্যাঁ, একটা মানুষকে দেখেই, বা তার সঙ্গে দুটো কথা বলেই যে অনেক সময়ে একটা টান তৈরি হয়, তেমন কিছু হয়নি। অমৃতার তো তেমন আবেগপ্রবণ স্বভাবও না। হয়তো অরিসূদনের ব্যাপারটাও তাই। তার বন্ধু দোলা যেমন সহজে প্রেমে পড়ত, কি ছেলেদের কি নিজের মেয়ে-বন্ধুদের, অমৃতার প্রকৃতিটাই তেমন ছিল না।

সে ধৈর্যশীল, সহনশীল, প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত।

অরিসূদন তার পেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকত। অমৃতাও তার পড়াশোনায় ও সংসার-কর্মে। তার ওপরে শাশুড়ির ছিল ওই রোগ। ছেলেবউকে একা হতে দেবেন না। অরি বলল—চলো, "ফায়ার" এসেছে দেখে আসি। শুনছি খুব ভাল। শাশুড়ি কান এদিকে, বললেন, আমারও একটা টিকিট কাটিস। দেখতে দেখতেই এমন 'ছি ছি ওয়াক থুঃ' আরম্ভ করলেন যে তিনজনে হল থেকে বেরিয়ে আসতে পথ পায় না।

কিশোরী আমনকর-এর গান কলামন্দিরে। অমৃতাই বলল—শোনাও না গো। আমার ভীষণ ভাল লাগে আমনকর।

ক্ল্যাসিকাল গান শাশুড়ি ভালবাসেন না।

বেরোবার সময়ে কিন্তু ওঁর এমন পেটের যন্ত্রণা শুরু হল, যে অরিকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হল। দ্বিতীয় পর্বে ওরা পৌঁছল বটে, কিন্তু পেটব্যথাক্রান্ত শাশুড়িকে, সে ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে হলেও, ওরা যে গান শুনতে গেছে, সেই রাগ কতদিন যে ভদ্রমহিলা ভুলতে পারলেন না! অরি তখন বলেছিল—এক ছেলের মা হলে, বউ-এর ওপর ভীষণ জেলাসি হয়, বুঝলে?

—জানতেই যখন, তখন বিয়েটা না করলেই পারতে!

—ইস্, মা জেলাস হবে বলে আমি বিয়ে করব না? বলতে বলতে রাতের অন্ধকারে জানলা দিয়ে আসা রাস্তার আলোর আবছায়ায় তার দিকে গভীর করে চেয়ে ছিল অরিসূদন। তার হাত চলে গিয়েছিল অমৃতার নাতিপিনদ্ধ বুকে। তারপর যা হয়! কে জানে সেই দিনই সাবধান হতে ভুলে গিয়েছিল কি না অরিসূদন গোস্বামী।

একজন ভদ্রলোক ঢুকছেন। নীল শার্ট কালো প্যান্ট। একটু ভারী চেহারা। লম্বার জন্য ভারী ভাবটা মানিয়ে গেছে। ফর্সাটে ভারী মুখ। একটু চৌকো ধরনের, জে.বি.-র মতো। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। কে ইনি?—ও ডাক্তার। গলায় তো স্টেথোস্কোপ ঝুলছেই।

—সিস্টার, পেশেন্টের ঘুম ভেঙেছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি একটু কাইন্ডলি বাইরে যান।

—হ্যাঁ,—বেডের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়েন ডাক্তার—আপনি এখন কেমন ফীল করছেন?

—ভাল।

—সম্পূর্ণ সজাগ?

—মনে তো হচ্ছে।

—শুনুন, যখন পূর্ণ সজাগ ছিলেন না, সে সময়ে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কতগুলো ইনফর্মেশানও দিয়েছিলেন। মনে করতে পারছেন কিছু?

—না। আমার অ্যাবরশন কি হয়ে গেছে?

—কেন? আপনি অ্যাবরশন চেয়েছিলেন?

—না। হয়েই যখন গেছে তখন...

—তা হলে আপনার স্বামী, স্বামীই তো।

—কে? অরিসূদন গোস্বামী?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছিল।

—মাফ করবেন, এত অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্ক নিয়ে এখানে লোকে আসে, তাই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, ওঁরা কেন অ্যাবরশন চাইছিলেন?

—আই হ্যাভ নো আইডিয়া।

—তবু?

—ওরা আমার পড়াশোনার ব্যাঘাতের কথা বলেছিলেন। তা ছাড়া সংসারে আমাকে প্রচুর কাজও করতে হয়।

—আই সি। তা আপনি তাতে ওঁদের কী বললেন?

—আমি বলি—পড়াশোনা পরীক্ষা এসব আমি সামলে নেব। সংসারও। তবে সংসারের কাজ থেকে দশ-বারোদিন কি এক মাসের ছুটি দিতে হলে যদি বাচ্চা না হতে হয়, তো ওঁদের পরিবারে বাচ্চা কোনও দিনই আসবে না—এই জাতীয় কিছু।

—তা প্রেগন্যান্সির সময়ে আপনি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন?

—অজ্ঞান? আমি জীবনে কখনও অজ্ঞান হইনি ডক্টর। ওই একবার ছাড়া। কী বলব! আপনাকে বলে কী লাভ?

—লাভের কথা পরে ভাববেন। ডাক্তারকে কিছু লুকোবেন না।

—আমার স্বামী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কী যেন দিয়ে আমার নাক-মুখ চেপে ধরল—আর কিছু আমার মনে নেই।

—ওরা অজ্ঞান অবস্থায় এখানে আমাকে নিয়ে আসেন—বলেন, কনসেপশনের পর আপনার প্রায়ই ফিট হচ্ছে। তাই ওঁরা বউমাকে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে এসেছেন। আগে তো বউমা বাঁচুক, তারপর নাতিপুতির কথা ভাবা যাবে।

—শিট!

—কী বললেন?

—কিছু না, বললাম ছিঃ।

—তা ওঁদেরই নাতি, ওঁদের না চাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে মিসেস গোস্বামী।

—আমি বুঝতেই পারছি না।

—শুনুন, আমি যতটুকু বুঝেছি ইউ আর ইন সীরিয়াস ডেঞ্জার। আমি বুঝেছিলাম আপনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে। তারপরে আপনার সব রকম মেডিক্যাল টেস্ট করাই। অস্বাভাবিক কিছু পাইনি। এদিকে আপনার চার মাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এম.টি.পি করা খু-উব রিস্কি। আপনার প্রাণসংশয় হতে পারে। সুন্দর একটি মেল ভ্রূণ এসেছে আপনার গর্ভে, আমরা অ্যামনিও সেনটেসিস করে দেখে নিয়েছি। কোনও অস্বাভাবিকতা তার নেই। আপনি যদি এঁদের কাছে ফিরে যান, কোনও বাজে ক্লিনিকে অসাধু হাতুড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে এরা আপনার গর্ভপাত করাবেই। আপনি তাতে বাঁচবেন না। প্লিজ ডোন্ট গো ব্যাক টু দেম। আপনি আপনার বাপের বাড়ির ঠিকানা বলুন, আমি এক্ষুনি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

—আমি এভাবে চলে গেলে আপনাদের তো বদনাম হবে, পুলিশ এনকোয়্যারি হবে?

—থ্যাংকিউ ফর স্পেয়ারিং সো মাচ থট ফর আস। আমরা ওগুলো সামলে নেব। আপনি চলে যান। সকাল হলেই হয়তো বন্ড সই করে পেশেন্ট নিয়ে যাবার জন্য জোর করবে। অলরেডি একবার করেছে।

সে শিউরে উঠল।

—ভয় পাবেন না। ঠিকানাটা বলুন।

—শুনুন আমার মায়ের দীর্ঘদিনের হার্টের অসুখ। বাবাকে একা সব সামলাতে হয়। ওঁরা...ওঁরা খুব দুর্বল। ওখানে আমি যাব না।

—তা হলে?

—তা হলে...তা হলে দুটো ঠিকানা আপনাকে বলছি, কেউই আমার আত্মীয় নয়, ওখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। সেটা ঠিক হবে তো?

—পুলিশ-কেস হবে। হোক। তখন তো সত্য বেরিয়ে পড়বে, অপরাধের শাস্তিও হবে। করুক না কেস।

—তা হলে একটা ঠিকানা বলছি জয়িতা বাগচি, ওয়ান-এ এইট্টি থ্রি, সেক্ট-৩, সল্টলেক সিটি। আর একটা হল ৫/বি ডোভার লেন।

—এগুলো কার ঠিকানা?

—প্রথমটা আমার এক প্রোফেসরের, দ্বিতীয়টা আমার এক বন্ধুর। সে অবশ্য এখন কানপুরে, কিন্তু তার মা আমাকে খুব ভালবাসেন।

—শুনুন মিসেস গোস্বামী...

অবরুদ্ধ ক্রোধ এবার প্রকাশ পেল তার গলায়।

—বারবার মিসেস গোস্বামী বলে আমাকে অপমান করছেন কেন?—আমি অমৃতা

—নিশ্চয়ই, ডাক্তার ঝুঁকে পড়লেন একটু, বললেন হ্যাঁ অবশ্যই, আপনি তো অমৃতাই।

৭

টু-বি'তে চড়ে নামতে হবে গড়িয়াহাটের মোড়ে। তারপর অটো নিয়ে বিজন সেতু পার হয়ে কর্নফিল্ড-এর ঠিক পরেই দোলাদের নতুন বাড়ি। একটুও ভাল লাগে না জায়গাটা দোলার। বাড়ির পেছনে কারখানা, সামনে একটু ডানদিক ঘেঁষে একটা গ্যারাজ। তবে তাদের দোতলা বাড়িটা বেশ জায়গা নিয়ে, অতি আধুনিক মেজাজের ছিমছাম বাড়ি। বাড়িটা সুন্দর। তাছাড়া জায়গাটা খোলা, অনেকদূর পর্যন্ত চোখ চলে যায়। অবশ্য চারদিকে উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছেই, উঠছেই। কেন যে তারা ডোভার লেনে থাকতে পারল না। হোক না ভাড়াবাড়ি, সম্পদরা কত কাছে ছিল, অমৃতারা...। অমৃতার কথা মনে হতেই মনটা কীরকম তছনছ হয়ে গেল তার। এই অন্তর্ধান, অমৃতার এই কর্পূরের মতো উবে যাওয়া কি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে তাদের? সেই বন্দনা ব্যানার্জি, তারও আগে লাভলি গুপ্তর মতো? টিভি খুললে আজকাল যখন নিরুদ্দেশের বিবরণ দিতে আরম্ভ করেন ঘোষক বা ঘোষিকা, সে আগে আরম্ভ হলেই অন্য চ্যানেলে চলে যেত, আজকাল কিন্তু ওই খবরগুলোর জন্যই বসে থাকে। দীপাঞ্জন চ্যাটার্জি, বয়স ১৭, হাইট : পাঁচ-সাত...হারিয়ে যাবার সময়ে পরনে ছিল খাকি ফুলপ্যান্ট আর লাল চেকশার্ট, সন্ধান দেবার ঠিকানা—ভবানী ভবন। অলকা মাজি—বয়স ২৯ হাইট—পাঁচ এক...গত তেরো জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে নিরুদ্দেশ...। আবদুস সামাদ বয়স বারো...রং কালো...হারিয়ে যাবার সময়ে পরনে ছিল...। যেগুলো মানসিক ভারসাম্যহীন সেগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো বিশ্লেষণ করতে থাকে সে। এ অভ্যেস নাকি তিলকেরও হয়েছে। তিলকই তাকে ফোন করে জানায়—দোলা শিগগিরই টিভি খোল—অমৃতার খবর দিচ্ছে। ওর বিয়ের ঠিক আগের একটা ফটো দিয়েছে। এ ফটোটা খুব ভাল করে চেনে দোলা। কেমন কাঠ-কাঠ রাগী-রাগী উঠেছে। অমৃতা গোস্বামী—নিরুদ্দেশ 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে, ফর্সা রং, উচ্চতা ৫'-৪" রোগা, নিরুদ্দেশ হবার সময়ে পরনে ছিল নার্সিংহোমের গাউন। সম্ভবত সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন।

দোলা সঙ্গে সঙ্গে তিলককে ফোন করে—'সম্ভবত সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন' মানেটা কী রে?

—অমৃতার মাথাটা যদি কাঁধের ওপর ঠিক জায়গায় বসানো না থেকে থাকে তো আমাদের কারও মাথাই নেই—তিলক বলল।

—এটা কী চাল বল তো ওর শ্বশুরবাড়ির?

সীজারকে টেলিফোন করে দোলা—সীজার আছে?

—বলছি

—আমি দোলা রায়, অমৃতার...

—বুঝেছি

—আজ নিরুদ্দেশের খবরটা দেখেছ?

—দু'দিন ধরে তো দিচ্ছে। প্রমাণ করতে চাইছে ওর মানসিক গোলমাল হয়েছিল। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেটা এপিলেপ্‌সি হতে পারে। তার পরে হয়তো খানিকটা অ্যামনেসিয়া...এখন তো সব জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরা মারমুখো। নার্সিংহোমের ডাক্তারকে ধরেছিল পুলিশ। বেল পেয়ে গেছেন শুনেছি। অরিদাকে যে কোনওদিন পাড়ার ছেলেরা ধোলাই দেবে। ওর শাশুড়ি বেরলেই টিটকিরি খান।

—কীরকম?

—আমাদের ছেলেদের মধ্যে একটা এই ধরনের কথাবার্তা হয়, ধরুন।

—ধরুন বলো না ধরো...

—আচ্ছা ধরো—এক নম্বর বলল—কে যায়?

—দ্বিতীয় জন জবাব দিল—বউমারির খাল।

—কোথায় যায়?

—নদীনালায়

—কেন যায়

—বউ-মারার সুলুক দিতে

—কেমন সুলুক?

—ধোবার পাটে আছড়ে মারো, পাথর বেঁধে জলে ফেলে দাও

—আর?

—সুযোগ পেলে গলা টিপ্যা ভাসাই-আ দাও।

—কী রি-অ্যাকশন?

—কী বলবে? কিচ্ছু তো বলতে পারে না। মুখ কালো হয়ে যায়। হনহন করে চলে যায়। তবে রি-অ্যাকশন দেখতে হয় পাড়ার অন্য শাশুড়িদের।

—সেটা কীরকম?

—এক মাসিমা একদিন আমায় ডেকে চোখের জল মুছে বললেন—শাশুড়িদের পেছনে লেগেছ বাবা, আমাদের তাহলে ঘরেও খোয়ার, বাইরেও খোয়ার? আমি বললাম—বেশ মাসিমা, জানতে দিন, আমাদের জানতে দিন, কেমন খোয়ার কেন খোয়ার আমরা আপনার হয়েও লড়ব।

—সত্যি জীবনটা কী অসম্ভব রকমের জটিল, তাই না সীজার?

—না দোলাদি, জীবন-টিবন নয়, মানুষ, মানুষই বড্ড গোলমেলে। কোনও দরকার হলেই আমায় ডাকবেন,

—বা রে! কোনও দরকার হলেই তোমায় ডাকব? তোমার অসুবিধে হবে না?

—কোনও অসুবিধে হবে না। অমৃতা-বউদিকে আমরা, মানে আমি খুঁজে বার করবই, আপনাদের কারও অসুবিধে হলে আমি যদি কাজে লাগতে পারি...

দোলা খুব অবাক হয়ে গেল। ছেলেটা আচ্ছা ছেলেমানুষ তো! এখন দিনকাল যা দাঁড়িয়েছে মানুষ খালি ছুটছে। তাদের মতো যারা কেরিয়ার গড়ছে, তাদের তো কথাই নেই। তার মধ্যে হাইস্কুলে পড়া সীজারের মতো একটা ছেলে যদি সব দিদি, সব বউদি, সব শাশুড়িদের আশ্বাস দিতে থাকে যে কারও কোনও অসুবিধে হলেই সে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া আছে, তবে একটু অবাক লাগে বইকি! ছেলেটা পড়াশোনা সত্যিই করে তো! না স্কুল ড্রপ-আউট? কোনও রাজনৈতিক দলের কেডার-ফেডার নয় তো?

সেদিন য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে একটা ভারী মজার ব্যাপার শুনল দোলা। দোলা কেন সব্বাই। লাবণির বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল, লাবণি বেঁকে বসেছে। ওর মা না কি আজকে আসবেন য়ুনিভার্সিটিতে বন্ধুদের অনুরোধ করতে যেন তারা ওকে বোঝায়।

—কী ব্যাপার রে লাবণি? বন্ধুরা তো সব একখানা গল্পের গন্ধ পেয়ে হামলে পড়ল একেবারে।

লাবণি বলল—আমার ব্যাপার আমি বুঝব, তোদের কী? তোরা কেন নাক গলাচ্ছিস?

—আমরা একটা নেমন্তন্ন পেতে চলেছিলুম, সেটা যে ফস্কে যায়, সেটাই আমাদের নাক গলাবার কারণ,—চঞ্চল বলল।

—পেটপুজো ছাড়া আর কিচ্ছু বুঝিস না, না? কফিহাউজে গিয়েও বলবি খাওয়া, বিয়ের কথা উঠলেও হাত ধুয়ে বসে থাকবি। কেন বাড়িতে খেতে পাস না? আর শিওর হচ্ছিস কী করে তোকে নেমন্তন্ন করবই!

চঞ্চল বলল—করবি না? যদি না করিস কেন করবি না, তা-ও জানি।

—কেন? দোলা জিজ্ঞেস করল।

—কেন আর—বর বা বরযাত্রীরা যদি মনে করে এ মেয়েটার গুচ্ছের বয়ফ্রেন্ড আছে, তাই। নিলয় বলল, লাবণির বর মোটামুটি রক্ষণশীল, একটু গাঁইয়া মতো তো হবেই!

—মানে? লাবণি তো খেপে লাল।

—চটছিস কেন? চটছিস কেন? জেনার‍্যালি তোর মতো মেয়েরা একটু কনজারভেটিভ পছন্দ করে। গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে।

—এরই বা মানে কী?

—কেন? দ্যাখ কনজারভেটিভ বলে ওরা ডাউরি-টাউরি বাবদ তোর বাব-মা'র কাছ থেকে গুচ্ছের জিনিস বাগিয়ে নেবে। ধর নানান কিসিমের শাড়ি গয়না, আসবাবপত্র, ফিরিজ, ভি.সি.আর., আরও সব যা-যা আছে। তা শাড়ি গয়নাগুলো তো তোরই মাপসই হবে, তোর বর বা তোর শাশুড়ি তো আর পরবে না। জিনিসপত্রগুলোও তোর সম্পত্তি প্রধানত। গাছের খাওয়া হল তো? এইবারে তুই আধুনিকা ছিল নাকো হেনকাল ছিল না হয়ে যাবি। বুদ্ধিবৃত্তি আছে, লেখাপড়া শিখেছিস বরের নাকে দড়ি দিয়ে একবার উত্তর একবার দক্ষিণ একবার পূর্ব একবার...

তিলক বলল—ধুর, নিলয় এসব ফালতু ইয়ার্কি ছাড় তো। আমাদের মাঝখান থেকে একটা মেয়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল, এখনও ইয়ার্কি মারছিস? ধ্যুৎ তোদের একটা ইয়েও নেই।

লাবণি এতক্ষণে মুখ খুলল—দ্যাখ, এদেরও একটা বাবা, একটা মা, একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ঠিক অমৃতার শ্বশুরবাড়ির মতন। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা—এই ভদ্রলোকও এঞ্জিনিয়ার আর এর নাম হচ্ছে..নাম হচ্ছে অরিন্দম। ছোট করলে তো অরিই দাঁড়াই। ওর বাবা-মা যখন এসে অরি এই অরি তাই করতে আরম্ভ করেন না তখন আমার বুক হিম হয়ে আসে।

লাবণির আপত্তির কারণটা হয়তো খুবই হাস্যকর। কিন্তু ওরা কেউ হাসতে তো পারলই না, উড়িয়ে দিতেও পারল না। চঞ্চলসুদ্ধ ওর ভেতরে কী হচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। তবু একবার ফাজলামির চেষ্টা করে বলল—এই অরিসূদন না ফরিসূদন অমৃতার অ-ভদ্রলোকটি এমন একটা কাজ করে বসলেন যে সারা পৃথিবীর অরিন্দম, অরিত্ররা আইবুড়ো হয়ে গেল।

কেউ হাসল না।

তিলক আবার জিজ্ঞেস করল—থাকেন কোথায়?

—কোথায়? শুনলে আঁতকে উঠবি। সিঙ্গাপুর। একটা বিদেশ-বিভুঁই, তারপর শুনেছি ইন্টারন্যাশন্যাল জোচ্চোরদের আড্ডা। সেইখানে আমার মতো একটা মেয়েকে হাপিস করে দেওয়া কোনও ব্যাপার? তোরাই বল। আবার ওর বাবা-মা যখন-তখন ওখানে গিয়ে থাকেনও। যদি তিনজনে মিলে...প্লিজ, আমার বাবা-মা এলে তোরা বুঝিয়ে বলিস।

—তুই অমৃতার ঘটনাটা বলেছিস মাসিকে?

—অমৃতার ঘটনা বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে।

—তাতে মাসিদের কোনও দুশ্চিন্তা হয়নি?

—উঁহু। বাবা বলছে তুমি এরকম ভীরু দুর্বলচিত্ত মেয়ে আমার জানা ছিল না। আর মা বলছে যার ভাগ্য তার তার। একজনের দুর্ভাগ্য হয়েছে বলে পাঁচজনেরও তাই-ই হবে তার কোনও মানে নেই। আর আমরা খুব চেকিং ক্রস চেকিং করে নিয়েছি। কোনও ভয় নেই।

—তা হলে আর ঘাবড়াচ্ছিস কেন?—তিলক বলল।

—ওরে বাবা অরি নামের লোকেরা আমার জন্মশত্রু হয়ে গেছে। মা কালীর দিব্যি আমি কোনও বরকে অরি বলে ডাকতে পারব না।

—ওগো হ্যাঁগো বলে ডাকিস। তোর অত মড হবার দরকারটা কী?—এবারও চঞ্চল।

ওরা কথা বলছিল, ক্যান্টিনে বসে। এখানেই লাবণির মায়ের আসার কথা। এই সময়ে শর্মিষ্ঠা, রঞ্জনা, অয়ন সব হইহই করে ঢুকল, ওরাও লাবণিকে ঘিরে বসে গেল।

শর্মিষ্ঠা বলল—ইস্‌স্‌, আমার একটা এমন দুর্দান্ত সম্বন্ধ আসে না রে! পড়াশোনায় ইস্তফাটা দিয়ে দিই।

রঞ্জনা বলল—যা বলেছিস, পরীক্ষা ভাল্লাগে না আর।

একটি ভদ্রলোক মানে ওদের চেয়ে কিছু বড় একটি বেশ ঝা-চকচকে ছেলে এই সময়ে ক্যান্টিনে ঢুকল। আর সমস্ত ক্যান্টিনকে চমকে দিয়ে লাবণি বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মুখটা ঝট করে নিচু করে লুকিয়ে ফেলল।

—কী হল রে?

—ওই যে অরিন্দম ঘোষ।

তিলক তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল।

—আপনি লাবণি মজুমদারকে খুঁজছেন তো।

—হ্যাঁ মানে, এখানেই তো আসার কথা বলা হয়েছিল আমায়। কিন্তু...

—লাবণি ইজ দেয়ার। হাইডিং

—হাইডিং? হোয়াই? ফ্রম হোয়াট?

—ফ্রম ইউ।

—ওঃ, খুব অবাক করে দিয়েছি না? কী বন্ধুদের সামনে এমব্যারাসড্‌ না কী?

—আপনি আসুন। এই একটা চেয়ার নিয়ে আয় তো রে। গোপাল এখানে একটা এক্সট্রা চেয়ার দে বাবা। আমাদের জামাইবাবু এসেছেন।—চঞ্চল হাঁকল।

ক্যান্টিনে অন্য যারা বসেছিল সব চকিত হয়ে এদিকে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে হুল্লোড়ের মধ্যে লাবণি এবং অরিন্দম ঘোষ সবাই চাপা পড়ে গেছে।

—আপনারা সব লাবণির বন্ধু। চেয়ারটাতে বসতে বসতে অরিন্দম ঘোষ, সবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে এনে বলল।

—হ্যাঁ, এই আমরা সবাই। আরও তিন চার গুণ বাইরে আছে। আমাদের সবাইকেই আপনাকে নেমন্তন্ন করতে হবে। আমরা ন'জন ব্যাটাছেলে আছি, আর সব মেয়েছেলে, আমাদের ন'জনকে স্পেশ্যাল গেস্ট করতে হবে।

—কেন? স্পেশ্যাল কেন?

—বুঝতে পারছেন না? এবারও চঞ্চল—আমরা এই ন'জন আপনার কুড বি রাইভ্যাল। ছেড়ে দিয়েছি।—মাছি তাড়াবার মতো একটা ভঙ্গি করল চঞ্চল।

লাবণি এই সময়ে জিভ ভেঙিয়ে বলল,—শখ কত?

—আপনাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ—অরিন্দম ঘোষ হাসতে হাসতে বলল।—কিন্তু শুভ ঘটনাটা আগে ঘটুক। শুনছি লাবণির নাকি প্রচণ্ড অমত। পাঁচ-ছ' মাস ধরে কেস-স্টাডি চলছে। হঠাৎ লাস্ট মোমেন্টে বেঁকে বসেছে।

নিলয় বলল, আপনার নামটা এফিডেভিট করে পাল্টে ফেলুন।

—কেন বলুন তো!

—আর একটি বোন অন্তত আমদানি করুন।

—আশ্চর্য ব্যাপার। একটা বোন? আমদানি? কোথা থেকে? কেন?

—তাহলে একটা অন্তত তফাত হয় অমৃতার কেসটার সঙ্গে।

—ব্যাপার কী? লাবণি, বুঝিয়ে বলো তো! আমি কিছুই...

—লাবণির বদলে আমি বোঝালে কোনও আপত্তি আছে?—তিলক বলল।

—আছে বইকি? লাবণির মুখ আছে, দু' পাটি দাঁত, জিভ, গলার স্বর, মাথায় বুদ্ধি অনুভূতি সবই তো আছে, লাবণির মাউথপিস লাগবে কেন?

—লাগবে। দোলা বল তো! একটু ইনট্রোডাকশন দে।

দোলার খুব নার্ভাস লাগছিল। অরিন্দম ঘোষ, খুব স্মার্ট, কিন্তু চালিয়াত টাইপ নয় একেবারেই। খুব সদয় এবং স্বাভাবিক দেখতে।

অরিন্দম বললেন—বলো। দোলা, বাঃ তোমার নামটা খুব নতুন ধরনের তো!

তখন দোলা বলল।

—আশ্চর্য! অরিন্দম ঘোষ বললেন, এই জন্যে? ইসস্ তোমাদের বন্ধু অমৃতা মেয়েটির কী হল তোমরা আর কিচ্ছু জানো না?

—কিচ্ছু না।—অনেকেই বলল একটু আগে পরে।

তিলক বলল, ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। জামিনে খালাস।

—দাঁড়াও দাঁড়াও এই যে তোমরা মেয়েটির স্বামীকে সন্দেহ করছিলে?

—ডাক্তারের সঙ্গে যোগসাজশ থাকতে পারে—তিলক বলল।

—হয়তো ওকে খুব মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, সীজার বলে ওদের পাড়ার একটি ছেলে বলছে, আধা-অজ্ঞান অবস্থায় ওকে গাড়িতে তোলা হয়। তারপর হয়তো পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। মারা যেতে...

দোলা, লাবণি দুজনেই এই সময়টা ককিয়ে উঠল—তিলক প্লি...জ।

অরিন্দম অসন্তুষ্ট গলায় বললেন—এ আবার কী! বিপদের প্রসঙ্গই সহ্য করতে পার না, তো সত্যিকারের বিপদ এলে তোমরা কী করবে? তোমাদের তো কোনও ডিফেন্সই নেই। তিলক প্লিজ কনটিনিউ।

—ও মারা যেতে, বডি পাচার করে এখন রটিয়ে বেড়াচ্ছে ও নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিজেই উঠে ঘোরের মাথায় কোথাও চলে গেছে। এখন নিরুদ্দেশে অ্যানাউন্স করছে...এই ভাবে ব্যাপারটা এসট্যাবলিশ্‌ড হয়ে যাবে বুঝেছেন?

—ওয়েল, তোমার রিজনিং খারাপ না।—কখন যে ভদ্রলোক আপনি ছেড়ে ওদের তুমি বলতে শুরু করেছেন...

—এই নার্সিংহোম আর ওই ডাক্তারের নামটা আমায় দেবে?

—'উজ্জীবন', বালিগঞ্জ প্লেসে। আর ডাক্তারের নাম রঞ্জন কার্লেকার।

—আমি আজ উঠছি। লাবণি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড,...অরিন্দম ঘোষ কেমন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন কিছু ভাবছেন।

—কোথায় যাচ্ছেন?

তিলক, চঞ্চল দুজনেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ওই ডক্টর কার্লেকরের সঙ্গে একবার...

তিলক বলল—আমি যাব।

দোলা বলল—আমিও।

—আমার একটা ছোট্ট মারুতি আছে বাইরে। তিনজনের বেশি নিতে পারব না। লাবণি তো অফ কোর্স যাবেই। যাচ্ছেই।

উনি চলতে শুরু করলেন, যেন আর কোনও কথা নেই। কথা হয় না। গাড়ির দরজা খুলে বললেন—তিলক তুমি ভাই ফ্রন্ট সিটে বসো। মেয়েরা পেছনে থাক। ও হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে একটু জানিয়ে দাও—ফিরতে দেরি হতে পারে। মোবাইল ফোনটা ওদের হাতে দিলেন তিনি। তারপর গাড়ি ঘোরালেন।

'উজ্জীবন' নার্সিংহোমে ওরা যখন পৌঁছল তখন ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে। প্রচুর ভিজিটর ভিড় করেছেন লাউঞ্জে। ওদের দিকে না তাকিয়ে অরিন্দম সোজা চলে গেলেন অর্ধবৃত্তাকার এনকোয়ারি কাউন্টারে।

—ডঃ কার্লেকরের সঙ্গে একটু দেখা করিতে পারি?

—সার তো এখন নেই। সাতটার পর ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে আর.এম.ও.-কে নিয়ে রাউন্ড দেবেন।

—তো এখন ওঁকে কোথায় পাব?

—কী করে বলব? খুব সম্ভব উডল্যান্ডস-এ। অপারেশন আছে।

—সাতটার পরে এখানে আসবেনই?

—ওরে বাবা, কাঁটায় কাঁটায়। কী দরকার আপনাদের? কেসটা কী?

তিলকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কেস জন্ডিস।

—রোগী অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? ভীষণ বমি করছে?

—না, সেরকম কিছু নয়।—অরিন্দম তাড়াতাড়ি বললেন।

—সারের সঙ্গে দেখা করতে হলে সাতটা পর্যন্ত...

অরিন্দম বললেন—চলো, আমরা সময়টা কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাটিয়ে দিই। আলোচনাও করা যাবে।

বালিগঞ্জ ধাবায় ভীষণ ভিড়, অরিন্দমের পছন্দ হল না, কোয়ালিটিও তাই। ওরা একটা অল্প নামী দোতলার রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল।

হালকা রং ভেতরটায়। স্বপ্ন-স্বপ্ন আলো জ্বলছে। খাবারের অর্ডার দেবার সময়ে দোলা আর লাবণি হাঁ হাঁ করে উঠল। আমাদের জন্য শুধু চা, বাস।

—সময়টা অনেকখানি। তিন ঘণ্টা এখানে কাটাতে হবে। এটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা খালি পেটে যেমন বেদ বেদান্ত হয় না, তেমনি ইনভেস্টিগেশনও হয় না। কোনও কাজ ভালভাবে করতে গেলে শরীরটা চাঙ্গা রাখতে হয়। মনটাও। মনটা আবার শরীরের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। কী? খুব জ্ঞান দিচ্ছি? না, তিলক?

—তা একটু দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি যে অমৃতার খোঁজে এই ডাক্তারকে ধাওয়া করতে পর্যন্ত পিছপা হবেন না, এটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা, অন্তত আমি ভীষণ অশান্তিতে ভুগছিলাম। যে মেয়েটা গত মাসেও আমাদের সঙ্গে ক্লাস করেছে, ফুচকা খেয়েছে,

সে আজ হারিয়ে গেছে, অথচ আমরা এতগুলো দামড়া ছেলে মেয়ে কিছু করছি না, করতে পারছি না, এই অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছিলুম না।

অরিন্দম বললেন—হ্যাঁ, অদ্ভুত কেস! কিন্তু এ ধরনের কেস এ দেশে বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। কোনও প্রতিকার নেই। দ্যাখো তিলক, আমি এখানকারই ছেলে, এখানকারই ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করেছি। আমি এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছেলেদের যে অধঃপতন দেখেছি তাতে করে যে কোনও বাবা-মাকে বলতে পারি—এঞ্জিনিয়ার? মেয়ের বিয়ে দেবার আগে দুবার ভাবুন। যে কোনও রেসিডেনশ্যাল কলেজের হস্টেলে যা চলে তার মধ্যে চরমতম ক্রুয়েলটি, ডিবচরি আমি দেখেছি। তোমরা বলবে, আমিই একা ভাল হয়ে এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছি? হোয়াটস দা প্রুফ? আমি জোর দিয়ে বলছি তিলক, লাবণি, দোলা, আ অ্যাম ওয়ান অফ দা ফিউ হু হ্যাভ কাম ব্যাক আনটেইন্টেড।

এখন কী হয় জানি না, আমাদের সময়ে মেয়েদের ওখানে সাঙ্ঘাতিক র‍্যাগিং করা হত। তার ডিটেইল্‌স আমি এই মেয়েদের সামনে বলতে চাই না। ভাল ভাল রেজাল্ট করা ছেলেরা অমানুষের মতো ব্যবহার করে। তাদের ভেতর থেকে নিষ্ঠুরতম, কুৎসিততম সেডিস্ট বেরিয়ে আসে। ওরা জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতা ওখানে স্বাধীন থাকার সুযোগে করে নিতে চায়। অন গড, লাবণি আমি ও সবের মধ্যে যাইনি। আমার মা-বাবা দুজনেই প্রোফেসর। একটা অন্য ধরনের ভ্যালুজ-এর মধ্যে আমরা বড় হয়েছি। আমি আর আমার বোন। বোনের যখন এঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এল, আমিই ফার্স্ট না করেছিলাম। সবচেয়ে ভাল কী জানো দোলা, নিজেদের পছন্দে, অনেকদিন মেলা মেশা করে বিয়ে করা। এখন লাবণির আপত্তি হতেই পারে। দু-চার দিনের মেলামেশায় কে কাকে বুঝতে পারে? আমি তো বুঝতেই পারিনি লাবণি এত ভিতু, এবং...এবং লাবণির মধ্যে এত ফেলো-ফিলিং আছে।

—আপনি কী ভেবেছিলেন?—দোলা খুব আস্তে প্রশ্ন করল।

খাবার-দাবারগুলো আসতে শুরু করেছে।

অরিন্দম বললেন—এগুলোর সদ্ব্যবহার করো ভাই। তিলক প্লিজ। লাবণি বি প্র্যাকটিক্যাল।

কয়েক গ্রাস খেয়ে তিলক বলল—অরিন্দমদা বললেন না লাবণিকে আপনি কী ভেবেছিলেন?

—তুমি শুনে কী করবে ব্রাদার?

—কিছু না, আমাদেরও তো লাবণি সম্পর্কে একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে! মিলিয়ে নিতুম।

—আমি ভেবেছিলাম ও খুব সাহসী, খুব স্মার্ট, যে কোনও সিচুয়েশনে ও মানিয়ে নেবে। ওর সঙ্গে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে ও তার ঠিক উত্তরটা দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে লাবণি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, সেলফিস নয়, জাস্ট সেলফ-সেন্টার্ড। দুটোর মধ্যে তফাত আছে বোঝো তো?

—ওটুকু ইংরেজি আমরা বাংলার ছেলেপুলে হলেও জানি।

—ভাষার কথা হচ্ছে না কনসেপ্টটার কথা বলছি। সেলফিশ লোক সব সময়ে নিজের সুবিধেটা দেখবে, কারও সঙ্গে কোনও সম্পদ শেয়ার করতে চাইবে না। একলা খাবে, একলা পরবে, একলা ভোগ করবে। আর সেলফ-সেন্টার্ড লোক নিজের বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতেই পায় না। দেখিয়ে দিলে তখন হয় তো তার মনুষ্যত্ব কাজ করে, কিন্তু আদারওয়াইজ সে নিজেকে নিয়েই থাকে। আজকের পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই সেলফ-সেন্টার্ড, সমাজটাই এখন এই ধাঁচের হয়ে গেছে।—বলে অরিন্দম একটু হাসল—লাবণি, কিছু মনে করলে না তো? লাবণি শুধু মাথা নাড়ল, তার চোখ দুটো ভিজে ভিজে উঠছে যদিও সে একেবারেই আবেগপ্রবণ নয়।

তিলক বলল—ঠিক আছে। আমরা সেলফ-সেন্টার্ড। আপনি বুঝি এ জেনারেশনের নন? কত বড় হবেন আপনি আমাদের চেয়ে?

অরিন্দম হেসে বলল—তিরিশ ক্রস করেছি ভাই। আমি এখনও জানি না, আমি সেলফ-সেন্টার্ড কি না। চেষ্টা করি বুঝতে।

দোলা বলল—আচ্ছা অরিন্দমদা, আপনি পাত্রী দেখতে এসেছিলেন, হঠাৎ আমাদের কাছে অমৃতার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন কেন? লাবণির কাছে প্রুভ করতে যে আপনি আরেক অরিসূদন নন? মনে করবেন না কিছু। আপনি ফ্র্যাংকলি কথা বলেছেন, তাই আমিও বলতে সাহস পেলাম।

—তুমি যা বললে সেটা আমার সাবকনশাসে থাকতেই পারে, কিন্তু ফার্স্ট রি-অ্যাকশন যেটা হল সেটা হচ্ছে আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম এই দোলা এই লাবণি কী রকম ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। পেছনে দু-চারটে ক্রুয়েল মুখ, আমাদের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের মতো, যারা আমাদের ব্যাচকে র‍্যাগ করেছিল। আমার মাথার মধ্যেটা কেমন করে উঠল। আই রিজলভ্‌ড্ দেন অ্যান্ড দেয়ার টু সি ইট টু দা এন্ড।

—আপনাকে কী ভাবে র‍্যাগ করেছিল?—তিলক জিজ্ঞেস করল।

—দে মেড মি ড্রিঙ্ক মাই ওন ইউরিন, দেন দেয়ার্স।

—বলেন কী? আপনার বমি হল না?

—নাঃ, আমি মোরারজি দেশাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে দু গেলাস খেয়ে ফেললাম।

—তারপর!

—তারপর অনেক আদিরসাত্মক খিস্তি করল। মা-বাবকে নিয়ে।

লাবণি-দোলা শিউরে উঠল।

দোলা বলল—আপনি সহ্য করলেন, কিছু বললেন না।—সে উত্তেজিত।

অরিন্দম বললেন—আমি কী বললাম জানো? বললাম আরে ইয়ার এ সব তো জানা কথা ঔর কুছ নয়া চিজ হ্যায় তো বাতাও।

—বললেন? এই কথা?

অরিন্দম এবার হেসে ফেললেন, বললেন—এখন ভাবি যে এইরকম বললে হত। তখন রাগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অজ্ঞান মানে সত্যি-সত্যি অজ্ঞান। একটা বছর আঠারোর প্যাংলা ছেলে তো! ওভার প্রোটেকটেড।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? জ্ঞান ফেরাবার নামে বালতি বালতি জল ঢেলে আমাকে ভিজিয়ে আমার বিছানা ভিজিয়ে ছেড়ে দিল। একজন ইউপির ছেলে ছিল—বলল, ডরপুক কাঁহিকা, ভাগ হিঁয়াসে।

—ইউরিন খাওয়াটা?

—ওটা সত্যি।

—ইঁহ্‌হ্‌হ্—লাবণি মুখ চোখ বিকৃত করে বলে উঠল।

—কী হল, ডিসিশন নিয়ে ফেললে না কি? লাবণি?

লাবণি বলল—চুপ করুন তো। তখন থেকে বক্‌বক্‌বক্। খুব গাবাতে পারেন।

—নিজের ঢাক মাঝে মধ্যে নিজেকেই পেটাতে হয়, বুঝলে ম্যাডাম?

ঘড়ির দিকে চোখ, দোলা বলল—সময় হয়ে এসেছে কিন্তু।

বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিলেন অরিন্দমদা। গাড়িতে উঠে তিলক জিজ্ঞেস করল—আমাদের লাইন অফ অ্যাকশন কী সেটা একবার বলুন।

—জাস্ট ফলো মি। নিজেরাই বুঝতে পারবে।

সন্ধের আলো জ্বলে উঠেছে নার্সিংহোমে। এখন কিছু কিছু ফিরতি মানুষের ভিড়। সাতটা বাজতে পাঁচ। এনকোয়ারির ভদ্রমহিলা বললেন—ও আপনারা? যান, সার ঘরে আছেন, দশ মিনিটের মধ্যে রাউন্ডে বেরোবেন। দোতলায় উঠে প্রথম বাঁ দিকের ঘর।

ঘরের সামনে লেখা ডঃ রঞ্জন কার্লেকর এম.বি.বি.এস., ডি.জি.ও., এম.ডি. (ও.এন.জি) এম.আর.সি.ও.জি (লন্ডন), এফ.আর.সি.ও.জি (এডিনবরা)।

পর্দা ঠেলে সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন অরিন্দম। সামনে বসা একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডাক্তার। অতজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকাতে অরিন্দম বললেন—আমরা সবাই অমৃতার বন্ধু। অমৃতা সম্পর্কে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।

চশমাটা খুলে রাখলেন ডাক্তার, চোখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—মারবেন না কি?

—আমাদের দেখে কি সে রকম মনে হচ্ছে? তিলক বলল। অরিন্দম দোলাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এ হল দোলা, এ হল লাবণি, এর নাম তিলক, এখন এরা সব্বাই কলকাতা য়ুনিভার্সিটির বাংলা-বিভাগের ছাত্র, মানে অমৃতার সহপাঠী। আমরা ঠিক করেছি, অমৃতাকে আমরা খুঁজে বার করবই। প্রথমেই এসেছি আপনার কাছে। আই হোপ ইউ'ল কোঅপারেট।

সামনে বসা ভদ্রলোককে চোখের ইশারায় চলে যেতে বললেন ডাক্তার। কে জানে, কোনও সিকিওরিটি ম্যানকে ডাকতে পাঠালেন কি না। তারপর বললেন—অমৃতা গোস্বামী নিখোঁজ হয়েছে একমাসের ওপর হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা এতদিন কী করছিল?

—আমরা ঠিক কী ভাবে এগোব বুঝতে পারছিলাম না। তিলক বলল।

—আমার যা বলার আমি পুলিসকে বলেছি। এস.ডি.জে.এম আলিপুরকে বলেছি। অমৃতার স্বামী এবং তার লোকজন এখানে ভাঙচুর করে, থানায় এফ.আই.আর. করে ওরা আমাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। এক রাত হাজতবাস করেছি। তারপর জামিনে খালাস। কেস যখন উঠবে তখন কথা বলব, এখন না। আমার রাউন্ড দেবার সময় হয়ে গেছে। আপনারা এখন আসুন।

ওপাশের একটা দরজা দিয়ে উনি ভেতরে চলে গেলেন। ওরা বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

তিলক বলল—অরিন্দমদা এবার?

—এবার বাড়ি। বাড়ি চলো।

গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে অরিন্দম বললেন—দ্যাট ডক্টর নোজ আ লট। অ্যান্ড হি ইজ বেসিক্যালি নট আ ক্রুয়েলম্যান। দিজ ইজ ইমপর্ট্যান্ট। উইদিন আ উইক উই উইল সল্‌ভ দা অমৃতা রিড্‌ল। হোপফুলি।

—এক সপ্তাহ?

—আবার কী?

—এত কনফিডেন্স আপনার? দোলা বলল।

—আমার নয় দোলা, ওই ডাক্তারের, কী যেন নাম? কার্লেকর। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি শিওর অফ হিমসেলফ।

—তাতে কী হল? তিলক অবাক হয়ে বলল।

—দেখো তিলক, যারা হার্ডনড ক্রিমিন্যাল তাদের কথা আলাদা। কিন্তু একজন ডাক্তার যদি কোনও ক্রাইম করে ফেলেও থাকেন তিনি তো ক্রিমিন্যালের পর্যায়ে পড়েন না? পড়েন?

—সাধারণত না।

—ওঁদের কথাবার্তা হাবভাব প্রকাশ করে দেয় ভেতরে কোনও গণ্ডগোল আছে কি না। এখন এই ডাক্তারের মুখে তোমরা লক্ষ করেছ কি না জানি না, সামান্য হাসি লেগে ছিল। যাকে বলে দুষ্টু হাসি। খেয়াল করেছিলে?

লাবণি বললে—হ্যাঁ, আপনার মুখে যেমনটা মাঝে মধ্যে লেগে থাকে।

—থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ওই ডক্টর কার্লেকর খুব মজা পাচ্ছিলেন আমাদের দেখে। ইনটারেস্টিং ম্যান। ক্রাইম করে ওরকম মুখের ভাব হয় না।

—হোয়াট ইজ আওয়ার নেকস্ট কোর্স অফ অ্যাকশান? তিলক জিজ্ঞেস করল।

—ভাবতে দাও, একটু ভাবতে দাও।

প্রথমে দোলাকে নিউ বালিগঞ্জে নামিয়ে সোজা উত্তরে গিয়ে লাবণিকে গোয়াবাগানে নামাল অরিন্দম। তারপর তিলককে আমহার্স্ট স্ট্রিটে নামিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল দক্ষিণের দিকে।

লাবণির মা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গিয়েছিলি রে?

লাবণি বলল—বেড়াতে।

—অরিন্দমের সঙ্গে?

—হ্যাঁ কিন্তু আরও বন্ধুরা ছিল।

—তা হলে কথাবার্তা কিছুই হল না?

—হলও বটে, হল না-ও বটে।

—কী যে হেঁয়ালি করিস! মত কি তার পুরোনো জায়গায় অনড় আছে? না বদলাল।

—হুঁ।

—কী হুঁ হুঁ করছিস! বদলেছে?

লাবণি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—বদলেছে মা। —লোকটা বেশ! ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না—কথা দিচ্ছি। কিন্তু এম.এ. ফাইন্যালটা হয়ে গেলে।

—ওকে ছাড়া আর কাউকেই...বাব্বা, এত?

—কেন তোমার হিংসে হচ্ছে মেয়ে পর হয়ে গেল?

—হিংসে তো বটেই। কিন্তু এ হিংসেও যে কী সুখের, নিজে মা না হলে বুঝতে পারবি না।

—তবে একটা কথা মা। অন্য কোনও নাম ওর বার করতে হবে তোমাদের। অরি বা অরিন্দম বলে আমি ডাকতে পারব না। ওর বাবা মা তো অরি বলেই উল্লেখ করছিলেন। আর কোনও নাম নেই?

—আছে, মা খুব গম্ভীর ভাবে বললেন—ওর দিদিমা ওকে একটা অন্য নামে ডাকেন?

—বাঃ ভাল তো! কী নাম?

মা বললেন—নাড়ু। ডাকবি?

সেদিন রাত্রে লাবণি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। অনেক জল। অনেক, কিন্তু সমুদ্র নয়। স্থির জল। তার একুল ওকুল দেখা যায় না। সেই জলে একটা মড়া ভেসে যায়। কাছে এলে মনে হয় ওটা অমৃতার শব। একটা ফিকে নীল শাড়ি পরনে। চুলগুলো খুলে গেছে, জলে ছড়িয়ে গেছে। আরও কাছে এলে সেই শবের চোখ দুটি খুলে গেল, লাবণি দেখল চোখ দুটো তার। অমনি আয়ত। অমনি কাজল টানা। বড় বড় পাতা ছাওয়া বাদামি মণিওয়ালা চোখ। ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে কার নাম ধরে ডাকল। তারপরই সে চমকে উঠে পাশ ফিরে শুল।

পরদিন সকালে ওর আট বছরের ছোট ভাই অবন, ওর পাশের খাটে শোয়, হাসতে হাসতে বলল, দিদি তোর হল কী? ঘুমের মধ্যে বুড়োদের মতো 'হরি হরি' করে ডাকছিলি? কবে থেকে তোর এত হরিভক্তি হল জানি না তো?

৮

—'আমি যাব না, যাব না, যাব না'—এই প্রতিজ্ঞা শম্পার। নিবেদিতা মাঝে মাঝে তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখছেন। মেয়েটার মুখ চোখ কঠিন। তিনি কিছু বলতে গেলে ধমকে ধমকে কথা বলছে।

—দুধটা খেয়ে নে শম্পি।

—তুমি খাও।

—আমি তো এক্ষুনি অফিস যাব, ভাত খাব...

—আমিও তো

—তুই তো বললি অফিস যাবি না, ছুটি নিচ্ছিস।

—অফিস যাচ্ছি না মানেই বেরোব না, তা তো বলিনি।

—বেরোবি? কোথায়?

—তোমার না জানলেও চলবে।

অনেকক্ষণ সহ্য করেছেন নিবেদিতা। আর পারলেন না। বললেন—তা তো বটেই পাঁচ বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত বড় করে তুললুম স্রেফ একা হাতে, নিজের অসুখ-বিসুখ গ্রাহ্য করিনি। একদিকে অফিস চলেছে আর একদিক মেয়ের জামা সেলাই, পড়া দেখিয়ে দেওয়া...

—প্লিজ মা, প্লিজ—শম্পা কেঁদে ফেলল—তুমি অমন করে বলো না। আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে আছে। মন খারাপটাই রাগ হয়ে বেরোচ্ছে।

—মন খারাপ তো হবেই। হওয়ারই কথা। নিবেদিতা বললেন, মন কি আমারই কম খারাপ? কোথায় গেল মেয়েটা?

—মাসি মেসোর কী রকম গা-ছাড়া ভাব দেখলে মা!

—ঠিক বলেছিস! ঠিক বলেছিস। অদ্ভুত একটা চুপচাপ ভাব। যেন নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দুজনেই। নিবেদিতা বললেন, ভগবান না করুন, আমার যদি অমনি হয় তো আমি তো দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলব।

—আসলে মাসি-মেসোর সারা জীবনের দুঃখকষ্ট বোধ হয় এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে মা। আমি যদ্দুর জানি মাসিদের বিয়েটা ওঁদের কারও বাড়িতেই মেনে নেয়নি বলে চিরদিন ওঁরা একা। একা একাই সব সামাল দিতে হয়েছে। অমৃতার ঠাকুমা বোধহয় নাতনি হওয়ার পর ওদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। অমৃতার মামার বাড়িতে কে আছে না আছে, আমি জানিই না। বুঝতে পারি, এঁদের ভীষণ সাফারিং। অত তো স্ট্রাগ্‌ল করে দিন কাটাচ্ছিলেন, তার ওপর হল মাসির ওই রকম দুরারোগ্য অসুখ। .

নিবেদিতা রান্নার শেষে এখন রান্নাঘর পরিষ্কার করছেন। তাঁর হাতে একটা ঝাড়ন আস্তে আস্তে তেলচিটে হয়ে উঠছে। শম্পা হঠাৎ দেখল তার মা যেন বড্ড রোগা হয়ে গেছে, যেন বুড়োটে, অথচ মায়ের মাথায় পাকা চুল দেখাই যায় না। কতই বা বয়স হবে মায়ের। চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ! সে অমৃতার মা বাবার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছিল, একাকিত্বের কথা বলছিল বটে, কিন্তু তার মায়ের দুঃখ-দুর্দশাও তো কিছু মাত্র কম নয়। তার পাঁচ বছর বয়সে হঠাৎ এনকেফেলাইটিস হয়ে তার বাবা চোদ্দো-পনেরো দিন ভুগে মারা গেলেন। তার মামারা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। বড় জন দিল্লিতে থাকেন। কিন্তু ছোট মামা তো থাকেন এখানেই কোম্পানির ফ্ল্যাটে দেওদার স্ট্রিটে। বাবার কাজকর্ম চুকে গেলে একমাত্র ছোট বোনকে না কি বলেছিলেন—আমার উচিত ছিল তোকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কম্প্যানির দেওয়া ফ্ল্যাট, আত্মীয়স্বজন অ্যালাও করে না বুঝলি তো!

নিবেদিতা না কি বলেছিলেন—না দাদা, এ বাড়ি আমার শ্বশুড়বাড়ি। ওঁর বাড়ি। এখান ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। তা ছাড়া স্কুল এখান থেকে খুব কাছে।

নিবেদিতা তখনও তাঁর স্বামীর অফিস থেকে প্রাপ্য টাকা-পয়সার কিছুই পাননি। ছোট মামা টাকা-পয়সার দরকার আছে কি না আছে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। আর এদিকে তার জ্যাঠামশাই? তিনি অবশ্য উদার স্বরে বললেন, বউমা ভেবো না, আমাদের যখন জুটছে, তোমাদেরও

জুটে যাবে, আলাদা সংসার আর রাখার দরকার কী? তবে আস্তে আস্তে নিবেদিতা তাঁর ভাসুরের রান্নাঘরে ঢুকে যেতে লাগলেন। এই সময়ে যেমন স্বামীর টাকা-পয়সাগুলো পেলেন, তেমন একটা চাকরি দেবার অফারও পাঠাল ওরা। নিবেদিতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর ভাসুর ও জা অনেক বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শরীর থাকবে না বউমা, কেন তুমি চাকরি করতে যাবে? কিন্তু নিবেদিতা তত দিনে বুঝে গেছেন এ সব কুম্ভীরাশ্রুর মানে। কোনও মতে যদি মাঝের দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া যায়। গোটা বাড়িটাই ওঁদের হয়ে যাবে, উপরন্তু জুটবে একটি বিনা মাইনের রাঁধুনি, একটি ফাই ফরমাশ খাটার মেয়ে।

আশ্চর্য হয়ে শম্পা ভাবে—কেন সব মৃত্যুর গল্প, সব বিধবার গল্পই এ রকম এক রকম! কেন অন্য কিছু হয় না। স্বামী মারা গেলেই বিধবার ভাসুর দেবর জা-রা স্বার্থপর ধান্দাবাজ হয়ে ওঠে কেন? স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব তো বলে—আহা, এই বয়সে স্বামী মারা গেল, ওই টুকুনি মেয়ে নিয়ে বেচারি এখন কী করবে? খাওয়া-পরার বা শিক্ষা-দীক্ষার ভাবনা নেই, সে তো আমরাই আছি, ওর নিজেরও কিছু টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু—শোক? এই শোক এই একাকিত্ব? এগুলো কাটিয়ে ওঠার কী মন্ত্র ওদের আমরা দিতে পারি?

শম্পাকে মা কোনওদিন সেভাবে সংসারের কাজ করতে দেননি। অসম্ভব কর্মঠ মানুষ নিবেদিতা। এখনও শম্পার ও নিজের ব্লাউজ পেটিকোট সেলাই করেন। সালোয়ার-কামিজ তো করেন হেলায়। আর এই সব করেন দশটা পাঁচটার চাকরি করে। রান্না করে। ঘর পরিষ্কার করা ও বাসন মাজার একটা ঠিকে লোক আছে তাদের। বাস। শম্পা মাঝে মাঝে শখের রান্না করে, ঘরদোরও অবশ্য গোছায়, বিছানা ঝাড়ে, কিন্তু কোনওটাই দায়িত্ব নিয়ে নয়। সে যদি একদিন তাড়াহুড়োয় বিছানা ঝাড়তে ভুলে যায়, মা কিছুই বলবে না। নিজে ঝেড়ে দেবে।

সে হঠাৎ মার হাত থেকে ঝাড়নটা কেড়ে নিয়ে বলল—কী এত পরিষ্কার করছ মা! দাও বাকিটা আমি করে দিচ্ছি।

নিবেদিতার একটু হাঁপানি আছে। তিনি বললেন—তুই পারবি? আমি তাহলে খোলা হাওয়ায় গিয়ে একটু নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি। শোন গ্যাসটা ভাল করে মুছবি। ওভন দুটোয় আর এই তলার লোহার পাইপটায় একটু কেরোসিন ঘষে দিবি। তলায় সবুজ বোতলটায় কেরোসিন আছে। ওভন মোছার আর ধাপিটা মোছার ঝাড়ন আলাদা। একটু সাবান নিয়ে নিস। নইলে উঠবে না। সবশেষে একটু ফিনাইল দিবি। পারবি তো এত সব?

—এত করার দরকার কী মা?

—এত? ওভনগুলোয় মরচে ধরে জং ধরে গেলে পাল্টাতে হবে। ধাপিটা যদি ছেড়ে দিস এমন তেলচিটে হয়ে যাবে যে সে আর কহতব্য নয়। ফিনাইল দিলে পোকা-মাকড় আরশুলার হাত থেকে কিছুটা রেহাই। থাক তুই পারবি না। আমায় দে।

—না, না, পারব। জাস্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মা, রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলে, ঝাড়ন দিয়ে শম্পা তার নিজের যাবতীয় দুঃখ, সন্দেহ, অপমান সব প্রবল বেগে ঝাড়তে থাকল। দুঃখ মুছতে মুছতে কেমন একটা চকচকে আকার ধারণ করে, আর দুঃখ থাকে না শুধু, যেন ট্রাজেডি হয়ে যায়—ট্রাজেডি অফ শম্পা সেন, হু ট্রাস্টেড। না শুধু শম্পা কেন, ট্রাজেডি অফ নিবেদিতা সেন হু লস্ট হার হাজব্যান্ড অ্যাট দা এজ অফ থার্টি ওয়ান। মুছতে মুছতে তার সন্দেহ এক অমোঘ সত্য রূপে, বিশ্বাসঘাতকতা রূপে দেখা দেয়, তার অপমান হয়ে যায় আত্মসম্মান। শুধু আত্মসম্মান বললে যেন সবটা বলা হয় না, হয়ে ওঠে আত্মমর্যাদা। এতক্ষণ যে তার প্রবল মন খারাপ করছিল তার মধ্যে তো শুধু অমৃতাই ছিল না, সে নিজেও ছিল।

মা বেরিয়ে যাবার পরে, শম্পা আর একবার গা ধুয়ে নিয়ে ভাল করে সাজল। গরম পড়ে গেছে। একটা হালকা, নতুন ছাপা শাড়ি বাছল সে। ঠোঁটে একটু মেরুন ধাঁচের লিপস্টিক, চোখে

হালকা করে আই-ব্রো পেনসিল। বেণীটা ঝুলতে থাকল, কপালে একটা মেরুন রঙের ছোট্ট টিপ পরে সে ছাতা আর মেরুন ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রয়েজ কমপিউটার ফার্মে কাজ করতে করতেই আরও বেশ কয়েকটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। মনে হয় কোনও একটাতে হয়েই যাবে।

প্রথম সে ঢুকল 'উইলপাওয়ার'-এ—মিঃ মিশ্র আছেন? একটু দেখা করব।

—আপনার নাম?

—শম্পা সেন, ফ্রম 'রয়েজ'। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ল।

—আরে মিস সেন—কী ব্যাপার? 'রয়েজ'-এর জন্য কী করতে পারি, বলো।

—'রয়েজ' নয়, আমার জন্য করতে হবে।

—তোমার জন্য? তুমি ওখানে নেই?

—আছি এখনও। কিন্তু থাকবার ইচ্ছে নেই। প্লিজ কীপ ইট সিক্রেট।

—তা না হয় রাখলাম। কিন্তু তুমি ঠিক কী চাইছ?

—বেটার ওয়ার্কিং অ্যাটমসফিয়ার, অ্যান্ড ন্যাচার‍্যালি বেটার পে। অ্যানালিস্ট হিসেবে আমার তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। আমি কি একটা প্রমোশন আশা করতে পারি না?

—ওয়েল, অফ কোর্স, কিন্তু তুমি আবার যদি হুট করে 'উইল পাওয়ার'ও ছেড়ে দাও?

—তেমন কোনও কারণ ঘটলে তো ছেড়ে দেবই। আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই তেমন কিছু ঘটাবেন না।

—তোমার ফ্র্যাংকনেস আমাকে মুগ্ধ করেছে মিস সেন। আমাকে দু'দিন সময় দেবে? আমি আমাদের পোজিশনটা একটু রিভিউ করে নিতে চাই।

—সময় দিতে পারব না মিঃ মিশ্র। আপনার যা রিভিউ করার এক্ষুনি করে নিন। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং আমি এক্ষুনি আরও কয়েকটা অর্গ্যানাইজেশনে যাব। একটা না একটায় পেয়ে যাব ঠিক।

—আচ্ছা! এত তাড়া?

—এতই তাড়া।

—ঠিক আছে। তোমাকে রেখে নিচ্ছি। কিন্তু প্রজেক্ট নিয়ে বাইরে যেতে হতে পারে।

—মোস্ট ওয়েলকাম। শুধু থাকার বন্দোবস্তের সময়ে যদি মনে রাখেন আমি মেয়ে তাহলেই আর কোনও অসুবিধে থাকবে না।

তিন দিন পরে 'রয়েজ'-এ পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে 'উইলপাওয়ার'-এ যোগ দিল শম্পা। এ তিনদিন অফিস গেল না। অন্য কোথাও বেরোল না। খালি অমৃতার কথা ভাবল। অমৃতাই তাকে বলেছিল—প্রস্তাবটা তোর পক্ষে অসম্মানজনক এটা বুঝতে তোর আমার কাছে আসতে হবে শম্পা?

অমৃতা এমনিতেই যাকে বলে প্রাজ্ঞ। তার ওপরে বিবাহিত। বিয়ে মানুষকে অন্য অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক পরিণত করে দেয় তাকে। কিন্তু সেই অমৃতা যে না-কি তাকে একটা মহাসর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল, সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না, কেন? কেন? কী এমন সে পরিস্থিতি যা অমৃতার বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার বাইরে, যা তাকে এমনভাবে পরাজিত করতে পারে? কী সেটা? কী? কী? কী?

মাকে সে জানাল না পর্যন্ত যে সে চাকরি বদল করেছে। মায়ের প্রশ্নের মুখোমুখি এখনই সে হতে চাইছে না। কেন না মায়েরও তার কাছ থেকে কিছু তিরস্কার প্রাপ্য রয়েছে। সৌমিত্রর প্রস্তাবটায় মা না করেনি। অবশ্য, বেড়াতে যাওয়ার কথা সে মাকে বলেনি, কাজের কথা বলেছিল, কিন্তু একমাত্র সৌমিত্রর সঙ্গেই সে যাচ্ছে সে কথা তো গোপন করেনি! মা কী করে তাকে ছাড়তে চাইল! মা নিজে তো বিবাহিত। মা জানে না দিঘায় নির্জন মুহূর্ত আসতে পারে? মা জানে না সৌমিত্র আগেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে? মা জানে না এরকম পরিস্থিতিতে একজন মেয়ের কাছে একজন পুরুষ কী হয়ে উঠতে পারে?

আসলে লোভ! অস্বীকার করে লাভ নেই তার মা যে কোনও মূল্যে এই বিয়েটা চেয়েছিল।

মায়ের মতো রক্ষণশীল আবহাওয়ায় বড় হওয়া, বাস করা একজন মহিলা। মেয়ের বিয়ে হবে, এই লোভে তিনি মেয়েকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কী করে সে আর মায়ের ওপর আস্থা রাখবে? অমৃতা, অমৃতাই তাকে বাঁচার মন্ত্র দিয়ে গেছে। নিজে মরে। না, না, অমৃতা, তুই কখনও মরতে পারিস না, অমৃতা তুই অমৃতা। তুই কখনও অতি নশ্বর মানুষদের ভাগ্য স্বীকার করে নিস না। আমি শম্পা, তোর ছোটবেলার বন্ধু, কত ঈর্ষা করেছি তোকে, কত জ্বালিয়েছি অভিমান করে করে, কিন্তু আমি তোকে ভালবাসি, আমি তোকে শ্রদ্ধাও করি, পূর্ণ আস্থা আছে আমার তোর শক্তি, তোর বুদ্ধির ওপরে। অমৃতা তুই কোনও জ্যোতির্বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে একবার দেখিয়ে দে। সংসারে ভালমানুষদের, ভাল মেয়েদের ক্ষতি হয় না, কেউ করতে পারে না।

গরম চোখের জল টপ টপ করে পড়ে শম্পার চিবুক, গলা, ওপর বুক সব ভিজিয়ে দিতে লাগল। কী এখন করবে সে? অমৃতার জন্য কিছুই করতে পারবে না? কিছু না?

হঠাৎ একটা সংকল্প জাগল তার। সে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা খুলে কয়েকটা ফোন নম্বর টুকল।

—হ্যাললো, যাদবপুর থানা? ও.সি.র সঙ্গে একটু কথা বলব।

—বলছি।

—আপনাদের অঞ্চলে ৪/১এ সেন্ট্রাল পার্কে অমৃতা গোস্বামী...।

—আপনি কে বলছেন?

—ওর বন্ধু!

—নাম?

—নামে দরকার নেই। আমার বন্ধুকে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এবং 'উজ্জীবন' নার্সিংহামের ডাক্তার মিলে কিছু করেছে।

—কিছু করেছে মানে কী?

—মানে খুন করেছে কি না জানি না। আপনাদের জানবার কথা, আপনারা ইনভেস্টিগেট করুন।

সে ফোন নামিয়ে রাখল। তারপর করল বালিগঞ্জ থানায়। ওঁরা বললেন ওটা কড়েয়ার কেস।

—হ্যাললো কড়েয়া থানা।

—ইয়েস

—ও.সি-র সঙ্গে একটু কথা বলব...।

—ধরুন...।

—একটু পরে ভীষণ গম্ভীর বাজে মতো গলায় প্রশ্ন এল—কে বলছেন? আমি কড়েয়া থানার ও.সি.।

—আপনাদের এলাকায় 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কে?

—আমি অমৃতার বন্ধু। সে নিখোঁজ হয়েছে। এখনও খোঁজ দিতে পারছেন না কেন? 'উজ্জীবন'-এর পেছনের পুকুরটা দেখেছেন?

—মেয়েটি পুকুরে আত্মহত্যা করেছে এ ধারণা আপনার হল কেন?

—আত্মহত্যা নয়। কখনও নয়, হয় হত্যা করে ওকে ওখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর নয় তো অ্যাকসিডেন্ট। রাতে হয়ত ওর ফোন এসেছিল ভাল বুঝতে পারেনি—নেমে আধা-আচ্ছন্ন অবস্থায় পুকুরে।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন পুকুরটা চারপাশ থেকে জাল দিয়ে ঘেরা। আপনার নাম?

—শম্পা সেন।

—আবাস?

—কুড়ির-এ ডাফ স্ট্রিট—বলবে না বলবে না করেও শম্পা কী রকম বোকা আনাড়ির মতো বলে ফেলল।

—আপনার সন্দেহের কোনও কারণ? কাকে সন্দেহ করছেন? বাড়িকে? না ডাক্তারকে?

—জানি না। শুধু এইটুকু জানি পুরুষরা ভয়ানক। স্বামীই হোক, জ্যাঠামশাই-ই হোক।

—আর ও.সি-ই হোক। বাজের মতো গলাটা ওপার থেকে গমগম করে উঠল।

হঠাৎ ওরই মধ্যে শম্পার মনটা কেমন ভাল হয়ে গেল। এই কড়েয়া থানার ও.সি. ভদ্রলোক, বাজের মতো গলা, কিন্তু তার সঙ্গে একটু অপ্রত্যাশিত রসিকতা করলেন। এমন একটা সময়ে যখন একটি নিরুদ্দিষ্ট পেশেন্টের কেস ঝুলছে। তাহলে কি উনি অমৃতা সম্পর্কে আশাজনক কোনও খবর শুনেছেন? অবশ্য, সে ভাবে দেখতে গেলে খুন, জখম, রাহাজানি, দুর্ঘটনা, নিরুদ্দেশ সবই এঁদের কাছে জলভাত। এই সব ঘটনা, এই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজনের কান্নাকাটি বিলাপ সবই এঁদের প্রতি মুহূর্তে দেখতে শুনতে হয়। তবু, তবু, কেমন একজন নির্ভরযোগ্য; মানুষ-মানুষ মানুষ বলে মনে হল বজ্র-কণ্ঠকে। এবং পরের ফোনটা যখন এল সে সেটা এই মেজাজেই ধরল।

—আমি সৌমিত্র বলছি। ফোনটা রেখে দিল সে। আবার বাজল। তক্ষুনি।

—আমি সৌমিত্র বলছি। কী করেছি আমি?

কোনও কথা বলতে পারল না সে।

—'রয়েজ' ছেড়ে দিলে!

সে নীরব।

—'উইলপাওয়ার' জয়েন করছ?

সে নীরব।

—তুমি কী করে জানলে 'উইলপাওয়ার'-এ সৌমিত্র দাসের মতো খারাপ কোনও লোক নেই।

আস্তে খুব আস্তে সে বলল—জানি না।

—তবে?

—ধরেই নিয়েছি।

—কী ধরে নিয়েছ! ওখানেও সৌমিত্র দাস আছে?

—হ্যাঁ।

—তবে?

—ট্যাক্‌ল করতে পারব এবার।

—কী ভাবে?

—সর্বতোভাবে অ্যাভয়েড করে।

—ভাল।

ও পাশে ফোন রেখে দেবার শব্দ হল।

যে মন কড়েয়া থানার ও.সি. ভাল করে দিয়েছিলেন, সে মন সৌমিত্র দাস আবার খারাপ করে দিয়ে গেল।

—তুমি শম্পা না? অমৃতার বন্ধু।

—তুমি দোলা, য়ুনিভার্সিটিতে...।

অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের দেখা হয়ে গেল পার্ক স্ট্রিট রাসেল স্ট্রিটের মোড়ে। শম্পা একা। দোলার সঙ্গে অবশ্য একটি অতি রূপবান যুবক। দোলা বলল—শুধু য়ুনিভার্সিটি কেন? আমি তো কলেজ থেকেই ওর সঙ্গে আছি। তোমার সঙ্গেও। তুমি সায়েন্সে ছিলে বলে বেশি দেখা হত না। অনেকদিন পর তোমায় দেখছি।

—আমি তো চাকরি করি।

—কোথায়?

—আগে 'রয়েজ কমপিউটার'-এ ছিলাম রফি আমেদ কিদোয়াই স্ট্রিটে। এখন এই রাসেল স্ট্রিটে 'উইলপাওয়ার'-এ এসেছি। তুমি?

তখন সবে গোধূলি ফুরোচ্ছে। শম্পা বাড়ি ফিরছে। সব দিন সে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে না অবশ্য। আজ দোলা, দোলাদের সঙ্গে দেখা হবে বলেই বোধ হয়...

শাঁ শাঁ করে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। আলো জ্বলে উঠছে রাস্তার। দোলা বলল—আইসক্রিম পার্লারে যাচ্ছিলাম। এ আমার বন্ধু অমিত।

—রে নয় তো? শম্পা হেসে জিজ্ঞেস করল।

—রে হতে হলে আবার অমিট্-ও হতে হয়। অমিত ছেলেটি বলল। রে আপাতত একজনই এ দেশে—সত্যজিৎ রে। স্ট্রেইট ফ্রম দা সান।

—আপনি অভিনয় করেন?—শম্পার আসলে মনে হল ছেলেটির এমন ফিগার, এমন চেহারা, মুখ চোখ, তার ওপর সত্যজিৎ রে-র কথা বলছে, ও হয়তো!...।

হেসে উঠল ছেলেটি, বলল—প্রতিদিনকার লাইফে যেটুকু অভিনয় বাধ্যতামূলকভাবে করতেই হয় তার বাইরে আর কোনও অভিনয় আমি করি না।

সন্ধেটা ঝপ করে নেমে গেল। দোলা বলল চলো না শম্পা, তুমি তো বাড়িই ফিরছ, আমাদের সঙ্গে চলো না প্লিজ

—টু ইজ কম্প্যানি, থ্রি ইজ ক্রাউড—শম্পা ভেতরে ভেতরে একটু কুঁকড়ে গিয়ে বলল।

অমিত বলল—টু ইজ কনভার্সেশন। থ্রি ইজ ডিসকাশন। প্লেজেন্ট, থ্রিলিং। চলুন। একটু মুখ ঠাণ্ডা করে আসা যাক। যা গরম!

শম্পা আর একটু গাইগুঁই করেছিল, কিন্তু দোলা কিছুতেই ছাড়বে না।

প্রথম সন্ধের এই পার্ক স্ট্রিট শম্পার ভীষণ পরিচিত, ভীষণ প্রিয়। তারা এদিকটায় এলে রাসেল স্ট্রিটেই নিজের গাড়ি পার্ক করত সৌমিত্র। বার্গেন কাউন্টার থেকে রিডাকশন সেল-এ তোয়ালে, বেড শীট কিনত শম্পা। ওই দিকে ব্লু ফক্স, আরও এগিয়ে ওয়ালডর্ফ। এগুলো তাদের নিজস্ব জায়গা। যেন মার্কা মারা আছে।

দোলার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে জানত না সে। থাকতেই পারে। কতদিন পরে দেখা হল তাদের। দোলা আগে খুব দোহারা গোলগাল মাখন মাখন ধরনের মেয়ে ছিল, দেখলেই বোঝা যেত, বড়লোকের আদুরি। গালগুলো শীতকালে লাল হয়ে যেত একটু ফেটে। কাঁধ পর্যন্ত সোজা চুল। দোলার বন্ধুদের একটা খেলাই ছিল দোলার ভুঁড়িতে কাতুকুতু দেওয়া।

এখন কি দোলা একটু লম্বা হয়েছে। আঠারো উনিশের পর মেয়েরা আর লম্বা হয়? সেই গোলগাল ভাবটা ওর আছেই এখনও। কিন্তু এখন আর কেউ ওর ভুঁড়িতে কাতুকুতু দেবে না। মোছা মোছা ভুরু, ছোট চোখ, ঠোঁট দুটো মিলিয়ে একটা গোল মতো কমলার কোয়ার মতো। তাইতেই লাবণ্য ফেটে পড়ছে ওর। লাইল্যাক রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে, অদ্ভুত অ্যাট্রাকটিভ দেখাচ্ছে। শম্পা যেতে যেতে একবার পাশের দোকানের কাছে নিজের ছায়াটা দেখে নিল। লম্বা, কালো, পোড়খাওয়া, সাজগোজ করা একটা মেয়ে। দোলা যেন একটা আকাশের মতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার কোনও রঙ লাগে না। আর শম্পা একটা বাজ পড়া গাছ। গাছটাতে আদিবাসীরা গোবর মাটি আর সিঁদুর লেপে গেছে। আর দোলার সঙ্গের ছেলেটি? যেমনি লম্বা তেমনি অদ্ভুত সুন্দর একটা শ্যামের ওপর লালচে রঙ ধরা ত্বকের জৌলুষ। মুখ চোখ কেমন, তাকিয়ে তাকিয়ে তো আর দেখা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ শম্পা বলল—মা ভাববে দোলা, আমি বরং চলেই যাই।

দোলা হঠাৎ ওর হাতটা ধরে ফেলল, কানের কাছে মুখ এনে বলল—প্লিজ ডোন্ট টেল এনিবডি।

অমিত বলল—কী হল?—সে একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

দোলা বলল—দ্যাখো না শম্পা আসতে চাইছে না।

—তার মানে একজন অ্যাট্রাকটিভ লেডির সঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি?

শম্পা বলল—মনে পড়ে গেল বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি ফেরার আছে। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

—আপনাকে দেখে কিন্তু এত গরমেও ঠিক বাড়ি ফিরতি মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এইমাত্র বিউটি পার্লার থেকে বেরোলেন কোনও বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে...।

শম্পা লজ্জা সামলে বলল—কম্পুটার-এর কাজ তো। সারাক্ষণ এ.সি.-র মধ্যে থাকি। আচ্ছা আসছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে।

ফিরতে ফিরতে শম্পা ভাবল—কোন বুদ্ধিতে সে ওদের সঙ্গে যাবার উদ্যোগ করছিল? কে না জানে প্রেমিক-প্রেমিকারা একা থাকতে চায়?

মুখের কথা কখনও মনের কথা হয় না কি? দোলা মুখে বলছে এসো এসো, মনে মনে বলছে যাও যাও। তারও এমন দিন ছিল। সে আর সৌমিত্র অবশ্য ঠিক রোম্যান্টিক প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল না। সৌমিত্র একটু প্র্যাকটিক্যাল গাদ্যিক ধরনের মানুষ। শম্পার ভেতরে রোমান্টিকতা কি আর ছিল না? কিন্তু সেই রোম্যান্টিকতার চাহিদা মেটেনি বলে তার কোনও নালিশ ছিল না। শক্তিশালী, প্র্যাকটিক্যাল পুরুষ। তারা হয় নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল, মিষ্টি মিষ্টি কথার ঝুড়ি নয়, হিম্যান। হঠাৎ সে চমকে উঠল—কী ভাবছে সে? সৌমিত্র দাস নির্ভরযোগ্য? দায়িত্বশীল? এই তার ধারণা তার চেহারা, কথা-বার্তা থেকে? না শুধু তাই নয়, অফিসের মধ্যে তার কাজ কর্ম থেকেও। কে জানত সেই দায়িত্বশীল মানুষটার মুখ থেকে এমন একটা উড়নচণ্ডে অশালীন প্রস্তাব আসবে?

এখন সমস্ত বাসে ট্রামে প্রচণ্ড ভিড়। শম্পা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে লাগল। ট্রাম গুমটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, লাইন দেবে। তারপর নিজের পালা এলে চড়তে পাবে ট্রামে, যদি না কেউ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে এগিয়ে যায়। তার চেয়ে পাতাল রেলে যাওয়া ভাল। শোভাবাজার স্টপে নামতে হবে সম্ভবত। বেশ খানিকটা ফিরতে হবে তারপর। কিন্তু যাওয়াটা হবে খুব তাড়াতাড়ি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট বড় জোর।

পাতালে নেমে ট্রেনে বসতে পেয়ে গেল শম্পা। হঠাৎ তার মনে হল—ভালবাসা জিনিসটা ঠিক কী? এই যে বাবা মা স্থির করে দিচ্ছেন ছেলে মেয়েরা বিয়ে করছে যেমন অমৃতা করেছিল—তার মধ্যে দেখাই তো যাচ্ছে ভালবাসা ছিল না, একটা পরের বাড়ির মেয়ে তার বাবা-মা নিজের কত অভ্যাস, কত ভালবাসার জিনিস ছেড়ে অন্যের বাড়ি আসছে, তাকে তো সাদর অভ্যর্থনা করতে হবে, ভালবাসা, স্নেহ, আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্ত করতে হবে, অথচ প্রথমেই লোকে চোখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করবে—বউ কেমন হল? মানিয়ে নিচ্ছে তো? আরে বাবা তোমাদেরই তো তার সঙ্গে মানাতে হবে! তার যা কিছু অভ্যাস সে একদিনে পাল্টে ফেলতে পারবে কেন? আর পাল্টাবেই বা কেন? তার জ্যাঠতুতো দাদার বউ এল, জেঠিমা দু-দিন পরই মুখ বেঁকিয়ে বললেন—সকালে বাসিমুখে চা না খেলে তার মাথা ধরে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। আচ্ছা, সে বেচারি কী করবে? এই অভ্যেসটা সে গত দশ কি পনেরো কি তারও বেশি বছর হয়তো করেছে। তামাক তো আর খায় না! বেড-টি অনেকেই খায়। এখন শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন বলে তাকে যদি এক্ষুনি অভ্যেসটা পাল্টাতে বলা হয় সে কি পারবে? এটা অন্যায় নয়? এরা একবাড়ি লোক, নিজেদের পরিবেশ নিজেদের লোকজন নিজেদের অভ্যেসের মধ্যে বাস করবে, আর সে সব ছেড়ে এসে বেমালুম এদের মতো হয়ে যাবে? সাধে কি আর তখনকার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যেতে মরাকান্না কাঁদত? এখনও কাঁদে। যাদের একটু বয়স বেশি, পঁচিশ-ছাব্বিশ তারা তবু একটা লড়াই দিতে পারে, তার চেয়ে ছোটরা স্রেফ হতবুদ্ধি

হয়ে যায়। অসুখী হয়, অশান্তিতে জ্বলে। অমৃতাটার কী হয়েছিল কে জানে? বড্ড চাপা মেয়ে, তেমন কিছু বলত না। কিন্তু আজকে এই দোলার মুখে যে আভা সে দেখেছে, অমৃতার মুখে কোনওদিন তা দেখেনি। অর্থাৎ বিনা ভালবাসায় এক ছাদের নীচে সহবাস কতকগুলি সহানুভূতিহীন মানুষের সঙ্গে, একটি পুরুষের সঙ্গে সহবাস বিশেষ অর্থে। সে এমন শিউরে উঠল, যে পাশের যাত্রিনী তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নড়েচড়ে বসলেন।

সৌমিত্রর সঙ্গে তার যেটা ঘটেছিল, সেটাও কিন্তু ভালবাসা নয়। একটা ব্যবস্থা। অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে এতদিন তাদের দেখা হল না তার জন্য সে বা সৌমিত্র কেউই কি বিন্দুমাত্র বিচলিত? বিচলিত সে অপমানে, সৌমিত্রও নিশ্চয় অপমানিত বোধ করেছে, সে দিনের ফোনালাপে। সে তো বুঝিয়েই দিয়েছে সৌমিত্র দাসকে সে কতটা খারাপ ভাবে। তাদের পরস্পরকে না হলেও চলবে। একটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত হতে যাচ্ছিল, হল না। ভাগ্যিস, অমৃতা তাকে সাবধান করেছিল! অথচ বাইরে থেকে লোকে তো এটাকে ভাব ভালবাসাই বলবে? বিয়েটা হলে সকলেই বলত, ওরা নিজেরা দেখেশুনে করেছে, প্রেমের বিয়ে। প্রেম জিনিসটা কী তা সে বুঝতেই পারছে না। কারও জন্যে তার কোনও টান নেই। অমৃতার স্বামী-ভাগ্যকে ঈর্ষা করে তার খুব শিক্ষা হয়েছে, তার পর থেকেই সে চারপাশের মানুষগুলোকে আরও ভাল করে বুঝতে শুরু করেছে। যেমন সে বুঝতে পেরেছে দোলা ওই অমিত ছেলেটির দারুণ প্রেমে পড়েছে। অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন হয়েছে। তা নয়তো দোলার মতো ধনী বাবা মায়ের আদরের মেয়ে তাঁদের লুকিয়ে ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে আসতে পারে? চুম্বকের মতো একটা টান আছে ওই ছেলেটির। সামলানো যায় না। সে নিজেও যে সে টান অনুভব করেনি তা নয়। যেই ছেলেটি তার দিকে চাইল, তার সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। একেই বোধহয় তাহলে সেক্স অ্যাপীল বলে। ছেলেটির চেহারা চিন্তা করলেই রক্তের মধ্যেটা কেমন রিমঝিম রিমঝিম করতে থাকে। রূপান্ধ। রূপের মোহ। সুন্দরী অভিনেত্রীদের যেমন প্রেমে পড়ে ছেলেরা। হ্রস্ব-দীর্ঘ তাল থাকে না। ধনসম্পত্তি তার পায়ে বিলিয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়!

কিন্তু অমিত ছেলেটি কী রকম? তার ধরন ধারণ আগে হলে সে বলত স্মার্ট। এখন মনে হল ওপর চালাক। বেশ চালাক-চালাক কথা বলবে, মেয়েদের কমপ্লিমেন্ট দেবে, ফ্লার্ট করবে। তার মন বলল এ রকম ছেলে নিরাপদ নয়, কিন্তু প্রেম তো! নিরাপদ খুঁজতে গেলে যদি প্রেমের বিরল অনুভূতি ফসকে যায়। তা হলেই বা জীবনে কী লাভ! খালি ভাল খেয়ে পরে, কর্তব্য করে বেঁচে থাকা? যেমন তার মা বেঁচে আছে এখন? অমৃতার বাবা-মা তো ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। দু পক্ষের বাধা অগ্রাহ্য করে। তা হলে তাঁদের রক্তে এই রিমঝিম লেগেছিল? কয়েক বছরের জন্যও তো লেগেছিল! সারা জীবন দুঃখ-ধান্দা করতে করতে সে-প্রেমের কতটুকু টিকে আছে, এখন? বিশেষত মেয়ের এই ট্রাজেডি ঘটার পরে? কে জানে? ওরা হয়তো পরস্পরের প্রতি এতই অনুরক্ত যে মেয়ের বিয়েটা একটু দেখেশুনে দিতেও গাফিলতি করলেন। বোকামি? না অবহেলা?

শম্পার মনে হল সে কেন বিয়ে করতে চেয়েছিল? আশ্রয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য। আর কিছুর জন্য না। ভাল যদি বাসতেই হয় তো সে একমাত্র মাকে ভালবাসবে। সারা পৃথিবীতে আর কাউকে না। কাউকে না। যেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত সেখানে হয়তো বিয়ে করবে, কিন্তু মাকে চাই। মাকে ছেড়ে সে কোনও আশ্রয় আর খুঁজবে না, খুঁজবে না, খুঁজবে না।

ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটা তাদের শক্তপোক্ত, পুরোনো। কিন্তু কেমন একটা মহিমা আছে, পুরনো কিন্তু ভাল জিনিসের যেমন মহিমা থাকে। সিঁড়ি তিনটে ভেঙে, বেল-এ হাত রাখল সে। মা এসে খুলে দিল। আর কে-ই বা দেবে? এ সময়ে তো কোনও লোকজন থাকে না।

মা বলল—আয় শম্পি, দেরি করলি যে?

—কেন? আজ অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়িই তো ফিরেছি মা।

দালান পার হয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল সে। ঢুকেই স্থাণু হয়ে গেল। সৌমিত্র বসে আছে।

মা একটি কথাতেও তাকে জানতে দেয়নি। বাইরে ওর জেন ডিলুক্সটাও কই দাঁড়িয়ে নেই।

মা বলল—চা খাবি তো করি?

শম্পা কোনও কথা বলতে পারল না। মা একবার তাদের দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সৌমিত্র উঠে দাঁড়াল। ওর রং কালো। সামান্য একটু ভুঁড়ি হয়েছে। মুখটা খুব পুরুষালি, পরিষ্কার কামানো, কিন্তু ঠোঁট দুটো খুব নরম। খানিকটা মেয়েলি। খুব লম্বাও নয়। শম্পা ওর কাঁধ ছাড়িয়ে যায়।

সে বলল—আস্তে আস্তে, খুব নিচু গলায়—আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে এবারের মতো মাফ করে দাও শম্পা, দেবে?

আর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শম্পার রক্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। কীসের টানে যে সে সৌমিত্রর দিকে এগিয়ে গেল স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে জানে না। তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

সৌমিত্র খুব ভয়ে ভয়ে আলতো করে তাকে ধরল, খুব দামি মুক্তো ধরার মতো রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগল চোখের জল। খুব আস্তে বলল—এ ক'দিন কী ঝড় যে বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে তা আমিই জানি। শম্পা, প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্যান্ড মি, এভার। হয়তো নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারি না, বাট আই অলওয়েজ মীন ওয়েল।

শম্পার ভেতরে অনেক কথারা ভিড় করে আসছিল। সৌমিত্র, সৌমিত্র, তুমি কেন বিয়ের আগে দিঘা বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলে? এটা তো আমেরিকা-ইয়োরোপ নয়, এখানকার একজন মেয়ে কী ভাবতে পারে এ কথা শুনলে? আমি ভুল বুঝেছি ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কী বুঝেছিলে? আমাকে কী বুঝে, কী ভেবে তুমি...তুমিও তো কিছু ইয়াংকি নও। তোমারও তো কিছু কিছু ইনহিবিশন থাকার কথা, সামাজিক, ব্যক্তিক। এ তো শুধু আমার ভুল বোঝা নয় সৌমিত্র, সমস্ত সমাজ, সমাজের সমস্ত মানুষ ভুল বুঝত। একবার যদি ভুল করে—লোভে পড়ে দিঘা চলে যেতুম, ফেরবার পর আমি আর এই শম্পা থাকতুম না, সারা পৃথিবীর মূল্যায়নে আমি একটা আলাদা শম্পা হয়ে যেতুম, হয়তো বা তোমার চোখেও...হয়তো কেন নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...।

কিন্তু এত সব কথার একটাও বলতে পারল না সে। চোখ দিয়ে একটার পর একটা ফোঁটা গড়াতে লাগল। পেছনের ফোঁটাটা সামনের ফোঁটার সঙ্গে মিশে একটা অবাধ অনর্গল অশ্রুধারা তৈরি করতে লাগল।

শুধু যখন চূড়ান্ত বিচলিত সৌমিত্র ভয়ে ভয়ে বলল, শম্পা, এত কাঁদছ কেন? তোমাকে হার্ট করে আমি ভীষণ অনুতপ্ত, প্লিজ শম্পা...তখন সে কোনওমতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলতে পারল—'এরকম আর কখনও কোরো না। কখনও না।'

৯

ডঃ রঞ্জন কার্লেকরের সঙ্গে অরিন্দম ঘোষের কথা হচ্ছিল। এখন ভোর ছটা। এই সময়টার কার্লেকর কর্মমুক্ত থাকেন, হঠাৎ কোনও কঠিন ডেলিভারি কেস না এলে। এই সময়টায় তিনি তাঁর ছোট্ট বাগানে কাজ করেন। খুরপি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে দেওয়া, সার টার দেওয়া, জল দেওয়া এগুলো সব তিনি নিজেই করেন। একজন মালি আছে, সে দু সপ্তাহ পরপর এসে ঘাস ছেঁটে দিয়ে, অন্য কিছু করবার থাকলে করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেটা পাক্ষিক ব্যবস্থা। দৈনিকেরটা তিনি নিজেই করেন, যদি কোনও দিন পেশার কারণে করতে না পারেন তাঁর অস্বস্তি হয়। গাছগুলোও তাদের অভ্যস্ত পরিচর্যা না পেয়ে বোধহয় মনমরা থাকে। কিন্তু আর কারও থেকে কিছু আশা করে না।

কার্লেকরের স্ত্রী রম্ভা কার্লেকর নটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। উঠে হাই-টাই তুলে আড়মোড়া-টোড়া ভেঙে তিনি বেড-টি খান। তারপর সংসারের কাজে লাগেন। রম্ভা ছিলেন রঞ্জনের ক্লাস ফেলো। তুমুল প্রেম করে দুজনের বিয়ে হয়েছে। রম্ভা উত্তর প্রদেশীয়, কিন্তু এমন ভাবে রঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন যে কোনও তফাত বোঝা যেত না। রঞ্জনের পদবি কার্লেকর হলেও এঁরা আর মারাঠি নেই। বাপ-ঠাকুর্দা—তাঁর ঠাকুর্দা এই রকম বহু পুরুষ বাংলায় বাস করা মানুষদের মতো তাঁরাও বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। রম্ভাকে কিন্তু প্রেমিকের পরিবারের বাঙালিয়ানা শিখতে হয়েছিল। রঞ্জনের কেরিয়ার ডিগ্রির অর্থে যখন তুঙ্গে, অর্থাৎ ইংল্যান্ডে এম.আর.সি.ও.জি করেছেন তখন অন্য কোনও তরুণীর সঙ্গে রঞ্জন জড়িয়ে পড়ছেন বুঝে রম্ভা নিজের প্র্যাকটিস জলাঞ্জলি দিয়ে, লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি যতটা উতলা হয়েছিলেন, ততটা কিছু হয়নি। কিন্তু সেই থেকে রঞ্জনকে চোখের আড়াল না করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। প্র্যাকটিস করেন না। উপভোগ করেন জীবন এমনি অলসভাবে, ছেলেটি দুন স্কুলে পড়ে, মেয়েটি দার্জিলিং লোরেটোয়। রঞ্জন বহুবার বলেছেন তাঁর নার্সিংহোমে যোগ দিতে, কিন্তু রম্ভা ওসব দিকে আর যাননি। সুন্দরী রোগিণী দেখলেই তাঁর বুক কাঁপত। এখন একটা বিউটি পার্লার করেছেন। পার্লারের সঙ্গে আস্তে আস্তে যোগ করে চলেছেন হেলথ ক্লাব, কসমেটিক সার্জারি ইউনিট, কিন্তু দুপুরবেলা অর্থাৎ বারোটা থেকে চারটে কি বড় জোর পাঁচটার পর তিনি আবার বাড়িতে। সল্টলেকের এই বাড়ির অঙ্গসজ্জা তিনি কয়েকমাস পরপরই পাল্টে দেন। কেউ যদি গৃহসজ্জা নিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে তাও তিনি সানন্দে দিয়ে থাকেন, সাহায্য করেন। কিন্তু সে অর্থে তিনি কোনও পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। তাঁর মন সব সময়ে সতর্ক হয়ে থাকে রঞ্জনকে নিয়ে। তার যত্ন হচ্ছে কিনা, সে ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া-ব্যায়াম করছে কিনা, তার পোশাক-আশাক, তার গাড়ি, তার শোফার, তার নার্সিংহোমের স্টাফ, রাত্তিরে নিতান্ত দরকার না পড়লে তার বেরোনো বা না বেরোনো—এই সবেরই তিনি খোঁজ রাখেন। এক হিসেবে তিনিই রঞ্জনের জগতের মালকিন। রঞ্জন তাঁকে জানতে না দিয়ে তাঁর কিছু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা করিয়েছেন। ছেলে-মেয়েকে দূর স্কুলে পাঠাবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু রম্ভাকে তাঁর বেছে নেওয়া জীবন যাত্রা ও সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো যায়নি।

ভোরবেলার বাগান। খুব সুন্দর ভোরালো হাওয়া দেয়। হাওয়ার মধ্যে মিশে থাকে স্বাস্থ্যের গন্ধ, গাছপালার এবং মানুষের। এ দিকটাও তো একটু খোলামেলা, অনেক নিয়মিত পদচর্চাকারী এই সময়ে তাঁর বাগানের পাশ দিয়ে চলে যান। হয় যাচ্ছেন, নয় ফিরছেন। তাঁদের সকাল আরও অনেক আগে হয়। কিন্তু ডঃ কার্লেকর বহু চেষ্টা করেও এর আগে বাগানে নামতে পারেন না। তাঁর অনেক রাত পর্যন্ত কাজে যায়, অনেক দিনই রাতে নার্সিংহোম থেকে কল আসে, নার্সিংহোমের কাজ সেরে এসে তিনি দেখেন উৎকণ্ঠিত রম্ভা ঘরবার করছে। রোগীর জন্যে, স্ত্রীর জন্যে এই ডবল উৎকণ্ঠায় তাঁকে সিডেটিভ খেতে হয়। এর আগে তিনি উঠতে পারেন না। তবে এই সময়টুকু তিনি একেবারে পরিপূর্ণ উপভোগ করেন। মনটাকে করে দেন সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য। চোখ থাকে গাছের মূলে, হাতে থাকে আদিম লোহার স্পর্শ আর চিরকালীন মাটির ছোঁয়া। শরীরের ত্বকে লাগে অলৌকিক ভোরের হাওয়া।

—ডঃ কার্লেকর!

প্রথমে শুনতে পেলেন না উনি। এত নিবিষ্ট ছিলেন।

—ডঃ কার্লেকর!

এবার তিনি মুখ তুলে আর একটি মুখ দেখলেন। বাগানের জাফরি কাটা গেটের ওধারে। বেশ চমৎকার চেহারার একটি যুবক। মানে, এমন চেহারার যে তাকে সমীহ না করে পারা যায় না। সে যুবকটি ডেকে সাড়া পেতেই অভ্যস্ত।

—হ্যাঁ বলুন।—কোনও রোগিণীর বিবরণ আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি কোনমতেই

কোথাও যান না বলে হয়তো ছেলেটি প্রিয়জনের জন্য তাঁর কাছে ছুটে এসেছে।

কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ও অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করার আগেই ছেলেটি নমস্কার করে বলল—আমি অরিন্দম ঘোষ, সিঙ্গাপুর থেকে আসছি।

আশ্চর্য! ছেলেটি এমন করে বলল যেন সিঙ্গাপুরটা এই কয়েক ব্লক দূরে!

রঞ্জন কার্লেকর ততক্ষণে গেট খুলে দিয়েছে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ছেলেটিও বলেছে...অশেষ ধন্যবাদ।

—আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে ডক্টর।

এমন কথা কার্লেকর কখনও শোনেননি। বিয়ের পরের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য অবশ্য লোককে আসতেই হয়, কিন্তু তিনি ঘটকালি তো কখনও করেননি।

—ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফিরে যেতে হবে আমাকে। এর মধ্যে অন্তত রেজিস্ট্রেশনটা করে নিতে চাইছি। কিন্তু আমার হবু পত্নী আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না, যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন।

হতভম্ব হয়ে ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলেন ডঃ কার্লেকর।

—মেয়েটির বন্ধু ওই অমৃতা নামের মেয়েটি, সে নিখোঁজ হয়েছে। যতদিন তার খোঁজ না পাওয়া যাচ্ছে...

—সে ক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে—এতক্ষণে ডাক্তার বলতে পারলেন।

—আর একটা কমপ্লিকেশনও আছে। অমৃতার স্বামীর নাম অরিসূদন, আমার নাম অরিন্দম, দুটোই অরি দিয়ে শুরু। সেইজন্য অরি নামের কলঙ্ক ঘোচাতে না পারলে মেয়েটি আমায় বিয়ে করতে চাইছে না।

—তা হলে বোধহয় আপনার এ বিয়েটা হচ্ছে না—বলেই ডঃ কার্লেকর আচমকা চুপ করে গেলেন।

অরিন্দম ঘোষ খুব আন্তরিক চোখে চেয়ে বলল—ওই লোকটাই কালপ্রিট, নয়? আমরা ঠিকই বুঝেছি।

—আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

—কিন্তু কেন ডঃ কার্লেকর? আমি তো পুলিশের কাছ থেকে খুব রিলায়েব্‌ল সোর্স থেকে জেনে এসেছি যে আপনি অমৃতার হোয়্যারঅ্যাবাউটস সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ওদের দিয়েছেন। অমৃতা লিখিতভাবে তার স্বেচ্ছায় চলে যাবার কথা তাদের জানিয়েছে। মাঝখানের মিস্ট্রিটাই খালি সল্‌ভ করতে পারছি না। কেনই বা অমৃতা নার্সিংহোমে গেল, আর অরিসূদন যদি নিজেই কোনও অপরাধ করে থাকে তাহলে কেন আপনাকে মারধর করল, আপনার অফিস ভাঙচুর করল! এফ. আই. আর. করল!

—হাতের শিকার ফসকে গেলে রাগে মারধর করতে পারে না?—ডঃ কার্লেকর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন।

—শিকার? অরিসূদন অমৃতাকে খুন করতে চেয়েছিল?

—ষোলো সপ্তাহের প্রেগন্যান্সির পর একটা চূড়ান্ত অ্যানিমিক মেয়েকে এম. টি. পি. করতে আনলে তাকে খুন করার মতলব ছাড়া আর কী বলা যায়?

চোখ বড় বড় করে অরিন্দম বলল—আই সি, আই সি। একটু পরে বলল—তা হলে আপনি ওকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখেছেন।

—আমি কাউকে রাখিনি। নিরাপদ জায়গার চয়েসটা পেশেন্টের। আমি শুধু সাহায্য করেছি।

—কোথায় গেছে একটু যদি বলেন।

—কী করে জানব আপনি তার বন্ধু না শত্রু? কী করে জানব আপনি আর এক অরিসূদন নন!

—বাঃ সেদিন অতজন ওর বন্ধুর সঙ্গে আপনার কাছে গেলাম।

—বন্ধুদের হয়তো বুঝিয়েছেন আপনিও বন্ধু, আসলে...

—আমি তো সিঙ্গাপুর থাকি। জাস্ট বিয়ে পাকা করতে এসে এই ঝামেলায় পড়ে গেছি। আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না। অমৃতাকে চিনিই না।

—আপনি তো অদ্ভুত লোক।

—সেটা অবশ্য ঠিক, অরিন্দম বলল—কোনও জিনিসের শেষ না দেখে আমি ছাড়ি না। তা ছাড়া লাবণির যদি সত্যি অরি নামে ঘেন্না এসে যায়, সত্যিই যদি তার অমৃতার নিরুদ্দেশের কিনারা না হলে বিয়ে করতে ভয় হয় বা অনিচ্ছা হয়, সেটা তো স্বাভাবিক মানবিক রি-অ্যাক্শন! আই অ্যাপ্রিশিয়েট হার কনসার্ন। মেয়েটা যে মানুষ সেটা প্রমাণ করেছে আমার কাছে... আজকাল এইগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে দেখা যায় না বড় একটা।

—দেখুন যত কথাই আপনি বলুন, পেশেন্টের ঠিকানা আমি আপনাকে বলছি না। ওরা কেস করেছে, পেশেন্টকে আমি অসাবধানে মেরে ফেলে ভয়ে কোথাও পাচার করে দিয়েছি। ঠিক সময়ে কোর্টে হাজির করে সব ফাঁস করে দেব। পেশেন্টের ঠিকানা যতই লোক জানাজানি হয়ে যাবে, ওরা ঠিক খবর পাবে, পিছিয়ে যাবে।

—সেক্ষেত্রে আপনি কেস করবেন, অমৃতা কেস করবে। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

—আপনি কীভাবে সাহায্য করবেন, আপনি তো সিঙ্গাপুরে...

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখানেও ওদের ব্রাঞ্চ আছে। তেমন হলে চাকরি ছেড়ে দেব। তাই বলে অরিসূদন গোস্বামীকে ছাড়ব না। সে আমার নামে কালি ছিটিয়েছে। শুনুন ডক্টর, আমাকে ওরা কেউ চেনে না, ফলো-টলো করবে না। আমি অমৃতার কাছে যাব, প্লিজ ঠিকানাটা বলুন, আর ওকে আমার পরিচয় দিয়ে একটা ফোন করে দিন।

১০

ভোর থেকে সকাল হচ্ছে। আলোটা অস্ফুট, আচ্ছন্ন ছিল, এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিবানী দত্তর কাজের মেয়ে দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলল—মা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

—বলে দে আমার ফিনাইল লাগবে না,—একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

—জ্যাম আছে? জ্যাম—মেয়েটি বলল।

—জ্যামও লাগবে না—আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

—আপনাদের বাড়িতে বুঝি বসবার ঘর নেই?—ভদ্রলোক বললেন।

—কেন থাকবে না? অচেনা অজানা লোককে...বলতে বলতে মেয়েটি থেমে গেল।

শিবানী সবে চান করে একটা কালো নকশা পাড় শাড়ি পরেছেন। তাঁর কাঁচাপাকা ভিজে চুল গিঁট দিয়ে পিঠে ফেলা। হাতে একটা ঝোলানো পাত্র।

—তাড়াতাড়ি দুধটা নিয়ে আয় কমলি। পাত্রটা নিয়ে কমলি বেরিয়ে গেল, তিনি অরিন্দমের দিকে চেয়ে বললেন—এত সকালে? আপনাকে তো ঠিক?

—কেন? ডঃ কার্লেকর ফোন করেননি?

—ও, এক্ষুনি আসবেন আমি ভাবিনি। আপনাকে দোতলায় আসতে হবে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শিবানী উঠোন পেরিয়ে ঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, আসুন, একটা অভিজ্ঞতা বটে।

—কার?

—ওর তো বটেই। আমারও, আমাদেরও। শুনুন, ও কিন্তু একটা ভীষণ ট্রমার মধ্যে দিয়ে গেছে। শরীরটাও খুব খারাপ। আপনাকে সাবধানে কথা বলতে হবে।

অমৃতা যে কেন ডঃ কার্লেকরকে জয়িতাদির নাম ঠিকানা বলেছিল সে জানে না। এইরকম চূড়ান্ত সময়গুলোতে বোধহয় মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, এইসবের পরীক্ষা হয়ে যায়। কিন্তু সল্টলেকের দিকে খানিকটা এগোতেই তার মনে হল—এ সে কী করছে। ক্লাসের বাইরে জয়িতাদির সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ। এইরকম বিপন্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তো তাঁকে বিব্রত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তখন সে ডক্টর কার্লেকরকে সম্পদদের বাড়িতে ডোভার লেনে নিয়ে যেতে বলে।

ডঃ কার্লেকর বলেছিলেন—মন ঠিক করো অমৃতা। ইনি নির্ভরযোগ্য তো! অমৃতার মনে পড়ল তারা রমণী চ্যাটার্জিতে আসার পর কেমন করে দুধের বুথে শিবানী মাসির সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। বিধবা, একটি ছেলে নিয়ে একা থাকেন। তারপর সম্পদের সঙ্গে কী ভাব। দুজনকে আলাদা করা যেত না। সম্পদের মা হয়তো অমৃতা সম্পর্কে কোনও আশাও মনে পোষণ করে থাকতেন। কিন্তু সম্পদ কানপুরে চলে যাওয়ার পরই যোগাযোগটা কমে যেতে থাকে। একদিন সম্পদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল অমৃতা।

প্রিয় অমৃতা,

দারুণ আছি। এনজয়িং লাইফ। খুব চনমনে একটা জীবন। তোরা সেই ম্যাদামারা ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ে এই দারুণ ক্যামপাস লাইফটা মিস করলি। আমাদের এখানে মেয়েরাও পড়ে জানিস নিশ্চয়। একটা সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে নাম তটিনী আয়েঙ্গার, খুব আমার পেছনে ঘুরছে। কী করি বল তো। ঝুলে পড়ব? সাউথ ইন্ডিয়ান মানে কিন্তু সেই রাজীব গান্ধীর খুনী ধানু মেয়েটার মতো মনে করিসনি। তটিনি রীতিমতো চার্মিং। আমি ওর অ্যাটেনশন উপভোগ করি। কিন্তু এখনও প্রেম-প্রেম ভাব হয়নি। অন গড। পরামর্শ দিস।

ইতি সম্পদ।

সম্পদের সম্পর্কে ওভাবে কোনওদিনই ভাবেনি অমৃতা। কিন্তু শিবানী মাসির আশার কথা সে বুঝতে পারত। যৌবনে বিধবা, একটিমাত্র ছেলে, এমন পুত্রবধূ চান যাকে চেনেন, জানেন। সহজেই ভালবাসার বিনিময় করতে পারবেন। কিন্তু সম্পদ তো প্রথমত তার একবয়সী বলেই তাকে ভাইয়ের মতো দেখতে অভ্যস্ত ছিল সে, তারওপর এই চিঠিই বলে দিল সম্পদেরও তার প্রতি সেরকম কোনও মনোভাব নেই। তবু শিবানী মাসির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। মাসি ভীষণ শক্ত মানুষ। মনের জোর সাঙ্ঘাতিক। সেইজন্যে ভীষণ খিদের মুখে সে যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে শিবানীমাসির কাছে পৌঁছে গেছিল।

কথায় কথায় মাসিও তার অনেক কথা জেনে গিয়েছিলেন। মা শুনলে হয়তো ভয়ে কেঁদে কেটে অজ্ঞান হয়ে যেতেন, মাসির এক চোখে আগুন আর এক চোখে জল। মাসি বলেছিলেন—অমি, তুই তো এরকম বোকা ভালমানুষ কোনওদিন ছিলি না! গোড়ার থেকে প্রতিবাদ করিসনি কেন, তোর বরকে বলবি তো, পড়াশোনা চালিয়ে এত কাজ আমি করতে পারছি না, বলবি তো তোর খাওয়া-দাওয়াও ঠিক মতো হচ্ছে না!

—মাসি পারিনি, আমার একটা আত্মসম্মানবোধ আছে, হয়তো এটাই ইগো। আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। আর গোড়ার থেকেই ওঁরা এমন বলতেন—ঘটির মেয়ে, দেখো এক ঘটি জল গড়িয়ে খায় কি না।

—এখনও বাঙাল-ঘটি! পঞ্চাশ বছর পরেও? তা তোর বরকে তোর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধের কথা বলেছিলি?

—মাসি, তুমি পারতে?

—আমাদের জেনারেশন আর তোদের জেনারেশন?

—এটা তোমাদের ভুল ধারণা। খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে বেশিরভাগ মেয়েই এখনও লাজুক।

—লাজুক না কি অভিমানী?

—যা বলো। সকালে যাই হোক, রাত্রে তো একই সঙ্গে খেতে বসি। সবাইকার পাতে যা থাকে, আমার পাতে তার অনেকগুলোই থাকে না। ও দেখতে পায় না?

—আচ্ছা, তুই এখন ভাল করে খা। অনেক পুরুষই এগুলো জানে না। ওদের মাথায় আসে না।

—তা হলে আমরা যে অত যত্ন করে ওদের খাবার বেড়ে দিই, পছন্দসই রাঁধবার চেষ্টা করি এগুলো...অল দিজ আর টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড?

—ঠিক ওই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড, বউ কি খেল না খেল নজর করলে পুরুষের পৌরুষ চলে যেত।

—যে-ত। এখনও কি যায়?

—অভ্যেস যে মা। বহু বহু যুগের অভ্যেস, মাথার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

—আমি মানতে পারছি না মাসি।

—বেশ তো মানতে না পেরে কী-ই বা করবি। কী করতে পেরেছিস বল? কর না কিছু? বাঁচি তো তা হলে।

মাসি থাকেন একদম একা। ডোভার লেনের ওপর দোতলা বাড়ি। নীচে দুটো ঘর আর রান্নাঘর। ওপরেও তিনটে? একটু বারান্দা। পেছনের দিকে। আর ছাদ। মাসির কাছে সে নিরাপদ আশ্রয় পাবেই। ডঃ কার্লেকরকে নিয়ে সেই শেষ রাতে যখন সে মাসির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিতায়, রহস্যে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল, 'মাসি!' সে গলা চিরে ডেকেছিল। 'কে রে?' উনি বললেন, 'অমি?—ওমা তুই এখন? কোনও বিপদ-আপদ? উনি কে? জামাই না কি?'

—আমি ডাক্তার। একটু ভেতরে ঢুকতে দিন, আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

সব খুলে বলে, নিরাপত্তা আর গোপনতার ব্যবস্থা ষোলো আনা করে উনি চলে গেলে প্রথম ফোনটা সে মা-বাবাকেই করেছিল। বলেই দিয়েছিল যেতে পারবে না, বেশিবার ফোন করতেও পারবে না। ওঁরা যেন না ভাবেন।

অবশ্য অনেক পরে দ্বিতীয় ফোনটা অনেক ভাবনা-চিন্তার পর করে ডঃ জয়িতা বাগচিকে।

—কে বললে? অমৃতা? তুমি না নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে?

সব শুনে বললেন—ইস্ লোকটাকে মারতে পারলে না, টেনে একটা চড়? হ্যাঁ, অবশ্যই সাহায্য করব। পরীক্ষা তুমি দেবেই। এ বছরেই। হ্যাঁ সিক বেড-এ হলেও।

আত্মগত সে বলে—ব্যস এইটুকুই চাই জয়তীদি। আবার কী? আর কিছু আপনাকে করতে হবে না।

একমাত্র উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছাদটাতে বেড়াতে পারে অমৃতা। দূরদর্শনে নিরুদ্দিষ্ট বলে তার ছবি দেখানো হয়েছে। এ পাড়ার অনেকে তাকে চেনেও। শিবানীর সঙ্গে তারাও আলোচনা করে মাঝে মাঝে। অনেক রকম শুনি বটে, কাগজেও পড়ি। কিন্তু সাক্ষাৎ আমাদের পাড়ার মেয়ে। ছোট্ট থেকে যাকে দেখছি তার এমন হতে পারে? ডাক্তারটাই বোধহয়...

তখন রুক্ষস্বরে শিবানী বলেন—তোমরা কোনও কিছু তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করো না কেন বলো তো? ডাক্তারের স্বার্থ কী?

—ওর শ্বশুরবাড়িরই বা কী স্বার্থ?

—আমি জানি না। কিন্তু বধূহত্যা-টত্যা কি শোননি? সেগুলো তো শ্বশুরবাড়িই করে? স্বামী, দেওর, শাশুড়ি, শ্বশুর...

—হত্যাই যদি করবে তো নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গেল কেন?

—দেখো পুলিশে কী বলে?

ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সে থার্ড পেপার মুখস্থ করছিল। নিজেরই লেখা, তবু মুখস্থ করতে হয়। এখন তার শরীরে বেশ ভালমতো গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার ফর্সা রঙে এখন লালচে আভা। শরীর একটু ভারী হয়েছে। হনহন করে হাঁটতে তার একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু অন্যসব দিক দিয়েই শরীর সুস্থ। অন্যদের যা-যা হয় বলে সে শুনেছে তার কিছুই তার হয় না। বমি নয়, ব্যথা নয়, খাদ্যে অরুচি নয়। খালি অড়হর বা মটর ডালের গন্ধটা সে সহ্য করতে পারে না। আর কোকিল ডাকলেই সে কানে আঙুল দেয়। অর্থাৎ একটি শব্দ, একটি গন্ধ। বাকি পৃথিবীর রূপরস তার ওপর অত্যাচার করে না মোটেই।

শিবানীমাসি ছাদেই উঠে এলেন অরিন্দম ঘোষকে নিয়ে। সে থতমত খেয়ে গেল।

পাঁচ মাসের গর্ভিণী লম্বা দোহারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। এ মেয়ের চোখমুখ চলাফেরা সবই নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিচ্ছে এ একজন ব্যক্তি, নরম, মধুর। কিন্তু প্রয়োজনে রুক্ষ হতে পারে। সে শুনেছিল গর্ভসঞ্চারে মেয়েরা সুন্দর হয়। বিশ্বাস করেনি, কেন না দেখেনি কখনও। তার থেকে সাত বছরের ছোট বোন যখন মায়ের গর্ভে তখন পেট উঁচু, চোখ বসা মাকে দেখে তার কেমন গা ঘিন-ঘিন করত। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেত অবশ্য। গর্ভ, অবাঞ্ছিত গর্ভ তার ওপরে, এ মেয়েটিকে কী যে শ্রী কী যে মহিমা দিয়েছে! এ যেন সেই ইম্যাকুলেট কনসেপশনের মেরি। ত্বক কী মসৃণ, চুল যেন ঝলমল করছে। মুখেচোখে একটা নরম আলো, খুব মনোযোগে এমনটা হয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যে কাজটা এখন করছে, পড়া, সেটা ছাড়া আর সমস্ত কিছু, গোটা বিশ্বটাই ও ভুলে গেছে। ট্রমা? ও বোধহয় ওর অনতিঅতীত জীবন এবং জীবনসংশয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

—নমস্কার, আমি আপনার বন্ধুদের পক্ষ থেকে আপনাকে দেখতে এসেছি। ডঃ কার্লেকর অনুমতি দিয়েছেন।

—বন্ধু? কে বন্ধু? অমৃতা অবাক হয়ে বলল...

—ওরা মানে দোলা, তিলক, নিলয়, লাবণি—এরা সবাই আপনাকে খুব খোঁজাখুঁজি করছে। ভী-ষণ মনখারাপ ওদের, ভয়ও।

—ও! অমৃতার চোখ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটু পরে বলল—আপনি কে? গোয়েন্দা? সত্যান্বেষী?

—এগজ্যাক্টলি। ওই শেষেরটা যেটা বললেন।

—ওরা কি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে?

—অনেকটা তাই। মানে আমি নিজেও আগ্রহী। আপনি যদি বন্ধুদের বা মা-বাবাকে কোনও চিঠি দিতে চান, আমি পৌঁছে দেব।

—আমার মা-বাবাকে আপনি চেনেন?

—চিনে নিতে হয় একজন সত্যান্বেষীকে।

—ওঁদের কাছ থেকেই কি আমার ঠিকানা পেলেন?

—না, না। ওঁরা আপনার বিনা অনুমতিতে ঠিকানা দেবেনই না। কিন্তু ওঁদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে জানিয়ে দেয় আপনি বেঁচে আছেন, ভাল আছেন। ডঃ কার্লেকরই আপনার ঠিকানা দিয়েছেন?

—তা এখন? এখন আপনি কী করবেন? ওদের সব বলে দেবেন?

—নাঃ, সেটা করা যাবে না। ডাক্তারের বারণ আছে, আমি শুধু ওদের একটু নিশ্চিন্ত করে দেব। কেসটির জন্য অপেক্ষা করতে বলে দেব। আর...

—আর?

—আর সিঙ্গাপুরে ফিরে যাব।

—রিপোর্ট করবেন?

—কাকে?

—আপনার বস্‌কে?

—হ্যাঁ সে তো করতেই হবে, কিন্তু অমৃতা গোস্বামীর নিরুদ্দেশের বিষয়ে না। আমার কোনও ডিটেক্টিভ এজেন্সি নেই। আমি তো একটা এঞ্জিনিয়ার। সিঙ্গাপুরে কাজ করি। ছুটিতে এসেছিলাম। একটু সত্যান্বেষণ করে গেলাম।

—আপনার নাম?

—নাম জেনে আপনার কী লাভ? ঘোষ আমি ঘোষ একজন।

বলতে বলতে অরিন্দম তাড়াতাড়ি পেছন ফিরল। যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

১১

আকাশের রং যে এমন মন-কেমনিয়া হতে পারে, বাতাসের স্পর্শ যে এমন শিহরন-জাগানিয়া হতে পারে, গাছের পাতাদের নড়ায়-চড়ায় যে এমন আসঙ্গ কামনা ভেতর থেকে উঠে আসতে পারে, খাদ্যের স্বাদ যে এতটা চমৎকার হতে পারে, সারা দিনরাত যে এমন প্রতীক্ষাময় হতে পারে, পৃথিবীর সব মানুষ যে অমন মোছা-মোছা জলরঙের ছবি হয়ে যেতে পারে, মা-বাবা যে অমন অচেনা অন্যলোক হয়ে যেতে পারে, দোলা কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

সে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনছে। আসলে দুটো বুনছে। একটা প্রকৃত বোনা, আর একটা ক্যামোফ্লাজ। দেখাচ্ছে বাপির জন্য বুনছে একটা রাস্ট কালারের পুলোভার, কিন্তু আসল বুনছে দুটো। যাতে কেউ বুঝতে না পারে। সবার সামনেই নিশ্চিন্ত মনে একটাতে জোড়াসাপ বুনতে থাকে সে। মায়ের অবশ্য নজর খুব। 'কী রে? কালকে আর্ম-পিট অবধি এসে গিয়েছিলি না? আবার ভুল করেছিস বুঝি?'

—হ্যাঁ মা, দোলা নির্বিচারে মিথ্যা বলে। আর্ম-পিট অবধি যেটা হয়ে গেছে সেটা ওর, এটা বাপির। এখন বর্ষা পড়ে না গেলেও মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সোয়েটার দুটো সে শুরু করেছে ঘোর গ্রীষ্মে। যখন পশম হাতে করলেই মনে হয় একবার বরফজলে হাতটা ডুবিয়ে আসি। এখন অবশ্য বৃষ্টি নামছে। 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে যখন বৃষ্টি নামল।' তার সারা দেহ জুড়ে বৃষ্টি। কামনার স্বেদ-এর সঙ্গে গ্রীষ্মের ঘাম, বর্ষার রাঙা জল বাইরে থেকে তফাত করা যায় না। কিন্তু এ সেই কামনার স্বেদ, কামনার রোমাঞ্চ যার কথা জয়দেবরা বলে গিয়েছিলেন। পদকর্তারা বলে গিয়েছিলেন। এ-কি মানুষের জন্য? না দেবতার জন্য? বোঝা দায়। দোলা আগে জানত না দেবতা হয়, বিশ্বাসই করত না। কিন্তু এখন জানে, হয়, একটা মানুষের দেবতা। সব মানুষের অবশ্য হয় না। হাতে-গোনা যে কয়েকজনের হয় তাদের মধ্যে দোলন একজন। কখনও সে মেট্রোর সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে, কখনও নন্দন চত্বরে ফোয়ারার পাশ থেকে ঈষৎ সিক্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। কখনও বা সিনেমা হলের অন্ধকারের অন্তরালে গাঢ় আকার নেয়, কখনও ভিক্টোরিয়া কি মিউজিয়ামের থামের আড়ালে একটা অদ্ভুত অভ্যন্তরীণ নেশা লাগানো স্বাদ-গন্ধঅলা চুম্বন হয়ে নেমে আসে। দোলার অন্তর্বাস ভিজে যায়। এই ভেজায় কী অস্বস্তি। কিন্তু কী অপার্থিব আনন্দ!

দোলার চেহারার মধ্যে আগে একটা বালিকা-বালিকা ভাব ছিল। এমন বালিকা, বড়রা দেখলেই যাঁদের গালে টুস্কি মেরে বলে কী রে কোন ক্লাস হল? কিন্তু আসলে বলতে চায় কী রে কত বড় হলি? কিন্তু সেই বালিকা-ভাবটা মুছে না গেলেও দোলার মধ্যে এমন একটা তরুণীত্ব, সময়ে সময়ে

যুবতীত্ব এসে গেছে, যে অনেক মানুষের কামনার ধন। কী যে একটা অধরা লাবণি তার অঙ্গে অঙ্গে বয়ে যায়। মেয়েবন্ধুরা বলে—যত দিন যাচ্ছে কী সুন্দর যে হচ্ছিস দোলা! কী মাখিস রে?

—কী আবার মাখব? চিরকাল যা মাখি। মনে মনে অবশ্য সে জানে মেখেছে, সে প্রেম মেখেছে।

ছেলেবন্ধুদের অনেকে বলে—দোলা তোকে কি ফ্যানটাসটিক লাগছে রে, কোথায় লাগে প্রীতি জিনটা, কোথায় লাগে আমিশা পটেল-ফটেল, রানি মুখার্জি-টুখার্জি!

ছবি তোলো, ভাল অ্যাঙ্গল থেকে, যত্ন করে কমপোজ করে—এ লাবণ্যের ছবি কিন্তু উঠবে না। এ এক অলৌকিক অশরীরী লাবণ্য। তিশান তো একদিন বলেই ফেলল—কিরে দোলা আমার সঙ্গে একদিন ডেট করবি নাকি? আইসক্রিমের বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না কিন্তু।

দোলা বলল—দুটো আইসক্রিম তুই একাই খেগে যা, একটা আমার কথা ভেবে ভেবে খাবি।

দোলার দিদি ঝুলন বলে—মা, দোলার সেই বয়সটা এসেছে, যে বয়সে বিয়ে দিতে হয়।

মা বলে—সাত বুড়ির এক বুড়ি হয়েছিস তুই।

লজ্জা পেয়ে ঝুলন বলে—সত্যি মা, খেয়াল কোরো।

—কেন, এত সুন্দর সময়টা ও যদি মা-বাবার আশ্রয়ে থেকে জীবনটা সত্যিকার উপভোগ করে তাতে তোর আপত্তি কেন? কীরে দোল বল কিছু?

দোলা লজ্জা পেয়ে বলে—তাই তো!

ঝুলন বলে—আমাদের হাতে খুব ভাল একটা পাত্র আছে মা, যেমন দেখতে ভাল, তেমনই ভাল ছেলে, নেহাৎ অল্পবয়স তাই হয়তো পার্থর মতো অতটা এস্ট্যাবলিশড না। কিন্তু হবে, আস্তে আস্তে হবে।

দোলার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে—এই বুঝি, এই বুঝি—তার নামটা করল দিদি।

—কেমন ছেলে, শুনি?

—সুপ্রতিম রায়চৌধুরী ওদের কলিগ, জুনিয়র এগজিকিউটিভ হয়ে যোগ দিয়েছে। আমার তো ভীষণ পছন্দ।

দোলা বলে ওঠে, তোর পছন্দ যদি তো তুইই বিয়ে করগে যা না। ভীষণ রাগ হয়ে যায় তার। অমন একটা জ্বলজ্বলে মানুষ রিলিফ ম্যাপের মতো বহুলোকের চ্যাপ্টা পশ্চাৎপটে উঁচু-উঁচু হয়ে রয়েছে, অথচ ওদের চোখে পড়ে না? সে অবশ্য এখনও জানে না পার্থদার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ঠিক কী! পার্থদার ও দূরসম্পর্কের তুতো ভাইয়ের কাজিন না কী? ঠিক আছে তা না-ই হল, তাহলে পার্থদাদের অফিসের ডিনার-পার্টিতে এসেছিল কেন? এত কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে, এ কথাটা কখনও জিজ্ঞেস করেনি। 'পার্থদা আপনার কে হন?' এরকম একটা প্রশ্ন করে জবাব শুনেছিল 'ও পার্থদার কেউ বুঝি হতেই হবে? নইলে আমার সঙ্গে মিশবে না?' দোলাকে অপ্রস্তুত দেখে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কটা ব্যাখ্যাও করে দিয়েছিল। পার্থদার অফিসের একজনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক। খুড়তুত শালা। বাব্বাঃ এইসব খুড়তুতো জ্যাঠতুতো পিসতুতো মাসতুতো বড্ড গুলিয়ে যায় দোলার। ওর ভাবখানা হল : আমি অমিতাভ। আমার নামের আগে-পিছে কিছু নেই। অতীত অবশ্যই আছে, কিন্তু তাকে তো ফেলে এসেছি! ভবিষ্যৎ? যখন আসবে, তখন আসবে। এখন, এই মুহূর্তটুকুকে এই মুহূর্তেই উপভোগ করে ফেলো, রোমন্থন করবার জন্য যেন ফেলে রেখে দিও না। দিলে শেষ পর্যন্ত পস্তাবে।

—অমিত, তোমার বাবা-মা মানে ফ্যামিলির কথা একদম বলো না—সে অনুযোগ করে।

অমিতের জবাব আসে সঙ্গে সঙ্গে—তাহলে আমার বাবা-মা মানে ফ্যামিলির সঙ্গেই তোমার ডেট করতে হয়! করবে? বলো! আমি সরে যাই।

—আহা! কী কথার কী উত্তর! বন্ধুদের বাবা-মা'দের বিষয়ে বুঝি জানতে ইচ্ছে হয় না! আমার

বাপি-মা-দিদিকে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার যত বন্ধু আছে, সবাইকার বাবা-মা'কে আমি চিনি, ওঁরাও আমাকে ভীষণ ভালবাসেন....

—আচ্ছা দোলা, তোমাদের মেয়েদের এই ভীষ্ষণ ভালবাসাটা খুব খুব সস্তা, না? খু-উ-ব ইজি!

আহত হয় দোলা, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে।

—ডোন্ট বি হার্ট প্লিজ! বি প্র্যাক্টিক্যাল। বন্ধুদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কেন? একসঙ্গে পড়েছ বলে। আজ থেকে দশ বছর পরে কে কোথায় থাকবে তার কিন্তু কোনও ঠিক নেই। হয়তো শপিং করতে গিয়ে একজন পিসিমা মতো মহিলাকে দেখে বলবে...আরে! লাবণি না? কী মুটিয়েছিস রে! কিংবা তোমার হট ফেভারিট নিলয় চন্দরকে তোমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তুমি বিরক্ত হয়ে পেভমেন্ট বদলই করে ফেলবে, কেননা দাড়ি-না-কামানো উড়োখুড়ো চুল এই লোকটাকে তুমি আদৌ চেনো না।

—কেন? কেন? নিলয় কেন অমন হবে? বেশ তো!

—আরে বাংলায় এম.এ পাস করে আজকালকার দিনে একটা ছেলের চাকরি জোটানো কী অসম্ভব তা জানো? কী করবে ও? ট্যুইশানি। সারাটা জীবন ট্যুইশানি করে কাটিয়ে দেবে। তা ওর দাড়ি কামানো থাকবে না তো কার থাকবে না?

—এ ধরনের অ্যাসাম্পশন কিন্তু খুব বাজে যাই বল। হার্টলেস।

—আরে বাবা, হার্ট-ফার্টের ব্যাপারই এ নয়। প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ।

—আর লাবণি? লাবণি কেন পিসিমা হয়ে যাবে? তুমি ওকে দেখেছ?

—জানতে হলে দেখতে হয় না। দেখতে হয় না, জি.কে অ্যাবাউট লাইন মেন অ্যান্ড উইমেন দিয়েই হয়ে যায়। জি.কে অর্থাৎ জেনার্‌ল নলেজ বলে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মেয়ের বিয়ের দু-এক বছর পরেই বাচ্চা হয়, তার পরেই জমে মেটারনিটি ফ্যাট, পেটে, কাঁধে, বিশেষ করে আরও আরও প্রত্যঙ্গে, মুখচোখ অতি পরিশ্রমে-দুশ্চিন্তায় কালি-কালি হয়ে যায়। প্রেগন্যান্সির সময়ে চুল উঠে টিকটিকির ল্যাজ হয়, নয় টাক পড়ে যায়। তো তারপরেও একটা মেয়েকে পিসি-মাসি দেখানোটা এত কী আশ্চর্যের হল?

—মোটেই না, মোটেই এরকম আজকাল হয় না, সবার হয় না, এখন সবাই বিউটি-কনশাস, ফিগার-কনশাস। তা ছাড়া, আলাদা করে লাবণির কথাই যদি বলতে হয় তো ও তো সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বিয়ের পর।

—সিঙ্গাপুরে তাহলে লোকের বাচ্চা-কাচ্চা হয় না, বলছ! ওখানে তো ওকে আরও খাটতে হবে। আরও কালি পড়বে চোখে। সিঙ্গাপুর তো শিশু, খোদ আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডি.সি-তে তো আর যাওনি। ওফ্‌ফ্‌ কিছু মোটা দেখেছি বাবা ওখানে। অত মোটা মহিলা আর তুমি কোথাও পাবে না।

—নিউ ইয়র্কে? ওয়াশিংটনে? অবিশ্বাসের গলায় দোলা বলে—যাঃ। কী ভাঁওতা তুমি কাকে দিচ্ছ বলো তো? যাদের দেশে জিম আর এরোবিক্স আর হেলথ ক্লাবের ছড়াছড়ি, মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা হয় যাদের দেশে...

—মিস ফ্যাটিয়েস্ট প্রতিযোগিতাটাও ওরা করলে পারে, প্রত্যেক বছর ওরাই ক্রাউনটা পাবে।

ব্যাস, অমিতের বাবা-মা, তার ভাই-বোন আছে কিনা, থাকলে তারা কী রকম, কে কী করে, অমিতের ব্যক্তিগত জীবন এ সমস্ত প্রসঙ্গই এই ধরনের তরল হাসাহাসি, তর্কাতর্কিতে চাপা পড়ে যায়। তারপর থাকে কোনও রেস্তোরাঁর মৃদু আলো, কোনও সিনেমাহলের অন্ধকার। সাধারণত হল অন্ধকার হয়ে যাবার পরই ওরা ঢোকে। অন্ধকারে দুটো হাত লতার মতো পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে, একটা বড় হাত, ছোট হাতকে চাপ দেয়, ছোট হাতের পাতা বড় হাতের পাতাকে চিমটি কাটে; অন্ধকারে অদ্ভুত অদৃষ্ট অশব্দ কায়দায় চুম্বন-বিনিময় হয়, হাতে হাত, পায়ে পা, গায়ে গা, সেই

উদ্‌ভ্রান্ত শরীরী অভিজ্ঞতার সময়ে কিছু মনে হওয়া সম্ভবই নয়। বাইরে বেরিয়েও আসে ওরা শো ভাঙবার বেশ আগে, জনস্রোতে যদি চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কী ছিল? কী ছিল ছবিটা? যাঃ কেউ জানে না। দোলার চোখে লজ্জা জড়িয়ে থাকে, ওর চোখে গাঢ়, গাঢ় প্রেম। অন্যদিকে যেন চোখ সরাতেই পারছে না। তারপর দোলা এক বাসে উঠে যাবে, সজল শরীর, তার পিঠ দিয়ে উরু দিয়ে আকাঙ্ক্ষার লাভা-ঢল নামবে, কিন্তু কিছু করার নেই। এরপর রাত হয়ে যাবে। তার বাস চোখের আড়াল হলে ও কোথায় যাবে? ওর শরীর কেমন করবে? ওর মন কেমন করবে? দোলা জানে না, জানে না, জানে না। শুধু সে এই জন-জঙ্গলে একা, একেবারে একা, তাকে কেউ অশোভন ধাক্কা দিলে এ সময়টা সে কিছু বুঝতে পারে না। তার হাত-ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে কিংবা কেটে পয়সাকড়ি নিয়ে নিতে এ সময়টায় পকেটমার, ছিনতাইবাজদের কোনওই অসুবিধে হবে না। রাস্তা দিয়ে, বিশেষত গড়িয়াহাটের কাছাকাছি সব সময়ে পুজোর ভিড়, দোলার মনে হবে রাস্তাগুলো কেন এত ফাঁকা, চারদিকে কেন এত অন্ধকার, অথচ লোডশেডিং হয়নি, রাস্তায় প্রচুর আলো, বিজ্ঞাপনের বড় বড় ল্যুমিনাস রঙের সাইনবোর্ড, বিজলির কত রকম কেরামতি, অন্ধকার একটা ফাঁকা কানা গলি দিয়ে দোলা হাঁটবে, অবশ্যই বুকের আলোয় পথ চিনে চিনে, যে চাঁদ আকাশে ওঠেনি, যে আকাশ শহরের সমস্ত দূষিত বাষ্প নিয়ে, বিজলি আলোর দাবড়ানিতে শাদা, একদম ময়লাটে শাদা হয়ে আছে, সেই আকাশকে আকাশ-নীল রঙে চুবিয়ে তারপর তাতে একটি স্নিগ্ধ দ্বাদশীর চাঁদ এঁকে দিলে তবে দোলার বুকের ভেতরটা তৈরি হবে। সেই চাঁদের চাঁদনিতে পথ দেখে দেখে সে কর্নফিল্ড রোড থেকে এক স্টপ এগিয়ে যাবে। একটা মস্ত খেলার মাঠ, কে জানে কতদিন থাকবে, একটা মস্ত পুকুর, কে জানে কতদিন থাকবে, তাদের যে-কোনও একটার পাশ দিয়ে দোলা বাড়ির ঘনিষ্ঠ রাস্তাটি ধরবে। যে কেউ এখন দোলাকে দেখলে বলে দিতে পারবে এ হল একটা প্রেমে-পড়া মেয়ে, প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া মেয়ে। অথচ তার বাবা-মা বোঝেন না, তার বন্ধুরা বোঝে না—কেননা সে তো বলেনি কাউকে! ঘুণাক্ষরেও বলেনি। তারা সবাই, বাবা-মা এবং বন্ধুরা সব্বাই মনে করে দোলাটা একটা আদুরি, দোল দোল দুলুনি, সে নিজের দায়িত্বে নিজেকে নিয়ে কিছু করতে পারে না, কখনও করেনি। তার চেয়েও বড় কথা, দোলার নিষ্পাপ মুখকে দোলার অকপট কথাবার্তাকে তারা সবাই বিশ্বাস করে। বাবা, মা, দিদি, পার্থদা, নিলয়, শর্মিষ্ঠা, লাবণি, চঞ্চল...সবাই, সব্বাই।

এই যে গোপনতা এ-ও কিন্তু দোলার পক্ষে সত্যিই স্বাভাবিক নয়। কেন সব কিছু গোপন করছে দোলা? আরও কত ছোটবেলায় ওর বাবার বন্ধু যখন ওর সবে কুঁড়ি-ধরা বুক চটকে চটকে আদর করেছিলেন তখন সে কথা সে মাকে বলে দিয়েছিল। হিস্ট্রির একটা ঝাঁকড়াচুলো মাকড়ামুখো ছেলে কী যেন নাম, তার সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণ সেটাও সে নিলয়, অমৃতা, লাবণি সব্বাইকে বলে দিয়েছিল। এমন যদি দাঁড় করানো যায় যুক্তিটা যে এদের দিকে তার নিজের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না তাই বলে দিতে তার বাধেনি, তাহলেও কিন্তু ভুল হবে। বাবার বন্ধু সেই পরিমলকাকুকে সে খুব ভালবাসত। তাহলে? তাহলে এই একটা সোয়েটার বোনবার ছলে দুটো সোয়েটার বোনা, লাইব্রেরি যাবার ছল করে সিনেমা যাওয়া, কেন? কেন য়ুনিভার্সিটিতে যাবার কথা বলে সারাদিন ওর সঙ্গে ঘোরা জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, টই টই টই টই? সে তো বলতেই পারত—বাপি জানো, পার্থদাদের স্টিমার-পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ হল, অমিতাভ সেন। খুব মজাদার ছেলে, জানো বাপি? একদিন বাড়িতে ডাকব? এটাই তার পক্ষে ষোলো আনা স্বাভাবিক হত। বাপি নির্ঘাত বলত—তাই নাকি রে! আমার হবু ছোট সান-ইন-ল' মনে হচ্ছে? ডাক, ডাক, ডাক। মা শুনলেই বলত গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। তোমার ওই স্বভাব আর গেল না। ঝুলনের সময়েও এগজ্যাক্টলি এমনি করেছিলে। বাড়িতে ছেলেবন্ধু আনলেই হবু সান-ইন-ল' মনে হচ্ছে। আচ্ছা লোক যা হোক।

এরপর অমিতাভ বাড়িতে আসত। বাপি-মা অবাক, মুগ্ধ হয়ে যেতেন। দুই বাড়ির মধ্যে কথা বলাবলি, খেতে ডাকাডাকি শুরু হয়ে যেত। বাপি-মা'র লাইসেন্স নিয়ে পরিষ্কার বিবেকে দোলা

লজ্জা-লজ্জা হাসিমুখে ওকে মিট করতে বেরত, ও পৌঁছে দিত। বন্ধুরা বলত—ওঃ দোলা, ফ্যানটাসটিক, কেউ হয়তো বলত—এৎ তু দোলা?

কেন? কেন? কেন এমন ঘটাল না সে? তবে কি নিষিদ্ধ প্রেমের মতো গোপন প্রেমেও একটা আলাদা উত্তেজনা থাকে? মা-বাবাকে ঠকানোর, মিথ্যে কথা বলারও কি একটা আলাদা রোমাঞ্চ থাকে? আর বন্ধুদের?

সেদিন লাবণি যখন বলল—অমৃতাটার কী হল বল তো!

নিলয় বলল—ঘাবড়াচ্ছিস কেন? অরিন্দমদা তো বলছে ও ভাল আছে, সেফ আছে।

লাবণি মুখভঙ্গি করে বলল—আচ্ছা দোলা তুই-ই বল অরিন্দম ঘোষ কি পেশাদার টিকটিকি? শার্লক হোমস? না ফেলুদা? না ভাদুড়িমশাই? নিলয়টা এমন করছে যেন...

দোলার মনে হল—কে? কার কথা বলছে ওরা? কে অমৃতা? কে অরিন্দম ঘোষ? এদের কথা তো সে জানত না?

লাবণি বলল—বল না, তোর তো চিরকাল ও বেস্ট ফ্রেন্ড। তোর ওপিনিয়নের তো একটা আলাদা মূল্য আছে, তুই নিশ্চিন্ত হতে পারছিস?

হঠাৎ যেন বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় আসার মতো অমৃতা তার মনে এল। ধোঁয়া ধোঁয়া। আবছা আবছা। কুয়াশার মধ্যে যেমন দেখা যায় বা ধুনো-গুগগুলের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেমন চেনা যায়! অমৃতা। অমৃতা, তাই তো! তার এক সময়ের হার্ট-থ্রব অমৃতা চক্রবর্তী-গোস্বামী হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল বটে। সে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। লাবণিকে নিয়ে...। অরিন্দম ঘোষ তো লাবণির হবু? তার যেমন ও? না, না, লাবণির হবু আর তার হবুতে এক সমুদ্র তফাত, এক সমুদ্র তফাত তাদের সম্পর্কের সুর-লয়-তালেও।

কিন্তু অমৃতার কথা, তার নিরুদ্দিষ্ট হবার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল? কী আশ্চর্য! কী ভীষণ লজ্জাজনক! বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা, গলার কাছে একটা পিণ্ড অনুভব করে সে। বলে—অরিন্দমদা কী বলেছেন?

নিলয় বলল—উনি বলছেন ও সেফ অ্যান্ড সিকিওর।

লাবণি বলল—বাট দ্যাট ইজ জাস্ট আ হাঞ্চ!

নিলয় বলল—না রে লাবণি, আমার মনে হয় উনি ডেফিনিট কিছু জানেন।

—তাহলে বলছেন না কেন সেটা?—দোলা বলল।

—সেটাই তো! রহস্য করছে কেন? লাবণি বিরক্ত সুরে বলল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে দোলার মনে হল—ইস্‌স সে কী স্বার্থপর! যে অমৃতাকে সে চোখে হারাত, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে সে ভয়ে, রাগে, ক্ষোভে অস্থির হয়ে গিয়েছিল, অরিন্দমদার সঙ্গে সেই নার্সিংহোম যাত্রা! এ সমস্তর ওপর একটা পর্দা পড়ে গিয়েছিল যেন। আজ নিজের কাছে স্বীকার করতেই হয় অরিন্দম ঘোষ যে বলছেন অমৃতা ঠিক আছে, ভাল আছে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই এটা মেনে নিতে পেরে সে বেঁচে গেছে। অমিতাভ এখন তার মন থেকে সব কিছু, সব্বাইকে হঠিয়ে দিয়েছে। তার মগজে জায়গা নেই, হৃদয়ে জায়গা নেই। কাউকে কিছু বলবার তাগিদ নেই; আপনাতে সে আপনি মগ্ন, আপনি সম্পূর্ণ। একটা সুখ আর অলৌকিক আনন্দের বলয়ের মধ্যে এখন তার ঘোরাফেরা। কাউকে সে-সুখের কথা, আনন্দের কথা বলে সুখ ভাগ করে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

১২

ক'দিন ধরে শ্রাবণ অঝোরে ঝরছে। আকাশের মুখ দিনরাত দুপুর বিকেল সন্ধে-সকাল নীলগাইয়ের মতো নীলচে কালো। 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে'—গলা ছেড়ে গান গাইতে

গাইতে ডক্টর কার্লেকর ছাই-ছাই রঙের টি-শার্টের তলায় নীলচে কালো রঙের প্যান্ট পরছিলেন বোধহয় আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে। রম্ভা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন।

—কোথায় বেরচ্ছ? এখন? এই আনআর্থলি ওয়েদারে?

—তোমাদের বেবিরা তো ওয়েদার চার্ট-ফার্ট মানে না অপ্সরী!

মন খুব ভাল থাকলে রঞ্জন রম্ভাকে অপ্সরী বলে ডেকে থাকেন। আদরের ডাকে কান না দিয়ে রম্ভা বললেন—এত তাড়াতাড়ি তো তুমি নার্সিংহোমে যাও না? এখনও এগারোটা বাজেনি।

—এগারোটা না বাজলেও বারোটা বেজে যেতে পারে ডার্লিং। পায়ে মোকাসিন গলাতে গলাতে রঞ্জন বললেন।

—এই পোশাকে তুমি নার্সিংহোমে যাবে? রম্ভার অবাক হওয়া এখনও ফুরোয়নি।

—তা এই শ্রাবণধারাপাতে কি তুমি আমায় সুটেড বুটেড হয়ে যেতে বলো?

—তোমাকে কখনও ক্যাজুয়াল পরে নার্সিংহোমে যেতে দেখিনি।

—খেয়াল করোনি ডার্লিং। গেছি গেছি, এমন বর্ষায় গেছি।

—গাড়িটা তো বারান্দার তলাতেই দাঁড়াবে। ড্রেস করতে তোমার আপত্তি কী?

—সেটা এখানে। 'উজ্জীবন'-এ বারান্দার তলা নেই। সেখানে আর পাঁচজন গাড়িহীনের মতোই আমাকে ছাতা মাথায় ঢুকতে হবে।

—কী জানি বাবা! রম্ভার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে রঞ্জন নার্সিংহোমে যাচ্ছে না। তা না-ই যাক। অন্য কোথাও কোনও এমার্জেন্সি কল থাকতেই পারে। ডক্টর কার্লেকরের সব কেসই তো উজ্জীবনে আসে না! কিন্তু বলল না কেন সে কথা! রঞ্জন সাধারণত কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, আনুমানিক কত ঘণ্টা লাগতে পারে, কেস জটিল কি না এ সবই রম্ভাকে বলে থাকে। প্রথমত স্ত্রী একজন ডাক্তার, তারই মতো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে। দ্বিতীয়ত স্ত্রী সন্দেহপ্রবণ বলে।

রম্ভাকে একবার গম্ভীর পরক্ষণেই বিষণ্ণ হয়ে যেতে দেখে রঞ্জন বললেন—আরে, এর ওপর তো একটা এপ্রন চাপিয়ে নেব। তলায় ফর্ম্যাল শার্ট আছে না ক্যাজুয়্যাল আছে তখন কে দেখছে?

অনেক কথাই এর উত্তরে রম্ভার বলার ছিল। বলার ছিল নার্সিংহোমের স্টাফ যাতে সবসময়ে শতকরা শতভাগ পেশাদার চেহারায় থাকে, তাই ডক্টর কার্লেকরও নিজেকে তাদের আদর্শ হিসেবে গড়েছেন। এটাই নাকি তাঁর 'ইমেজ'। সেই 'ইমেজ' আজকে হঠাৎ ভাঙার কী দরকার পড়ল? কিন্তু এসব বলে রম্ভা কথা বাড়ালেন না। এই যে ঈষৎ বিষণ্ণ, সামান্য অবহেলিত, অবহেলিত বলেই সূক্ষ্মভাবে আহত তাঁর নিজের 'ইমেজ' এটাকে এই মেজাজটাকেও তিনি উপভোগ করেন। রঞ্জন বেরিয়ে গেলে, তার গাড়ি যতদূর দেখা যায় তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবেন। এখন বৃষ্টি সোজা ছাটে পড়ছে, তবুও বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালে তিনি ভিজে যেতে পারেন। সেই সামান্য ভেজা কামিজটা তিনি বদলাবেন না। বর্ষাকালে এমনিতেই তিনি একটু অ্যালার্জিতে ভোগেন। ভিজলে তো আর কথাই নেই। সন্ধে নাগাদ জ্বরটা এসে যেতে পারে। তখন তিনি কপালে একটু বাম ঘষে নীল আলো জ্বেলে বিছানায় শুয়ে থাকবেন। চেম্বারে বসবার আগে রঞ্জন আর তিনি একসঙ্গে বসে একটু কফি খান। কফি খাওয়ার একটা সুন্দর জায়গাও আছে তাঁদের। খাবার ঘরের একদিকে দুটো কোণা জুড়ে এত বড় জানলা যে মনে হয় জানলা নেই, কাচের ওপারেই বাগান, বাগানের ওপারে শান্ত পথঘাট। এই কোণটাতে তাঁদের স্মোকড গ্লাসের কফি-টেব্‌ল পাতা। সেদিকে যেতে গিয়ে যখন রম্ভাকে দেখতে পাবে না, রঞ্জন ওপরে আসবেই। বেডরুমে।

—কী ব্যাপার? নীচে নামোনি এখনও?

—তুমি রেডি? চান করেছ?

—শিওর! ওডি কলোনের গন্ধটা পাচ্ছ না!

—নাঃ!, নাক বন্ধ।

—আবার সর্দি হল না কি?—রঞ্জনের গলায় থাকবে উৎকণ্ঠা।

—সর্দি হয় তো হয়েছে। চলো। —বলে রম্ভা মন্থর ভঙ্গিতে উঠবেন। নীল-এর ওপর ধূসর ছাপের সেই শিফনটা পরনে। রঞ্জন কাছে এসে গালে গাল রাখবে। রেখেই চমকে উঠবে।

—এ কী? তোমার তো বেশ গা গরম।

—ও, তাই মাথাটা ব্যথা করছিল।

—করছিল, এখন?

—কমে গেছে।

—থাক তা হলে নীচে গিয়ে কাজ নেই। এখানেই আনতে বলে দিই। বাজার টিপবেন রঞ্জন। কালীচরণ, ওঁদের বেয়ারা কফি পট সুদ্ধু ট্রলিটা বেডের পাশে রেখে যাবে।

কফিতে একটু করে চুমুক দেবেন আর রম্ভার জ্বর-লালচে মুখের দিকে চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকাবেন রঞ্জন। কফিটা যখন দেড় কাপ মতো শেষ তখন রঞ্জন ঝুঁকে পড়বেন, রম্ভার বুকের ওপর।—ডার্লিং...

—আঃ, কী করছ? ছোঁয়াচ লাগবে।

—দূরে থাকলেও লাগতে পারে যখন তখন কাছেই থাকি। রঞ্জনের গলার স্বর এখন বদলে যাবে। গাঢ়, গভীর। সেই অনেকদিন আগেকার, বিবাহপূর্ব রঞ্জন, মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের রঞ্জন আর রম্ভা।

সামান্য জ্বর গায়ে অসময়ের সেই গাঢ় সঙ্গমের জন্যে আজ অপেক্ষা করবেন রম্ভা। সারাদিন ধরে তার প্রস্তুতি চলবে, প্রস্তুতি এবং প্রতীক্ষা। এইরকম অসময়ে না হলে তো রঞ্জনের আর সময়ই হয় না।

১৩

'উজ্জীবন'-এর দরজায় দাঁড়াল ধূসর রঙের মারুতি এসটিমটা। ছাতা হাতে রহমান শোফার নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলল। নেমে গেট অবধি পৌঁছে হঠাৎ রহমানের হাত থেকে ছাতাটা কেমন কেড়ে নিলেন ডক্টর কার্লেকর। —'রহমান, ছাতাটা একটু রাখছি। বুঝলে?'

—ঠিক আছে সাব।

—গুড মর্নিং

—গুড মর্নিং

—গুড মর্নিং

নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন রঞ্জন। বেল বাজালেন। এনকোয়্যারি থেকে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি উঠে এল।

—তুমি কেন? রজ্জাক কী করছে? আশ্চর্য তো? রজ্জাককে বলবে—আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম টু রিপীট দিস। যাই হোক সিসটার মাধুরীকে ডেকে দিও।

—সেন না দাশ?

—সরি, সেন।

মাধুরী সেন বেশ বয়স্কা। চল্লিশের বেশ ওপরে। কিন্তু দারুণ কর্মঠ, পটু এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন। দুই মাধুরীই। কিন্তু দাশ-এর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখতে-শুনতেও একটা আলগা চটক আছে। রম্ভা চান না মাধুরী দাশ রঞ্জনের কাছাকাছি আসে। মাধুরী দাশও খুবই নিপুণ। তবু, নিজের জীবনের এই জটিলতার কথা মনে রেখেই রঞ্জন মাধুরী সেনকে তাঁর কাজকর্মগুলো করতে দিতে পছন্দ করেন।

মাধুরী সেন আসতে রঞ্জন নিচু গলায় বললেন—আমি যাচ্ছি, রাউন্ডে আসতে একটু দেরি হতে পারে। আমার চেম্বারের বাইরে নট টু বি ডিসটার্বড-টা লাগিয়ে দিন। কোনও কারণেই যেন কেউ

আমাকে বিরক্ত না করে। আশা করছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাব। পেছনের দরজায় একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে রাখুন। আপনিই। এলে আমাকে ডাকবেন। ছাতাটা নিয়ে যান।

কতকগুলো আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়লেন কার্লেকর।

একটু পরেই হলদু-আলো ট্যাকসিটা ছুটে চলল ডোভার লেনের দিকে।

খসখস খসখস করে খবরের কাগজের ওপর মুখস্থ উত্তর লিখে যাচ্ছে অমৃতা। স্পেশ্যাল পেপার...শর্ট নোট সব—বিজয় গুপ্ত কেতকা দাস রামেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বিজ মাধব...। এগুলো স-ব সে আগে মুখস্থ করেছে, মুখেও বলে নিয়েছে। কিন্তু তার বাবা তাকে এই কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছেন। যতই বলে নাও, লেখবার সময় ঠি-ক ভুলে যাবে। সেইজন্যে লেখার অভ্যাস দরকার। বাবারা নাকি ছোটবেলায় এ সব কাজ বালি-কাগজে করতেন। সেগুলো অনেক কমদামি। এখন সে সব পাওয়া যায় না, কাগজ জিনিসটাই দুর্মূল্য হয়ে গেছে? একটা রুলটানা বা না-টানা লম্বা ফুলস্ক্যাপ সাইজের খাতা আট থেকে ন টাকার মধ্যে আসা-যাওয়া করে। অত পয়সা অমৃতা কী করে খরচ করবে? সে পুরোনো খবরের কাগজের ওপর শাঁই শাঁই করে লিখে যায়। মাসি মাঝে মাঝে বলেন—কী রে, খবরের কাগজের ওপর লিখছিস বুঝতে পারবি?

অমৃতা একটু হাসে। বুঝতে পারবার তত দরকার নেই। দরকার হল গড়গড় করে এই লিখে যাওয়াটা।

একটা নোট লেখা শেষ করে সে ফিরে মাসির দিকে তাকায়—তোমরা কেমন করে পরীক্ষার প্রিপেয়ারেশন করতে মাসি?

—আমি তো বার বার করে পড়তাম। ঘুরে ফিরে পড়তাম।

—নিজে উত্তরগুলো লিখতে না?

—কিছু লিখতাম, আর কিছু স্রেফ বই পড়ে চলে যেতাম?

—হত তাতে?

—ওই যা হত তা হত। বি.এ পাস কোর্সের পড়া তো, তা-ও জানতাম যে দেখাশোনা চলছে, পছন্দ হলেই বিয়ে হয়ে যাবে?

বিয়ের প্রসঙ্গে অমৃতার চোয়াল সামান্য কঠিন হয়ে যায়। লক্ষ পড়বার মতো নয়। চোয়ালের এই কঠিনতাও অমৃতার ভেতরের। সে জিজ্ঞেস করে—তোমার কী সাবজেক্ট ছিল মাসি?

—দূর, অত কি মনে আছে? ওই ফিলসফি, হিসট্রি, স্যানসক্রিন্ট বোধহয়।

—পড়তে তোমার ভাল লাগত না?

—নাঃ।

—কী ভাল লাগত তাহলে?

—এই গপ্পো করা, নিন্দেমন্দ পরচর্চা, সিনেমা যাওয়া, আমাদের সময়ে তো প্রচুর সিনেমা-হল, প্রচুর সিনেমা, প্রতি সপ্তাহে একটা করে দেখতাম।

—যাঃ।

—মাসির ওপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে না কি রে?

অমৃতার মুখ নরম, নরম, আরও নরম হয়ে গেল। সে বলল—

—অশ্রদ্ধা? কী যে বলো!

—তবে উনি যখন চলে গেলেন তখন আমার বয়স ঠিক পঁয়ত্রিশ। উনিশে বিয়ে হয়েছিল, ঠিক ষোলো বছর। সেই সময়টা...সম্পদ তখন এগারো বছরের। বারোয় পা দিয়েছে। ওকে দেখাশোনটা খুব বড় কাজ ছিল। তবু, তবু মনে হত কেন আর একটু ভাল করে পড়াশোনাটা করিনি! টাকা-পয়সার অভাব তত বুঝিনি। খুব ভাল ইনসিওরেন্স ছিল, অফিস থেকেও পাওনা ছাড়া অতিরিক্ত অনেক

দিয়েছিল, তা ছাড়া এই বাড়ি ছিল, মহানির্বাণ রোডের বাড়িটা ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া, কিন্তু তা নয়, কেমন শূন্য-শূন্য লাগত। মনে হত আমার নিজের ভেতরটায় কিছু নেই, কিছু জন্মায়নি।

—তাহলে আবার শুরু করলে না কেন?

—অভ্যেসটাই তখন চলে গিয়েছিল, বুঝলি অমি? কতকগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকা, মেয়েদের পত্রিকা আর কখনও সখনও এক আধটা বাংলা নভেল ছাড়া কিছ্ছু পড়িনি এই ষোলো বছর। বয়সটাও তখন মনে হত অনেক। কেঁচে-গণ্ডুষ করতে লজ্জাও ছিল, আবার ওই যে বলছি অনভ্যাস। মনের মধ্যে গভীরতাই বলিস আর মনোযোগই বলিস—কণামাত্র ছিল না।

অমৃতা বলল—ধ্যাঃ। তোমার গভীরতা নেই? মনোযোগ নেই? বিশ্বাস করতে বলো?

বললেন—মগজ, মস্তিষ্কের কথা বলছি রে। মাথা দিয়ে কোনও কঠিন জিনিস সল্‌ভ করতে পারার ক্ষমতাটা চলে গিয়েছিল।

—চলে যায়নি মাসি। হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছিল। জাগাবার চেষ্টা করলেই জাগত। তা ছাড়া, তোমার কোনও মোটিভেশন ছিল না। টাকা-পয়সার যেহেতু অভাব ছিল না। তাই নতুন করে কিছু করার উৎসাহ বা প্রেরণা পাওনি।

– ঠিক বলেছিস। কত বুঝিস তোরা আজকালকার মেয়েরা।

—এমা, তোমাকে এভাবে বলা আমার উচিত হয়নি।

—দেখো কাণ্ড, আমি কি তাই বলেছি? সত্যিই আমার মনে হয়, তোরা কত কত এগিয়ে গেছিস। কত কী জানিস। কত ভুল করিস না। কত ভুল শুধরে নিতে পিছপা হস না।

—আমরা একটা নতুন প্রজন্ম মাসি, এটা আমাদের কোনও বাহাদুরি নয়। সায়েন্স, টেকনলজি, মাস-মিডিয়া এই সব কথা আমাদের শিখিয়েছে। ভাবনা উসকে দিয়েছে। তোমাদের সময়ের থেকে আমাদের সময় আর একটু এগিয়ে গেছে।

—ভেতরে ভেতরে কিন্তু রয়ে গেছে সেই পশুবৃত্তি, সেই লোভ, সেই হিংসা...একটু থেমে অমৃতা আবার বলল।

শিবানী বললেন—না, তুই পড়, আমি তোকে বড্ড বকাচ্ছি। অমৃতা হাসল। পড়া জিনিসটাও তো যান্ত্রিকভাবে হয় না। তার মধ্যে অন্য মানুষের উষ্ণতা, অন্য মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, জীবনবোধ এসব না মিশলে আর যারই হোক, তার পড়া হয় না।

শর্মিষ্ঠা তো বেশিরভাগ সময়েই সর্বোচ্চ নম্বর পায়। কিন্তু ওকে একটা আলোচনার মধ্যেও আজ পর্যন্ত টেনে আনতে পারল না কেউ। রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী রহস্যের মতো মুখরোচক মনোরোচক বিষয়ে পর্যন্ত না।

নিলয় প্রশ্নটা করেছিল। শর্মিষ্ঠা বলল—'কবিমানসী' তো পড়েছিস?

—তা পড়েছি উল্টেপাল্টে।

—তা হলে, তা হলে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—হায় কপাল! ওটা তো জগদীশ ভট্টাচার্যের দেখা-বোঝা, তুই কী বুঝিস, তোর কিছু মনে হয় না?

—না। আমি ওঁদের দেখিওনি। শুনিওনি।

—তাই বলে বুঝবিও না?—অমৃতা অনুযোগ করে।

—বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কাদম্বরীর দেবীর সঙ্গে কথা বলতে হয়, প্ল্যানচেটে বসবি? তাতেও হবে না, টিকটিকি লাগাতে হবে।

—কী আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো তো রয়েছে। কবিতা, গান।

—তোরা বুঝগে যা।

অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা, একটি সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া মেয়ে, যার হাতের লেখা, যে বানান ভুল করে না, প্যারাগ্রাফিং সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। যথেষ্ট পড়ে, এবং যথেষ্টর চেয়েও বেশি মুখস্থ করে, সে তার অর্জিত বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে পারে না। তার জীবন, মননের সঙ্গে ওই পড়াশোনার কোনও যোগ নেই।

অমৃতার পেটের ভেতরে এই সময়ে সে ডিগবাজি খেল। প্রচণ্ড একটা টান ধরল পেটে। টেবিলটা ধরে সেই ধাক্কা সামলাল সে। এই রকম সময়গুলো ছাড়া অমৃতার খেয়ালই থাকে না, তার ভেতরে একটি অঙ্কুর, জীবন্ত অঙ্কুর, তার নিজের সৃষ্টি, তার নিজের রক্তপ্রবাহের লালন, সে যা খায় ও-ও তার সারবস্তু পায়, তার অসুখ করলে ওরও অসুখ করবে। কোনও অনুভূতি নেই তার ওর জন্যে। অথচ ওকে বাঁচাবার জন্যেই সে একদিন প্রচণ্ড লড়াই করেছিল। যার ফলে তার নিকটজনদের মুখোশ মোচন হয় তার কাছে। আশ্চর্য, কোনও কৌতূহল পর্যন্ত নেই। ডক্টর কার্লেকর বলেছেন—ও ছেলে। সে কিন্তু জানতে চায়নি। কোনও বাৎসল্য, মাতৃত্ববোধ নেই আজ তার মধ্যে। একটা বাঘিনী যেন একটা বিড়ালী হয়ে গেছে। থাবার ওপর মুখ পেতে যে ঘুমোতে ভালবাসে। তার ক্ষেত্রে এই ঘুম অবশ্য এম.এ ফাইন্যালের পড়া। খবরের কাগজগুলো সরিয়ে রেখে সে একটা বই টেনে নিল, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ওপর আলোচনা।

ডক্টর কার্লেকর যখন খালি পায়ে এই ঘরে ঢুকলেন, পেছনে তাঁর মিসেস শিবানী দত্ত, তিনি একটা অভিনিবিষ্ট পিঠকে ঝুঁকে থাকতে দেখলেন। দেখলেই বোঝা যায় এই অভিনিবেশ গভীর—মাথার চুলগুলো কিছু পিঠে, কিছু কানের পাশ দিয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। একটা সাদার ওপর হালকা ছাপের আঁচল, একটি কানের সোনার ছোট্ট মাকড়ি।

তিনি মিসেস দত্তর দিকে ফিরে তাকালেন। উনি হেসে বললেন—ঠিক আছে, আপনার কাজ তো আপনাকে করতেই হবে। আসুন। অমৃতা...ডাক্তারবাবু এসেছেন।

রুটিন চেক-আপ। প্রতি মাসে ডক্টর কার্লেকর নিষ্ঠাভরে কাজটা করে যাচ্ছেন। সব রোগিণীই তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু এই মেয়েটি বিশেষ দায়িত্ব। বিশিষ্ট এই মেয়েটিও। এ রকম অদ্ভুত মেয়ে তিনি আর দেখেননি। স্বামী যাকে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে এম.টি.পি. করতে নার্সিং হোমে নিয়ে এসেছিল, যে জবরদস্তির ফলে সে মারা যেতেও পারত, সে সব ঘটনা যেন মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে মেয়েটি। সন্তান কবে ভূমিষ্ঠ হবে, কেমন করে হবে, এ সব নিয়েও তার কোনও ভয়-ভাবনা নেই। অদ্ভুত নির্ভীক। তিনি যে তাকে ওই পরিস্থিতি থেকে বাঁচালেন, এখনও নিয়মিত তদারকি করে যাচ্ছেন, এ নিয়ে কোনও কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়িও তার বাক্যে তো দূরের কথা, হাবে-ভাবেও তিনি দেখেন না। তার সমস্ত মনোযোগ সূচিবিদ্ধ হয়ে আছে কতকগুলি বইয়ে, কতকগুলি খাতার পাতায়।

অনেকটা... অনেকটা কি রম্ভার মতো? মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের রম্ভা! যখনই ওর হস্টেলে যেতেন এই ধরনের একটা দৃশ্য দেখতেন। অভিনিবিষ্ট। ফিরেও তাকাত না কারও দিকে। তিনি...তিনিই জোর করে তার সেই অভিনিবেশে থাবা বসালেন, ভাগ চাইলেন সময়ের, কামমোহিত করলেন সেই অপাপবিদ্ধ কুমারীকে, তার গহনা বেচে সে রঞ্জনকে লন্ডনে পাঠাল এম আর সি ও জি করতে, নিজে তখনকার এক বিখ্যাত গাইনির সহকারী হিসেবে কাজ নিল মেডিক্যাল কলেজেই...। তারপর? তারপর? লন্ডনেই কি আর এক ডিগ্রিকামী শার্লটের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মাখামাখি শুরু হয়ে গেল? তারপর? একদিন কোনও খবর না দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত রম্ভা কার্লেকর যখন তার অ্যাপার্টমেন্টের বেল-এ হাত রাখল, তার কিছুক্ষণ, অল্প কিছুক্ষণ আগেই মাত্র চলে গেছে শার্লট, সেদিনের সান্ধ্য সহবাস সেরে। সমস্ত ঘরে শার্লটের প্যারফিউমের মেয়েলি গন্ধ। বালিশের পাশে তার ব্রা কুণ্ডলীকৃত। নীচ থেকে কেয়ারটেকার ফোন করে জানাল ইন্ডিয়া থেকে এক মহিলা এসেছেন,

দেখা করতে চাইছেন, তখন রঞ্জন পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে প্যান্টের জিপার টানছেন, ব্রাটা ফেলে দিচ্ছেন ট্রাশ-ক্যানে, চুলে দ্রুত চিরুনি চালাচ্ছেন। টেপ-ডেকে জ্যাজ চলছিলই। মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি নিয়ে তিনি রম্ভাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। দরজাটা খোলার আগে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উদ্বেগ মিশে ছিলই। দরজা খোলবার পর সেটা সত্যিকার উচ্ছ্বাস হয়ে গেল। উঃ কত, কতদিন পর আবার সেই পরিচিত প্রিয় মুখ, সেই দেহ, সেই গন্ধ! তিনি ভাবতেও পারেননি।

—তুমি!

—এলাম!

—প্যাসেজ মানি?

—জোগাড় করলাম।

—ছুটি?

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

—অ্যাঁ?

—কেন? অ্যাঁ কেন? এখন তুমি যা স্কলারশিপ পাচ্ছ তাতে আমি এখানে চালিয়ে নিতে পারব।

—মা-বাবা?

—আমার না তোমার?

—ধরো তোমার।

—তাঁরা তো লখনউ-এ রয়েছেন। যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। আর তোমার বাবা-মার গ্রামের জমি-জমাতে যেমন চলে যাচ্ছিল তেমনি চলে যাবে।

—মঞ্জুর বিয়ে?

—মঞ্জু তোমার দায়িত্ব রঞ্জন। আমি তাকে ভালবাসি বলেই তার দায়িত্বটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবার মতো অপুরুষ এবং সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর কি তুমি?

তারপর সমস্ত আবহাওয়াটাকে রোমাঞ্চিত করে রম্ভা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুটকেস মাত্র একটা, মাটিতে পড়েছিল। অশ্রুধারায় ভিজে যাচ্ছিল রঞ্জনের টি শার্ট।

রম্ভাকে তিনিই নষ্ট করে দিয়েছেন। কিছুতেই, কিছুতেই তার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেন না তিনি। রম্ভা আর পড়ল না, চাকরি করল না, প্র্যাক্টিস করল না, অথচ কী ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে ছিল, ডিফিকাল্ট ডেলিভারির কত খুঁটিনাটি তিনি রম্ভার কাছ থেকেই শিখেছেন। কত লক্ষ লক্ষ রোগিণীকে বঞ্চিত করলেন তিনি। দেশকে বঞ্চিত করলেন এক নিবেদিত কর্মী প্রাপ্তি থেকে। পরিবারকে বঞ্চিত করলেন এক চমৎকার দায়িত্বশীল, উপার্জনক্ষম বধূ থেকে। নিজেকে বঞ্চিত করলেন স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবন থেকে, ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করলেন মাতৃ-পিতৃসঙ্গ থেকে। আর রম্ভা? রম্ভাকে বঞ্চিত করলেন সবচেয়ে বেশি। বিষিয়ে দিলেন তার মন। মস্তিষ্ক আর সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল না। গাইনোকলোজি অ্যান্ড অবসটেট্রিক্স-এ গোল্ড মেডালিস্ট একটা গুডিভ স্কলার এখন বিউটি ক্লিনিক, হেল্‌থ ক্লাব এই সব চালায় তাও নাম কা ওয়াস্তে। ক্লিনিক থেকে, ক্লাব থেকে রম্ভা তার আরশুলা রঙের মারুতি নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে 'উজ্জীবন'-এ, মেডিক্যালে, শহরের যেখানে যত নার্সিংহোমে তাঁর রোগিণী আছে, অপারেশন আছে সর্বত্র। রম্ভার এই প্যারানইয়া তাঁরই প্রতিদান তার প্রেম, তার গহনা-র মূল্যে কেনা ডিগ্রির পরিবর্তে।

এ মেয়েটি? এই অমৃতা? এ-ও কি ওইরকম উজ্জ্বল ছাত্রী? কী অখণ্ড অভিনিবেশ নিয়ে পড়াশোনা করে! এ বিবাহিত ছিল। সে বিবাহে প্রেম ছিল না, এ তিনি দুই পার্টির সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জেনেছেন। এ নিজেকে তৈরি করছে। একা জীবনে দাঁড়াবার জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই সংকল্পের কাঠিন্য তিনি প্রত্যেকবার এখানে একে পরীক্ষা করতে এসে টের পান। কিন্তু, বলা তো

যায় না, বাইশ-তেইশ বছরের বাচ্চা মেয়ে একটা। যদি কেউ দস্যুর মতো এসে এর প্রণয় লুঠ করে? নষ্ট করে দেয় এই সংকল্প? এই অভিনিবেশ? তাঁকে রম্ভা পালাতে দেয়নি। কিন্তু এর সেই হতে-পারে প্রণয়ী যদি পালায়? যদি অমৃতার কোনও অর্থবল না থাকে? যদি—যদি—যদি।

—ব্লাড প্রেশারটা এত বেড়েছে কেন? পা-টাও ফুলেছে বেশ। নুন খাওয়া চলছে না কি পাতের পাশে?

—উহুঁ।

—ওকে জিজ্ঞেস করবেন না ডাক্তারবাবু, ও জানে না ও কী খায়। যখন যা ধরে দিই নির্বিবাদে খেয়ে নেয়। পাতে নুন দিই না।

—খিদে বাড়েনি?

—বাড়েওনি কমেওনি।

—বাচ্চাটা একটু ছোট। তা হোক। অমৃতা, একটু বেশি করে খাও। বুঝলেন মিসেস দত্ত। দুধ, একটু ফল, আর ডাল ভাত গ্রিন ভেজিটেব্‌লস আর মাছ। চিকেন-টিকেন না খেলেও চলবে, তবে মাছটা চাই-ই। একটু বেশি করেই। সম্ভব হলে একটু লিভার।

—চিকেন বা মাটনে আপত্তি নেই তো?

—মাটনটা থাক এখন, চিকেন ইজ ও কে। আর ওই যে বললাম লিভার।

মিসেস দত্ত মহিলাটির দিকে তাকিয়েও খুব অবাক হল ডক্টর কার্লেকর। মেয়েটি ঠিক বুঝেছিল কিন্তু কার ওপর ও নির্ভর করতে পারবে। চমৎকার চিনেছিল। তিনি ভেবেছিলেন এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। কিছুদিন পর হয় মিসেস দত্ত, নয় অমৃতা নিজেই, তার আত্মসম্মানজ্ঞান যথেষ্ট, এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করবে। বাবা-মার কাছে এই পরিস্থিতিতে থাকাটা ওর বিপজ্জনক। তখন কী করবেন সেটা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল। এমন কথাও ভেবেছিলেন সিস্টার মাধুরী সেনকে অনুরোধ করবেন। যদিও মনে মনে জানেন সেটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। মাধুরী দুটি মাত্র ঘর নিয়ে থাকে। একটা ঘেরা বারান্দা। সেখানেই রান্না-বান্না। একটি ঘরে থাকেন মাধুরীর বৃদ্ধ বাবা, অন্য ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রী। এর মধ্যে কোথায় আর একজনের জায়গা হবে। রম্ভাকে সব বলে নিজেদের বাড়িতে রাখবার কথাও ভেবেছিলেন। হৃৎকম্প হয়েছিল, তবু ভেবেছিলেন। কিন্তু এই মিসেস দত্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কথায় বলে না? যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন! কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যার কেউ নেই তার প্রতিবেশী থাকে, বন্ধুর মা থাকে।

ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর চলে যাবার পরও অমৃতা ফিরে পড়তে বসতে পারে না। প্রথমত, তার এইবার একটু ক্লান্ত লাগছে। শরীরটা একটু দুর্বল, মাথা টলছে। তারও ওপর ডাক্তার এলেই তার মনে পড়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তাকে নিয়ে একটা কেস চলছে, মনে পড়ে যায় তিন বছরের বিবাহিত জীবনের সেই বিরাট দুঃস্বপ্ন যেটাকে সে ঠিক দুঃস্বপ্ন বলে চিনে উঠতে পারেনি। খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না তো জীবনে। বরাবর পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে মনে হত এই ভাবেই চলতে হবে, অন্তত তাকে। অভিযোগ করে লাভ নেই। মা যাকে জন্ম দিয়েই হার্টের রোগ বাধান, জ্ঞান হওয়া থেকে সে তার মায়ের ধাত্রী, সে অভিযোগহীন, আবেগবর্জিত প্র্যাক্টিক্যাল মানুষ হবে না তো কে হবে? কেরিয়ার একটা গড়তে হবে এইটুকুই সংকল্প ছিল। তেমন রেজাল্ট হলে কলেজ, নইলে স্কুল, নইলে যা হোক একটা সম্মানজনক কিছু। বাইরে বেরোতে পারবে। পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা আলাদা জগৎ তৈরি হবে। এই কংসের কারাগার চিরন্তন লাগবে না তখন। হাতে থাকবে নিজের উপার্জন করা টাকাপয়সা, আলাদা একটা গুরুত্ব তৈরি হবে তার। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা তো তার দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল! সন্তান ধারণ করাটা দোষের কেন হবে, সে এখনও বুঝতে পারে না। ঠাকুমা-ঠাকুর্দাদের তো স্বপ্নই কচি-কাচা নাতি-নাতনি! সুদ্ধু সে আর অত কাজ করতে পারবে না বলে তাঁরা, নিজেদের প্রথম নাতিকে গর্ভে বিনষ্ট করতে

চাইলেন? তাদের বাবাও চাইল? সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা বোধের অগম্য প্রহেলিকা। এমন হয়! হতে পারে?

—আসতে পারি?

অরিন্দম ঘোষ বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করে।

একটা ডিভানে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজে ছিল সে। বলল—আসুন। অরিন্দম আজও তাকে নিজের নাম বলেনি।

—মিঃ ঘোষ বলে ডাকলেই তো চলবে! সে বলে।

অমৃতা কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাচাপি করতে পারে না। তবু বলেছিল—আপনি তো এখন বেশ চেনা মানুষ হয়ে গেছেন। এত চেনাকে কেউ মিস্টার বলতে পারে না কি?

—তা হলে ঘোষদা? অনেক অফিসে এটা চালু আছে। জানেন তো? বাঙালি দেখলেই ভারতের আপামর অবাঙালি বলবে দাদা। সেই আমেরিকান ইয়োরোপিয়ানদের ধারণা ছিল না? ইন্ডিয়া মানেই ম্যাজিক, ইয়োগী আর সার্পেন্ট। এদেরও তেমনি ধারণা বাঙালি মানেই দাদা, রসগোল্লা আর মছলি।

—আমি অবাঙালিও নই, আপনার অফিস কলিগও নই, ঘোষদা-টোষদা বলতে পারব না।

—আচ্ছা লালটু নামটা আপনার কেমন লাগে?

—আমার ভাল লাগার ওপর আপনার নাম নির্ভর করছে না কি?

—বেশ আপনি আমাকে লালটুদা বলেই ডাকবেন অমৃতা।

অমৃতা অবশ্য লালটুদা-টা বলে ডাকটা এড়িয়ে যায়। তবে স্বীকার করতেই হবে এই লালটুদা, অথবা ঘোষদা মানুষটি খুব মজার এবং খুব উপকারী।

—আসুন, বলতে বলতে সে উঠে বসল। পেটে একটু চাড় লাগল, সামান্য মুখ বিকৃত হল তার।

—খুব অসুবিধে করলাম বোধহয়...

এ কথার উত্তর দিল না অমৃতা।

কাছাকাছি একটা বেতের মোড়া টেনে বসে অরিন্দম ঘোষ পকেট থেকে দুটো খাম বার করলেন। এগিয়ে দিলেন অমৃতার দিকে।

প্রথমটা খুলতেই মা-বাবার চিঠি বেরোল। অরিন্দম ঘোষ তার বাবা-মার সঙ্গে দৌত্যের কাজটা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। এক সময়ে ডঃ কার্লেকর এটা অপছন্দ করেছিলেন।—অমৃতার বাবা-মার বাড়ি ওরা নজর রাখবে।

ঘোষ তখন জানান—পেছন নেওয়া টিকটিকিদের ফাঁকি দেবার বহু উপায় না কি তাঁর জানা আছে।

মা লিখেছে :

খুকি,

তোকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। চার পাঁচ মাস হতে চলল, তোকে দেখিনি, তোর গলা শেষ কবে শুনেছি মনে পড়ে না। তোর শরীরের এই অবস্থায়, মনের এই অবস্থায় আমি মা হয়ে তোর কিছুই করতে পারছি না, আমার দিবারাত্র বুক ধড়ফড় করে। শিবানীর কাছে তুই খুব ভালই আছিস, ঘোষ ছেলেটি বারবার আশ্বাস দিয়ে যায়। কিন্তু আমার মন মানে না। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় আর দেখা হবে না। তুই সত্যি-সত্যি ঠিক আছিস কি না, কী অসুবিধে আমাকে খুলে লিখবি। নইলে ভাবব।

ইতি তোর
অভাগিনী মা।

বাবা লিখেছে,

অমৃতা,

আমার চিঠি তোমার মায়ের চিঠির পুনশ্চ বলে মনে করবে। আমার মনের অবস্থা আমি ভাষায়

প্রকাশ করতে পারছি না। দু হাজার টাকা আপাতত পাঠাচ্ছি। আরও পাঠাব দিন পনেরোর মধ্যে। যত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসো, ততই ভাল।

ইতি

বাবা

এতই যদি না-দেখে-থাকতে-না-পারা তা হলে মেয়ে গ্র্যাজুয়েট না হতেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলে কেন মা? তোমার বুক ধড়ফড় কবে করত না মা? আমার অসুখ করলে বাড়ত। আমার পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার সময়ে বাড়ত। আমি শাড়ি পরছি, আমার চুল কোমর ছোঁয় ছোঁয় দেখে বাড়ত। তোমার এ বুক ধড়ফড়ানি থামাতেই তো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলে? আর ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যাওয়া? মানে মৃত্যু? একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু তার বাবা-মার তার কাছে মৃত হয়ে যাওয়া। অন্তত সমাজ তাই প্রত্যাশা করে, এখনও। একটা মেয়ে বাইশ বছর তেইশ বছর বাবা-মার কাছে প্রতিপালিত হল, এতদিন পর্যন্ত মেশামেশি, মাখামাখি, তিনজনে কি চারজনে মিলে একটা ইউনিট। কিন্তু বিয়ের পরদিনই সেই নিজের বাড়ি বাপের বাড়ি হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কথা হয় বউ বেশি বেশি বাপের বাড়ি যায় কি না। দুই কুটুম্বে ভাব-ভালবাসা, মনের মিল, যেমন গল্প উপন্যাসে পড়া যায়, বাস্তব-জীবনে সে রকম খুবই কম হয়। হলে ভাল, না হলে ক্রমশ মেয়ের কাছে মেয়ের বাবা মা মৃত থেকে মৃততর হয়ে যেতে থাকেন। মা! মা গো! ও বাবা, কোথায় গেলে। কেন এমন ভুল করলে, হঠাৎ অসাবধানে অমৃতার চোখ ফেটে উষ্ণ প্রস্রবণ বেরিয়ে এল। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে চোখে। পাহাড় ফাটিয়ে যখন গরম জল বেরিয়ে আসে তখন পাহাড়ের পাথরদেরও কি এমন লাগে? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট টিপে বসে আছে অমৃতা, চোখ দিয়ে অবিরল উষ্ণ ধারাপাত। সামনে ঘোষ চুপ করে বসে সেই ধারাপাত দেখছে, পড়ছে। সোজা চোখে নয়, চোখ নিচু, কিন্তু প্রথম চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার দৃশ্যটা দেখেছে, দেখেছে সেই ঠোঁট কামড়ে ঠোঁট ফোলানো থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা, দেখে নিয়েই চোখ নিচু করে ফেলেছে, এখন মনে-মনে দেখছে, গুনছে তেরো ক্কে তেরো, তেরো দু গুণে ছাব্বিশ, তিন তেরং উনচল্লিশ, চার তেরং বাহান্ন...নামতা পড়ছে। মনে মনে। কতক্ষণে থামে, কতক্ষণে। মেয়েদের অশ্রুপাতের সামনে পুরুষরা খুব অসহায়, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রস্তুত বোধ করে। বিশেষ করে সেই অশ্রুর পেছনে যখন তাদের কোনও অবদান থাকে না।

১৪

একটু পরে চোখ মুছে অমৃতা বলল—আপনি কবে সিঙ্গাপুরে ফিরছেন?

অরিন্দম বলল—কেন? এতই গোলমাল করছি না কি?

—এত উপকার করছেন আর বলব গোলমাল? আমাকে এতটাই অকৃতজ্ঞ ভাবলেন?

—তা নয়, অমৃতা কিন্তু আপনার মনে হতে পারে কেন নিজের কাজ ছেড়ে এতদিন এখানে পড়ে আছি। তা ছাড়া আপনার এই রকম সময়ে আমি ফাজলামি, ফাজলামিও না, ছ্যাবলামি করে যাচ্ছি ক্রমাগত।

—ছ্যাবলামি-টামি আমার মনে হয়নি। ভালই তো আপনি আবহাওয়াটাকে হালকা করে দেন। সব সময়েই যদি মনে রাখতে হয় আমি একটা বিপদে পড়া মেয়ে, যাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে, তা হলে তো পাগল হয়ে যাব। তবে প্রথম প্রশ্নটা কৌতূহল থেকেই করেছিলাম। মানে কী করে অত ছুটি পাওয়া সম্ভব।

—ও চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি অমৃতা।

—সে কী? কেন?

—কেন আপনি জানেন না, লাবণি বলেছে অমৃতা ফিরে না এলে সে বিয়ে করবে না। তা ছানা সিঙ্গাপুর-টুর-এও সে যাবে না। অচেনা জায়গায় একা পেয়ে তাকে যদি আমি গুম করে ফেলি।

অমৃতার মুখে হাসি, তার পরেই সে অন্যমনস্কভাবে বলল—লাবণি? লাবণি আমাকে এত ভালবাসত বলে তো জানতাম না! আমার আজকাল পুরনো কথা বেশি মনে পড়ে না, তবু এটুকু মনে আছে যে আমার বেশি বন্ধুত্ব ছিল দোলার সঙ্গে। আর শম্পার সঙ্গে, শম্পা অবশ্য য়ুনিভার্সিটির গ্রুপ না। ওরা কেমন আছে, কী করছে, বিশেষত শম্পা...

—আমাকে ঠিকানা দিন, খবর এনে দেব। দোলা ভালই আছে। সেদিন দেখলাম একটি কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে ব্লু-ফক্স থেকে বেরোচ্ছে!

অমৃতা চুপ করে গেল।

দোলা? দোলা? দোলা কেমন করে? অমৃতা-অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান হল না, অথচ দোলা, অমৃতার ভক্ত-বন্ধু কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে ব্লু-ফক্স থেকে বেরোয়? আর লাবণি, যে লাবণির সঙ্গে য়ুনিভার্সিটিতে এসে মোটে দু বছরের কাছাকাছি সময় ভাব, সে ভাব খুব গভীরও নয়, সে-ই কি না চিতোরগড়ের রানার মতো প্রতিজ্ঞা করে বসল? লাবণির চেহারাটাও তার এখন ভাল করে মনে পড়ছে না। চোখগুলো খুব বড় বড়, সুন্দর, চোখ দুটোকে খুব সাজাতও লাবণি। হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে, দোলার মতো নাদুসনুদুস নয়। স্লিম চেহারার মেয়ে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সেই লাবণি তার ফিয়াঁসে এই ভদ্রলোককে রহস্য-সমাধান করতে দিয়েছে? এমনই তার জেদ যে এই ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরের চাকরিটা ছেড়েই দিলেন। আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তবু তো লাবণিকে সে ভাবে ভালবাসতে পারছে না সে, দোলাকে যে ভাবে বা শম্পাকে যে ভাবে...। ভালবাসা তা হলে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে জন্মায় না? একটা মানুষ মানুষ হিসেবে ভাল বলে নিজেকে প্রমাণ করলেও না? তোমার কুশলের জন্য সে উৎসুক, উদ্বিগ্ন, খানিকটা আত্মত্যাগ। হ্যাঁ আত্মত্যাগই তো করছে লাবণি নামের একটি মেয়ে অমৃতা নামের আরেকটি মেয়ের জন্য, তবুও আসে না সেই অন্তঃস্রোত, সেই তুমুল টান যা একটি মানুষকে আরেকটি মানুষের কাছে এনে দেয়! শুধু নারী-পুরুষ না, নারী-নারী, বা পুরুষ-পুরুষ সম্পর্কেরও এই-ই কি শেষ কথা? কত উপকার করছেন তার এই ভদ্রলোকও। মোটামুটি সুপুরুষ, চমৎকার ব্যবহারও। মা-বাবার খবর-চিঠি নিয়ে আসেন। বন্ধুবান্ধবদের খবরাখবরও রাখেন। চাইলেই দেন, যদিও কেন যেন অমৃতা বন্ধুদের খবর জানতে চায় না, এক ঝটকায় সে যেন চলে গেছে কোনও চতুর্থ মাত্রার জগতে যেখান থেকে এদের কতকগুলো খেলনা-পুতুল, বড় জোর বালক-বালিকা বলে মনে হয়। সে যাই হোক এই সুশিক্ষিত, সুপুরুষ, সজ্জন, সুরসিক যুবকটি আসবে বলে সে কি পথ চেয়ে থাকে? তেমন কোনও আগ্রহ জন্মায়নি তো এঁর সম্পর্কে? সে কি তার সুপার-ইগো তাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছে বলে? সাবধান। সাবধান অমৃতা ভুলো না ইনি তোমার ক্লাস-বান্ধবী লাবণির বাগদত্ত! ভুলো না তুমি বিবাহিতা, সন্তানসম্ভবা! ভাল লাগা মানেই তো ভালবাসা নয়। কত বর্ণচ্ছায় ভালোবাসা বা ভাললাগা কথা দুটোর। বন্ধুর স্বামীকেও তো ভাল লাগতে পারে, সেটা প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের মতো নয় মোটেই। কিন্তু এটা ঠিক এই লালটু ঘোষ-এর জন্য সে কখনও পথ চেয়ে থাকে না। বাবা-মার চিঠি বা বার্তা আনবেন বলেও না।

আর একটা অদ্ভুত কথা, সে খুব খারাপ হাতে পড়েছিল বটে, তার শ্বশুর শ্রীলশ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী যিনি বরাবরই গুপ্তভাবে প্রতিকূল ছিলেন, তার শাশুড়ি সুষমা যিনি নিজেকে ক্রমাগতই বিষমা বলে প্রতিপন্ন করলেন, সর্বোপরি তার সেই অরিসূদন নামক স্বামী, যে শেষ পর্যন্ত পত্নীসূদন হয়ে দেখা দিল, এরা সবাই মিলে তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি একটা অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল। কেউ ছিল না তখন। কেউ জানত না, সে নিজেই জানত না এমন একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে! এ যেন ঘুমের মধ্যে কাউকে খুন করে ফেলা। তফাত এই যে কাউকে ঘুমের মধ্যে খুন টুন করলেও প্রমাণ থেকে যায়, প্রমাণ থেকে খুনি ধরা পড়ে, যদি পুলিশ ইচ্ছা করে, শাস্তিও হয় যদি আইন-আদালত

ইচ্ছা করে, কিন্তু একটি মেয়ে চার মাসের গর্ভিণী তার গর্ভপাত হয়েছে এবং সে তাতে মারা গেছে, এই পরিস্থিতিতে খুব শক্তপোক্ত শক্তিশালী সংকল্পে অটল কেউ না থাকলে কিচ্ছু করার থাকে না। তার বাবা-মা আদৌ এ জাতীয় লোক নন। কিন্তু তার পর থেকে, ক্লোরোফর্ম দিয়ে জোর করে অজ্ঞান করে সেই মেয়েটিকে মিথ্যা কথা বলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই যে নার্সিংহোমে নিয়ে এল অমনি কে বা কারা যেন তার সমস্ত দায় তুলে নিল নিজেদের কাঁধে। কারা যেন চারদিক থেকে, দশ দিক থেকে বলে উঠতে লাগল—না না, এ সব বাজে, এ সব মিথ্যা। অমৃতা, অমৃতাই। অমৃতা...অমৃতা। অমনি অমৃতার জন্য এসে গেলেন সিস্টার মাধুরী সেন, এসে গেলেন ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর। এসে গেলেন শিবানী মাসি, তারপর এই লালটু ঘোষ, এখন শুনছে এর পেছনে তার য়ুনিভার্সিটির বন্ধুরাও ছিল। এইভাবেই সব এসে যাবে। এসে যাবে যখন যা দরকার। এমন নয় যে সে প্রত্যাশা করে বসে আছে। কিন্তু সে নির্ভাবনায় নির্ভীক চিত্তে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কোনও কিছুর জন্যেই আগ বাড়িয়ে কারও কাছে হাত পাততে যাচ্ছে না।

মাত্র একজনের কাছেই সে আশ্রয় চেয়েছিল। তিনি শিবানী মাসি। চাইতেও হয়নি—'মাসি' বলে একটা ডাক দিয়েছিল শুধু। কী ছিল সেই ডাকে? কাতরতা? আর্তি? প্রার্থনা?—কে জানে! কিন্তু কথা সব বললেন ডক্টর কার্লেকর এবং মাসি হাট করে খুলে দিলেন দরজা, বাইরের এবং ভেতরের। এখনও পর্যন্ত সে মাসিকে তার ভরণ-পোষণের জন্য মা-বাবার পাঠানো একটা টাকাও নেওয়াতে পারেনি।

—আমার অনেক আছে অমি। কোনও অসুবিধে নেই। তুই যদি আমার মেয়ে হতিস! মা-বাবারও তো ব্যাপারটা খারাপ লাগবে!

—ঠিক আছে ওঁরা যা পাঠাচ্ছেন নে, নিয়ে রাখ। কখন কী দরকার পড়ে তার ঠিক কী? তোর নিজের দরকার হতে পারে।

এই মাসিকে সে ছোট্ট থেকে ভালবেসে এসেছে। বালিকা হিসেবে এসেছিল মানিকতলার বাড়ি থেকে। উনি ডেকে ডেকে আলাপ করলেন মিল্‌ক-বুথে।—তোমরা নতুন এসেছ না? কী নাম তোমার? অমৃতা? ও মা! কী সুন্দর নাম!

শিবানী মাসির একটা মেয়ের শখ ছিল খুব। প্রত্যেক মা-ই বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা মেয়ে চান, যাকে দিয়ে যাবেন তাঁর সুখ-দুঃখ-অভিজ্ঞতা-অনুভূতির উত্তরাধিকার। মেয়েদের জীবনটা তো অদ্ভুতই। এক জায়গায় বড় হয়। একরকম পরিবেশে, ধ্যানধারণায়, তারপর তাকে চলে যেতে হয় অন্য পরিবেশে, অন্য পটে, বারবার কত ভূমিকা বদল! মায়েদের গোপন বাক্সে বাক্সে ঝুলিতে ঝুলিতে ভরা থাকে সেই সব।

অমৃতার মা একদিন এক গাঢ় দুপুরে তাকে বলেছিলেন—বাবা! বাবা যে আমাকে কী ভালবাসতেন তুই ধারণা করতে পারবি না খুকি! সেই বাবা আমার ডাক্তারের চেম্বারে আমাকে বসে থাকতে দেখে বেরিয়ে চলে গেলেন। একবারও মনে হল না—কেন? কার জন্য কেন এসেছিলেন। এটা কীরকম জানিস? তুই মনে করছিস সময়টা সকাল, আশপাশে যারা ঘুরছে তারা তোর চেনাজানা ভাল মানুষ ভদ্রলোক, হঠাৎ দেখলি, না, তুই ভুল করেছিস, ওটা আসলে সন্ধে, আশপাশের লোকগুলো চেনা তো নয়ই, ভদ্রলোকও নয়, ওরা সব গুণ্ডা, খুনি, মস্তান...বাবা আমায় সারাজীবন আর মায়ের কোলে ফিরতে দিলেন না,...বলতে বলতে মা নিঃশব্দে কেঁদেছিল।

অমৃতা তখন পনেরো ষোলো বছরের হবে, তার কেমন গা ছমছম করে উঠেছিল। সে বলেছিল—অমন চুপ করে থাকো কেন মা? হাউ হাউ করে, শব্দ করে করে কাঁদো না। ওই জন্যেই তোমার অত বুকে ব্যথা হয়।

—ওভাবে কাঁদতে পারি না খুকি, যদি তোর বাবা শুনতে পান?

—কেন, বাবা শুনলে কী হবে?

—উনি চান না আমি এ সব নিয়ে আর ভাবি। উনি তো খুবই অপমানিত হয়েছিলেন।

একজন মেয়ে তার বাবা-মার কথা ভেবে, তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদবে, তাতেও তার স্বামী আপত্তি করবেন? মা-বাবার সঙ্গে যাঁর জন্যে চিরবিচ্ছেদ। কী অদ্ভুত কথা। এমন করলে তো বুক ফেটে মরে যাবার কথা।

মায়ের বিয়ের সে কী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। দু বাড়িতেই আপত্তি। তার বাবা বিশ্বজিৎ মাকে আল্টিমেটাম দিলেন। তিন দিনের মধ্যে মনস্থির করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে জীবনে আর দেখা হবে না। কী সঙ্কট একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ের! বেরিয়ে তো এলুম এক কাপড়ে। উঠব কোথায়? খাব কী? শ্বশুরবাড়িতে সাত দিনের জন্যে জায়গা হয়েছিল চাকরদের থাকার ঘরে। ওঁরা ব্রাহ্মণ তো, আর আমরা সোনার বেনে! সাত দিনের মধ্যে বিশ্বজিৎ চাকরি ঠিক করলেন, একঘরের এক বাসাবাড়ি তাঁর কোনও বন্ধু জোগাড় করে দিল। তারপর? সংসার করতে গেলে কী লাগে কোনও ধারণা নেই সে মেয়ের। ঘর নোংরা হচ্ছে ঝাঁটা চাই, রান্না করতে হবে? স্টোভ চাই, কেরোসিন চাই, দেশলাই চাই। রান্নার বাসন, খাবার বাসন, চাল, ডাল, তেল নুন, মশলা কিছুই জানে না সেই বড়লোকের দুলালী। তখন পদে পদে মতান্তর, মনান্তর। ঠেকে ঠেকে ঠেকে যবে শেখা হল সব তখন সীমার সীমা পেরিয়ে গেছে। হার্টের অসুখে জবুথবু। এক অসহায়, অকর্মণ্য সুন্দরী, যাঁকে স্বামীর রান্না ভাতে-ভাত, কচি মেয়ের রান্না ডাল-ভাত খেতে হয়। অমৃতার দাদু খুবই ধনী ছিলেন, দুই মেয়ে, তিন ছেলে, আজও পর্যন্ত কেউ এই অসহায় ছোট মেয়েটিকে কোনও সাহায্য করেননি। দাদুর ছেলেরা ছোট বোনের প্রাপ্য বলেও কিচ্ছু দেননি, কিচ্ছু না। স্বর্ণবণিকের মেয়ে সারাজীবন নিরাভরণ রইলেন।

কত কথা! কত অভিজ্ঞতা! এ সবই দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে মেয়েকে। আর কাউকে দেওয়া যায় না। ছেলেকেও না। শিবানী মাসি হঠাৎ একদিন বললেন—অমৃতা, কাউকে কখনও বিশ্বাস করবি না।

—কাউকে বলতে? স্বামীকে যে বিশ্বাস করা যায় না সে তো শিখেই গেলাম মাসি।

—হ্যাঁ তাই বলছিলাম...চুপ করে গেলেন মাসি। হয় তো ঝুলিতে কোনও গুপ্ত কথা আছে, কোনও একদিন বলবেন, বলতে পারবেন অমৃতাকে, বলে মুক্ত হবেন।

এখন বলেন—মেথিফোড়ন দিয়ে চাটনি রাঁধবি। আর লুচির ময়দায় একটু জোয়ান মিশিয়ে নিবি—অম্বল হবে না, খেতেও ভাল হবে। ধোঁকার ডাল বাটায় একটু কুমড়ো কি একটু বাঁধাকপি কি একটু ফুলকপির ফুল বেটে মিশিয়ে নিই আমি, ধোঁকার টেস্টই আলাদা হয়ে যায়।

—তুমিও যেমন মাসি, আমি আর ধোঁকা রেঁধেছি!

সে যখন নতুন শ্বশুরবাড়ি যায় তখনও কতকগুলো টিপস দিয়ে ছিলেন মাসি। খিচুড়িতে নুন আর মিষ্টি একেবারে সমান পরিমাণে দিতে হয়। ডাল চালের চেয়ে একটু কম দিই আমি। অপূর্ব টেস্ট হবে দেখবি। যে সব রান্নায় ঘটিরা মিষ্টি দেয় না, আমরা ঢাকাই বাঙালরা সে সবেও কিন্তু মিষ্টি দিই, খুব সামান্য, ফোড়নের মতো, তাইতে রান্নায় অত লাবণ্য আসে।

১৫

অরিন্দম ঘোষ অনেকক্ষণ বেরিয়ে এসেছে। এবার অফিস যাবে। মনটা কেন কে জানে কেমন খিঁচড়ে আছে। আকাশটারই মতো। এমনিতে সে খুব রসিক, সরল-তরল লোক। কিন্তু মেজাজ একবার খিঁচড়ে গেলেই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। তার মা বলেন—'তুই হলি গুমো রাগী। রাগলি যদি তো গুম হয়ে গেলি একেবারে।' এখন অরিন্দমের সেই অদ্ভুত বিরল রাগটা হয়েছে। মুখটা ফুলে গেছে। কালো দেখাচ্ছে পুরো মানুষটাকে, বিশেষত মুখটা। গাড়িটা যখন তার অফিসের

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, নামতে নামতে সে শুনতে পেল কে যেন বলছে—'ঘোষ এল।' আরও খিঁচড়ে গেল মনটা। কেতাদুরস্ত অফিস। দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে সেলাম করে। এয়ার কন্ডিশন্‌ড, বিরাট হলে কর্মরত করণিককুল। কাচে ঢাকা নিজস্ব অফিসে বসে সে ড্রাফ্‌টসম্যানদের করা নকশা দেখে, ভুলগুলো দাগায়, কিছু বদলাতে হলে কম্পিউটার চলে। তার নিজস্ব স্টেনো আছে। টেবিলে দুটো ফোন। এমত অবস্থায় একটু দেরি করে অফিসে এলে কোনও অচেনা-অজানা কণ্ঠ যদি সাবেক কলকাতাই কায়দায় বলে—'ঘোষ এল'। তাহলে মেজাজ খিঁচড়ে যাবে না।

এইরকম খিঁচড়ানো মেজাজ নিয়েই সে বিকেলবেলা লাবণিদের বাড়ির পথ ধরল। ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে ছিল বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় জুতো সুদ্ধ মায়ের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মা বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা দেখবে। জ্বলে যাবে একেবারে। —আবার তুই জুতো পরে আমার বিছানায় শুয়েছিস।

—সিগারেটও খেয়েছি। চারদিকে ছড়ানো সিগারেটের টুকরোগুলো আঙুল দিয়ে দিয়ে সে দেখিয়ে দেবে।

ব্যস লেগে যাবে তুমুল ঝগড়া মায়েতে-ছেলেতে। একটু পরেই আসবে বাবা, বলবে—তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন বোঝো!

—তাই বলে ও বৃষ্টিভেজা জুতো পরে আমার বিছানায় শোবে? শুতে পারত নিজের বিছানায়। ফুঁকত নিজের ঘরে। আমাকে কেন প্যাসিভ স্মোকিং করানো!

বাবা জানলাগুলো খুলে দিতে দিতে বলবে—এই তো ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে, নিকোটিন, ক্যাডমিয়াম সব, স-ব। কেন যে এগুলো করিস লালটু?

—করো তো সবে গোঁফ গজানো ফুলটুসদের পড়ানোর চাকরি। আমাদের রেসপন্সিবিলিটির তোমরা কী বুঝবে?—আরও কালো মুখে সে মায়ের বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলবে—রাতদিন তো খবরের কাগজগুলো তোমাদের ফাঁকিবাজির নিন্দে করছে। তবু তো তোমাদের শিক্ষা হয় না?

—তুই, তুই এ কথা আমাদের বললি?—'আমাদের'টার ওপর জোর দিয়ে বলবেন তার লেকচারার বাবা-মা, না, বাবা আবার রিডার হয়েছেন। ভীষণ আহত তাঁদের গলা।

—বলবে না কেন? গোল্লায় গেছে যে! এক কথায় অমন সোনার চাকরি যে ছেড়ে চলে আসে তার আবার রেসপন্সিবিলিটির গুমোর!

এইরকম একটা সিন হলে তার ভেতরকার চাপা ক্রোধের বজ্রাগ্নি মুক্তি পেত।

কিন্তু তা হবার নয়। আজ আবার সেই ফাজিল ছোকরা, কী যেন নাম! অবন না পবন। লাবণির ভাই—ঢলো ঢলো লাবণি অঙ্গে অবন বহিয়া যায়! সেই ছোকরার জন্মদিন। সে গেলেই ফিচ ফিচ করে হাসবে—'জামাইবাবু, আপনি অরিন্দমদা হবেন কবে?' ফক্কড় ফড়নবিশ কোথাকার। তার জন্য আবার একটা 'সেরা সন্দেশ' কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে। জন্মোদিনের উপহার। পছন্দ হলে হয় এখন। বড় হয়েছে তো যত্ত বাজে কমিক্‌স্ পড়ে, আর টিভি দেখে। হয়তো আশা করবে লেটেস্ট হিন্দি ছবির ভিডিও, কিংবা 'জীবনমুখী'র সিডি। করলে করুক, সে মনে করেছে একটা চোদ্দো বছরের ছেলের জন্য 'সেরা সন্দেশ' একটা সেরা উপহার। কত ঘটাপটা আবার করছে এরা একটা চোদ্দো বছরের দামড়ার জন্যে কে জানে! হয়তো বেলুন আর শিকলি ঝুলিয়েছে অবিকল ক্রিশ্চান কায়দায়, আর সেই 'হ্যাপি বার্থ ডে' গাইতে গাইতে কেক-কাটা? উঃ হরিব্‌ল।

গোয়াবাগানে গোড়ালির ওপর অবধি জল দাঁড়িয়েছে। হয়ে গেল! ফিরে যাওয়া যাক। টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া যাবে জলের জন্যে যেতে পারা যায়নি। বর্ষাকালে জন্মাও কেন বাবা? যদি জন্মালেই তবে উঁচু রাস্তায় বাস করলে না কেন? গাড়িটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে, প্রায় বনেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই ছোকরা, যার নাম অবন।

—গামবুট এনেছি আপনার জন্যে অরিন্দমদা, রামধনিয়া তখন থেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে বসে পরে নিন। গাড়িটা কর্নওয়ালিসেই থাকুক।

—প্রাণ জল করে দিলে একেবারে। গামবুট নিয়ে কেউ কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকে জীবনে এই প্রথম দেখল শুনল অরিন্দম। মনে হল 'সেরা সন্দেশে'র প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলে—এই নাও হে ক্ষৌণীশ গামবুটে এটা জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি যাও।

বলল না অবশ্য। প্যান্ট হাঁটু অবধি গুটিয়ে ঝপাস করে জলে নামল।

—এই এই কী করছেন কী করছেন... বলতে বলতে তার নিষ্ক্রমণ ও গঙ্গাবতরণ হয়ে গেছে।

—গাড়িটা থাকবে তো?

—থাকবে না তো যাবে কোথায়?

—কোথায় যাবে আমি কি জানি! তোমাদের গোয়াবাগান পাড়া তোমরা জানো।

—ইস্‌স্‌ অরিন্দমদা, আপনি বকুলবাগানের ছেলে বলে গোয়াবাগানকে এমন 'দূর ছাই' করছেন? ভেবে দেখতে গেলে কিন্তু গোয়া অর্থাৎ গো মানে গোরু, বকুলের থেকে অনেক গুণ উপকারী।

মনে হল ছোকরা, একটি আস্ত গোরুর রচনাই তাকে শোনাবার যোগাড় করছে।

—চলো, চলো, নিজে তো দিব্যি গামবুট পরেছ।

—বা রে! আপনাকেও তো এনে দিলুম একজোড়া। আমাদের বাড়িতে মোট পাঁচ জোড়া আছে। ব্যাঙে ইয়ে করলেও জল দাঁড়িয়ে যায় কি না।

ছোকরার শালীনতা জ্ঞানে আপ্যায়িত হওয়া গেল। সে জিজ্ঞেস করল—পাঁচ জোড়া কে পরে?

—কেন? আমি, বাবা, দিদি, বড়দি এলে বড়দি আর মা।

—মা-ও গামবুট পরেন?

—পরতে হলে হয় বইকি!

হবু-শাশুড়ির গামবুট-পরা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই অরিন্দমের এতক্ষণের গুমো রাগ হাসির তোড় হয়ে বেরিয়ে এল। এবং হবু-জামাই-শালা এইভাবে হাসতে হাসতেই বাড়ি ঢুকল। হবু-শাশুড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন

—এত হাসি কীসের?

উত্তরে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল—আপনিও গামবুট পরেন?

প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেননি ভদ্রমহিলা। তারপর দমকা হাসির তোড়ে তিনিও হাসতে হাসতে কাশতে আরম্ভ করে দিলেন।

লাবণি ছিল এসব থেকে দূরে। সে নিজেকে সহজলভ্য করে তুলতে চায় না। বিয়ের আগে অরিন্দমের বাড়ির একজন হয়ে যাওয়াটাও তার খুব পছন্দ নয়। কেন? তা সে বলতে পারে না। বিয়ের আগে থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মাইডিয়ার সম্পর্ক, শালার সঙ্গে গলাগলি—এসব থেকে লোকটা যেন কেমন সস্তা হয়ে যাচ্ছে না? খুব বড় নাকি চাকরি করে, প্রথম দিকের সিঙ্গাপুরি চাকচিক্যে আর একেবারে প্রাথমিক সৌজন্য-বিনিময়ের সময়ে তেমনটাই লেগেছিল। অভিজাত, দূরের মানুষ, দামি মানুষ। নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ কি না এটা নিয়ে ভয়-ভাবনা শুরু হল অমৃতার ব্যাপারটার পরে। কিন্তু ওই ব্যাপারটায় অরিন্দমের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি, তার সক্রিয়তা, সপ্রতিভ সংবেদনশীল আচার-আচরণ তাকে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে আরও কিছু চেয়েছিল। সকলকে এড়িয়ে একটা গোপন চাউনি, একটু হাসি যেটা লাবণি, শুধু লাবণিরই জন্য, এমন কিছু কথা যা তাকে রোমাঞ্চিত করবে, যা তাকে জানাবে অরিন্দমের কাছে সে কত দামি, কত বিশেষ! মধ্যযুগীয় বা রোমান্টিক কায়দার প্রেমনিবেদন সে সম্বন্ধ করে বিয়ের মধ্যে আশা করেনি। কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে যে লোকটা সিঙ্গাপুর থেকে এল, সে হঠাৎ যেন দুম করে সবার হয়ে গেল। তিলকের, চঞ্চলের, নিলয়ের, দোলার, শর্মিষ্ঠার এবং তার বাবার, মা'র, অবনের, বড়দি আর সুজিতদা যখন বাঙ্গালোর থেকে আসবে তখন হয়তো এমনি সাবলীলভাবে তাদেরও হয়ে যাবে। এটাই তার নতুন ভাল-লাগায় কেমন একটা স্যাঁতা ধরিয়ে দিয়েছে।

লাবণি একটা উজ্জ্বল হলুদ লাল সাদা কালোর নতুন বাঁধনি পরেছিল। অবন তার জন্মদিনে নতুন জামাকাপড় পরুক না পরুক, তার দিদি পরবেই। চুলে সে সাধারণত দুটো বিনুনি করে, কাঁধ ছাড়িয়ে আর একটু পর্যন্ত তার ঘন চুলে বেশ মোটা মোটা দুটো বিনুনিই হয়। আজ কিন্তু সে একটা ক্লিপ দিয়ে আলগাভাবে চুলটা আটকে রেখেছে। চোখে কাজলটানা, ওপর পাতায় ম্যাসকারা, আই শ্যাডো, অথচ ন্যাচারাল রঙের লিপস্টিক মেখেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে তার মনে হয়েছিল সে খুবই মূল্যবান, দামি মণিমুক্তোর মতো। তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। না অরিন্দমের জন্য নয়। বৃষ্টি দেখতে। নিজের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে তার ভীষণ ভাল লাগে। সব বাড়িঘর রাস্তা বৃষ্টির প্রাবল্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া, হাওয়ার তোড় অনুভব করা যায় জানলার ভেতর থেকেও। লোকেদের ছাতা বেঁকে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, ছোট ছেলেমেয়েরা পেছনের বস্তি থেকে এসে জমা জলে ঝাঁপাই ছুড়ছে।

এমন সময়ে অবন এসে বলল—কই রে দিদি, অরিন্দমদা তো এখনও এল না?

—এত বৃষ্টিতে কী করে আসবে?—বলে জানলা থেকে সরে এল লাবণি।

—তোর সাজগোজ যে বৃথা যাবে রে!

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন আমি গতবার তোমার জন্মদিনেও এমনি বা এর চেয়েও বেশি সেজেছিলুম। তখন তোমার ওরিন্দমদা পিকচারে ছিল না।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন দিদি—গত ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি তুই জানলার গারদ ধরে দাঁড়িয়ে আছিস।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন বৃষ্টি হলেই বাড়ি থাকলে আমি এমনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি। বরাবর।

—ঠিক আছে তুই নয়, আমিই ওয়েট করছি। কী আনবে বল তো ওরিন্দমদা আমার জন্য? নিশ্চয়ই ভেবেছে আমরা খুব লোকজন নেমন্তন্ন করেছি, একদিকে উপহার রাখবার টেবিল। বাবা-মা সাজুগুজু করে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দি সিনেমার মতো আসুন বসুন হালুম হুলুম করছে। আর আমি নতুন সাফারি-স্যুট পরে এক হাতে বেলুন আর এক হাতে এয়ারগান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হেভি সাজগোজ করে আসবে ব্যাটা, দেখিস! ঘিয়ে রঙের শার্ট, চিকিমিকি টাই, নেভি ব্লু, না না গ্রে স্যুট, চকচকে জুতো, সবসুদ্ধ হুড়ুম করে জলে পড়ে যাবে। কেন বল তো? আমি পাশ থেকে একটু ছোট্ট করে ল্যাং মারব।

—এই অবন, ভাল হবে না বলছি—লাবণি চড় তোলে।

তার কথায় কান না দিয়ে অবন বলল—তারপর কাদা মাখামাখি প্যান্তা-খ্যাচাং সেই পান্তভূতকে আমি তোর সামনে কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দোব। বলব—সেলাম ঠোকো মেমসাবকো...আভভি ঠোকো!

এইসব বদমায়েশি করতে করতে অবন ঘর থেকে চলে গেল এক সময়ে। লাবণির কানে তখনও লেগে আছে—'সবসুদ্ধ হুড়ুম করে পড়ে যাবে জলে, কেন বল তো? আমি পাশ থেকে ছোট্ট করে একটু ল্যাং মারব।' তারপরে নাকি ও কাদামাখা সেই পান্তভূতকে কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দেবে তার সামনে, সেলাম ঠুকতে বলবে। 'সেলাম ঠোকো মেমসাবকো।'

ঠাট্টাই। কিন্তু বিশুদ্ধ ইয়ার্কি কী? অবন কি তাহলে বোঝে তার আশা আর আশাভঙ্গ? সে কী চায়? কী চাইতে পারে তা বুঝে ফেলল চোদ্দো বছরের একটা ছেলেমানুষ যে এখনও স্কুলের গণ্ডিই পেরোয়নি, অথচ একত্রিশ বত্রিশ বছরের ওই ধাড়ি বিদেশে চাকরি করা লোকটা বুঝল না! আশ্চর্য!

তবে লোকটা যখন ঝপাস ঝপাস করে এক গোড়ালি জল ঠেঙিয়ে শেষ পর্যন্ত এল, অবনের কাঁধে হাত দিয়ে, প্রবল হাসতে হাসতে, দৃশ্যটা তার ভালই লাগল, নিজেকে অবশ্য সে বলল—দেখো কাণ্ড, আসছে যেন পাশের বাড়ির গুইরাম, হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা, কোনও একটা ইয়ে নেই। এই লোকের

সামনে অত বাঁধনি-টাঁধনি ম্যাসকারা-টারার দরকারটা কী? ভূশণ্ডির মাঠের পেত্নীর মতো তলায় একটা গামছা ওপরে একটা গামছা পরে চলে গেলেও ও ওই রকমই হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করবে। ডিফারেন্সটা ধরতে পারবে না। এই সময়ে সে শুনতে পেল নীচের সেই অট্টহাসি, অবন আর ওই লোকটা তো আছেই, তার ওপরে মা তার সেই বিখ্যাত প্লেন টেক-অফ করার মতো হাসিটা হাসছে। সম্মিলিত হাসির মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি হাসির আলাদা স্টাইল চেনা যাচ্ছে। হাঁচির মতো হাসিও খানিকটা ছোঁয়াচে। তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে খানিকটা হেসে ফেলল, তারপরে গোপন চোখের জল মোছার মতো করে হাসিটুকু মুছে ফেলল।

অরিন্দমের পা ধোওয়া, গোটানো প্যান্ট নামানো, ভিজে জবজবে জুতো মোজা পাখার তলায় দাঁড় করিয়ে শুকোতে দেওয়া, এক দফায় শরীর ওম্ করার চা খাওয়া, এ সমস্ত হয়ে যাবার পরও যখন লাবণি নামল না, লাবণির মা বনানী তখন মনে মনে একটু শঙ্কিত হলেন। বেশিরভাগ মা-ই তাঁদের মেয়েদের চেনেন। পড়া বইয়ের মতো আগাপাশতলা চেনা নয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো চেনা। লাবণি যে সম্প্রতি অরিন্দমের ওপর একটু বিরূপ এটা তিনি কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কেন সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না। অরিন্দম ছেলেটিকে তিনি যতটা প্রত্যাশা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি ভাল লেগে গেছে তাঁর। এত নেটিপেটি, ঘরের ছেলের মতো আচার-আচরণ, সবচেয়ে চমৎকার হল তার রসবোধ, এখনই সে তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক রসিকতাগুলোতে দিব্যি যোগ দিতে পারছে। হবু-শ্বশুরবাড়ির মধ্যবিত্ত পুরনো পাড়ার পুরনো পরিবেশে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। মনেই হয় না এই ছেলে এখান থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি করে আবার আমেরিকার ডিগ্রি নিয়েছে, সেখানে কিছুদিন চাকরি করে সিঙ্গাপুর চলে এসেছে। অবশ্য, একটা জিনিস থেকে ছেলেটির মনটা বোঝা যায় খুব। বাবা-মা দুজনেই অধ্যাপক। এবং এই এক ছেলে তাঁদের। বাবা-মা'র জন্যে যে ছেলের এত টান, অন্যদের জন্যও তার টান থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য এক ছেলের বউয়ের অনেক সমস্যা হয়, এটাও তাঁর জানা আছে, কিন্তু থাকবে তো সিঙ্গাপুরে। তাঁর বড় জামাইও এমনি এক ছেলে, কিন্তু থাকে বাঙ্গালোরে। সিঙ্গাপুরের চাকরিটা অরিন্দম ছেড়ে দেওয়ায় তিনি একটু ঘাবড়ে গেছেন। মেয়েকে তা হলে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে হবে! কে জানে তাঁরা কেমন লোক! বাইরে থেকে তো অতি ভদ্র সজ্জন বলে মনে হয়। এই যে বিয়ের আগেই লাবণিদের পরিবারের সঙ্গে অরিন্দমের এত মাখামাখি, এটা কি ওঁদের সায় ছাড়া সম্ভব ছিল? ওঁদের সঙ্গে খুব একটা আসা-যাওয়া না থাকলেও ফোনে কথা হয়। ওঁরাও নিজেদের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে ছেলের ওপর খবরদারি করবার ইচ্ছে বা উপায় কোনওটাই নেই মনে হয়।

কিন্তু দুঃখটা এই, বেশিরভাগ সময়েই মায়ের পছন্দে মেয়ের পছন্দে মিল হয় না। মা চান ছেলে, মেয়ে চায় পুরুষ। মা দেখেন শীল, মেয়ে দেখে রূপ। নিজের মায়ের অনুগত একটি অতি ভদ্র বিনয়ী অমায়িক ছেলেকে যে একটি মেয়ের পছন্দ হবেই তার কোনও মানে নেই। বেশিরভাগ সময়েই হয় না। কেন কে জানে! কী স্বপ্ন, কী প্রত্যাশা থাকে মেয়ের মনে যা তার নিজের মায়ের অনুগত পুরুষ পূরণ করতে পারে না?

বনানী বুঝছিলেন—অরিন্দম যত তাঁদের কাছাকাছি হচ্ছে, লাবণি তত দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝছিলেন হৃদয়ের একটা অস্পষ্ট বোধ দিয়ে। মগজ দিয়ে নয় মোটেই। তাই তিনি একটু উদ্বিগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন। কী করে অরিন্দম তাঁর মেয়েকে সন্তুষ্ট করবে তার জন্য অরিন্দমের থেকে তিনিই বেশি ব্যাকুল। আরে বাবা, আজকালকার দিনে একটা ভাল ঘরের ভাল রোজগেরে, স্বাস্থ্যবান, ডিগ্রিমান ছেলেকে জামাই পাওয়া কি সোজা কথা? আর এ তো আশার অতীত পাওয়া। বড় জামাই সুজিতকে তো তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। মুখের কাছটা কেমন বাঁদর-বাঁদর। মাথার চুল এখনই পাতলা হয়ে এসেছে। তার ওপরে এত গম্ভীর, এত অন্যমনস্ক যেন তার চেয়ে পণ্ডিত আর পৃথিবীতে কেউ নেই, শ্রাবণীর ক্রেডিট আছে এই লোকের সঙ্গে সে বারো মাস তিরিশ দিন ঘর করে। একেক সময়ে

তাঁর মনে হয় অরিন্দমকে দেখলে, তার সঙ্গে মিশলে শ্রাবণীর যদি অভিমান হয়? আমার বেলা এক টাক-মাথা পণ্ডিতকে জুটিয়ে দিলে, কী না মস্ত বিদ্বান, য়ুনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর! অ্যাসিস্যান্ট প্রফেসর নিয়ে কি ধুয়ে খাব? বোনের বেলায় বেশ রূপবান, সুরসিক, চমৎকার পছন্দসই জামাই জোগাড় হল। হতেই পারে। বনানীরও আসলে এমনি হয়েছিল। তাঁর স্বামী একটু বেঁটে, কালো, তাঁর তো শুভদৃষ্টির সময়ে কান্নাই পেয়ে গেছিল। পরের দুই বোনের বেলা বাবা-মা দিব্যি ফুটফুটে জামাই খুঁজে নিয়ে এলেন। অভিমানও নয়, রীতিমতো রাগই হয়েছিল তাঁর সে সময়টায়। মেজ বোনের বিয়ের বউভাত বা ফুলশয্যায় তিনি যানইনি, হিংসায়। ছোট বোনের বেলায় অবশ্য আরও একটু পরিণত হয়েছিলেন, কাজেই রাগ ঝাল অভিমান কাউকে বুঝতে দেননি। তবে এখন তো তাঁর মা-বাবার তিন জামাই এ বলে আমার দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ। মেজ ভগ্নিপতির সে রং কবে জ্বলে গেছে, মাথাটি ডিমের মতো। এত চকচকে যে তাতে মুখ দেখা যায়, লম্বা হলে কী হবে একটু কোলকুঁজো মতো হয়ে গেছে এখনই, ছোট জনের টাব্বুশ ভুঁড়ি, বেখাপ্পা বেমানান, তার বউই তার নাম দিয়েছে ভুঁড়িদাস। সে তুলনায় তাঁর স্বামী অনেক ভাল আছেন, শক্তপোক্ত গাঁটাগোট্টা, মাথায় পাকা চুল খুঁজতে হয়, এখনও ব্রাশ দিয়ে চুল টানতে হয়। আসলে যার ভাগ্য তার তার।

তিনি অরিন্দমকে খুব যেন হালকা সুরে বললেন—কী? একবার ওপরে গিয়ে দেখবে না কি! লাবুটার কত দেরি আর?

অরিন্দম একটু ইতস্তত করছে, অবনের দিকে তাকাচ্ছে দেখে তিনি এ-ও বললেন—যাও না, ওপরে ওদের ঠাকুমাও রয়েছেন, একটু দেখা করে আসবে অমনি। অবন তুই একবার তোর বাবাকে ফোন কর তো—কেন এত দেরি করছে? কাকিমাকেও করবি—বলবি জল নেমে গেছে। আর যেন দেরি না করে ওরা।

অর্থাৎ অবনকে তিনি ব্যস্ত করে দিলেন। ফোনটা একতলার বৈঠকখানা ঘরে আছে। ঠাকুমার উল্লেখে দোতলায় একা লাবণির কাছে একা অরিন্দমের যাত্রাটাও নির্দোষ দেখাল বেশ।

অরিন্দম যেতে যেতে বলে গেল—কী আর করবে, গামবুট পরছে বোধহয়।

আর একটু হাসি হল।

লাবণি অবশ্যই গামবুট পরছিল না। সে খুব যত্ন করে, অশেষ মনোযোগ দিয়ে নেল ফাইল করছিল। একবার এদিকে, আবার ওদিকে। নখগুলোকে আজ এই মুহূর্তেই ওকে সুগোল চিকন করে ফেলতে হবে যেন।

—কী ব্যাপার, লাবণি?

দোতলায় উঠলেই লাবণি-অবনের ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। দুদিকে দুটো সিঙ্গল খাট, মাঝখানে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল। সম্ভবত লাবণির মায়ের বিয়ের যৌতুক, এখন মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায়, সাজুনি মেয়ের ঘরে ট্রান্সফার্ড হয়েছে জিনিসটা। এই ড্রেসিং-টেব্‌লের সামনেই একটা টুলে বসে লাবণি নেল ফাইল করছিল।

—কী আবার ব্যাপার হবে?

—অনেকক্ষণ এসেছি। নামছ না! নীচে কত মজা হয়ে গেল।

—তা মজা করুন না। থামলেন কেন?

—আরে তুমি না এলে মজা হয়?

—কেন? আমি কি ক্লাউন? আপনার ইয়ার্কির পাত্র?

—রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে! কার ওপর? আমি কিন্তু কিছু করিনি, আমার ওপর নিশ্চয়ই নয়। অবন ঠাকুরের আজ জন্মদিন, তার ওপরও রাগ করা যায় না। তা হলে? তা হলে বাকি রইলেন মা বাবা আর ঠাকুমা। ঠাকুমা বেচারি নিজের ঘরে নিজের মনে আছেন, চোখে ভাল দেখতে পান

না। তাঁর ওপর আর কে রাগ করবে? তবে কি বাবা? উঁহুঃ, আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে বাবাদের সঙ্গে ঝগড়া হয় না। —এইবার ধরেছি ঠিক। মা, নয়?

—যান না, যান, আপনি আমার মাকেই বিয়ে করগে যান।—মুখ ফসকে রাগটা বেরিয়ে গেল। কথাটা বলেই লাবণি মনে মনে জিভ কামড়েছে। ছোঁড়া তীর আর বলা কথা তো ফেরানো যায় না, কী করে লাবণি? কী করে? একটা অত্যন্ত অভব্য, অমার্জিত, গর্হিত কথা বলে ফেলেছে একজন অল্প আলাপি ভদ্রলোককে। সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

অরিন্দম একটা মস্ত ধাক্কা খেয়েছিল। এ কি রে বাবা? এ কী ধরনের কথা! এ তো একটা নেহাত বাচ্চা ছেলেমানুষ! য়ুনিভার্সিটি ক্যান্টিনে যে লাবণিকে দেখেছিল একটি সহপাঠিনী মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন, অনেক নির্ভরযোগ্য, অনেক পরিণত মানুষের মতো লেগেছিল তাকে। আর আজ এ কাকে সে দেখল? নীচে মায়ের সঙ্গে বেশি গল্প করেছি বলে ঈর্ষা? এ তো সাঙ্ঘাতিক গোলমেলে ব্যাপার!

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল! লাবণি চোখ মুছতে মুছতে বলল,

—সরি, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

—কিন্তু লাবণি তোমার এ রকম অদ্ভুত রি-অ্যাকশান হল কেন?

—আই ডিডন'ট মীন ইট। প্লিজ ও-কথা আর তুলবেন না। আসলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে কদিন।

—কেন?

—অমৃতার জন্য—লাবণির অন্তরাত্মা বুঝে নিয়েছে একটা অভব্য, অযৌক্তিক আচরণকে কাউন্টার করতে একটা খুব মানবিক, ভব্য, যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে হবে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো আপনা-আপনিই হয়ে যায়। এটাকে বলা যায় স্বতঃক্রিয়া। অমৃতার জন্যে এই মুহূর্তে তার কোনও দুর্ভাবনা নেই। অমৃতার ব্যাপারটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে এখন। সয়ে গেছে। কিন্তু তবু সে কেমন করে যেন বুঝে গেল এই মুহূর্তে এই কথাটা বলা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

অরিন্দম বলল—কেন শুধু শুধু মন খারাপ করছ? অমৃতা ভাল আছে। এই তো আজই গিয়েছিলাম। দেখলাম খুব পড়ছে। পড়ে পড়ে ক্লান্ত একেবারে।

ও, ইনি আজই অমৃতার কাছে গিয়েছিলেন? কথার ধরন শুনলে মনে হয় প্রায়ই যান। অমৃতার কাছে যাওয়াটাই এঁর দস্তুর। নিয়মিত অতিথি একজন। বাঃ! অফিস ছিল না? অফিস কেটে অমৃতার কাছে গিয়েছিলেন? তারা যেমন ক্লাস-কেটে সিনেমা যায় কি বয় ফ্রেন্ড গার্ল ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মিলতে যায়? তা হলে এই জন্যই ইনি সিঙ্গাপুরের চাকরিটা ছেড়েছেন? অমৃতার কাছে ফ্রম টাইম টু টাইম যাবেন বলে? অমৃতার ব্যাপারটাতে ইনি আগ্রহী হলেন তার জন্য, সে লাবণি ভয় পেয়েছিল বলে, তাকে বোঝাতে যে ইনি একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ, আর এক অরিসূদন নন। তো সবাই মিলে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, মোটামুটি জানা গেছে যে অমৃতা এখন নিরাপদ। শিগগিরই তার কেস উঠবে। অরিসূদনের করা কেস। ব্যস, মিটে গেল। ইনি কেন নিয়মিত সেখানে যান? এঁর তো লাবণির কাছেই নিয়মিত আসার কথা।

কী আছে অমৃতার? ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী শর্মিষ্ঠা, সবচেয়ে সুন্দরী লাবণি, সবচেয়ে মজাদার ভাল লাগবার মতো মেয়ে দোলা। অমৃতা কে? অমৃতা কী? কেন প্রোফেসররা বেশির ভাগই অমৃতা-অমৃতা করেন? লম্বা, ফর্সা, কাঠ কাঠ চেহারা, তিন কোনা মুখ, চোখ মুখের এমন কিছু শ্রী-ছাঁদ নেই। হ্যাঁ এখন এটাই বলা যায় ক্লাসের সবচেয়ে দুর্ভাগা মেয়ে অমৃতা। এইটাই তার বিশিষ্টতা। তো এই দুর্ভাগ্যকে তো সে ভালই ব্যবহার করছে দেখা যাচ্ছে। একজন নামকরা ডাক্তার-সুদ্ধু একটা গোটা নার্সিংহোম, একটি বহুজাতিক সংস্থার এঞ্জিনিয়ার, কোথায় কার কাছে রয়েছে এখন, তাকেও, অনেককেই পাকড়েছে দুর্ভাগ্যের টোপ ফেলে।

এত রাগ, এত নৈরাশ্য, এত বিদ্বেষ হচ্ছিল তার যে বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। রগগুলো দপদপ করছিল। মনে হচ্ছিল ড্রেসিং টেব্‌লে সাজানো তার প্রসাধন দ্রব্যগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন সেগুলো সব গিয়ে পড়ে অমৃতা আর তার সো-কল্‌ড্‌ দুর্ভাগ্যের ওপর। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে অরিন্দমের গাল কি বুক কি যে কোনও খোলা জায়গা হাঁউ-মাউ করে কামড়ে দিয়ে যাতে তার ষোলো-ষোলো বত্রিশটা দাঁতের দাগ বসে যায় সেখানে।

এমন তার কখনও হয়নি, কক্ষনো না। সুন্দরী বলে, বরাবরই সে স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটি, বাড়ি আত্মীয়-স্বজন সব জায়গাতেই খুব প্রশ্রয় পেয়েছে। নিজের চেহারা সম্পর্কে তার অহঙ্কার থাকলেও সে এত বোকা নয় যে নিজেকে নিজের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে করবে। সৌন্দর্য নিয়ে সত্যি কথা বলতে কি তার আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। অন্যদের দেখে খালি মনে হয় ইস্‌স্‌ ওর ওইটে কী ভাল! যদি হত দোলার মতো রঙ। অমৃতার মতো ফিগার। যদি হত সুদীপার মতো টোল, অণিমার মতো চুল...নিজেকে নিয়ে মোটেই সে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই সে ভাবে অহঙ্কারও সে কোনদিনও অনুভব করেনি, কিন্তু সচেতনভাবে কাউকে ঈর্ষা করার জায়গায়ও ছিল না সে। নিজের ভেতরের এই ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষের প্রাবল্যও তার একেবারে অচেনা।

কিন্তু, তাই বলে তো সে সত্যিই প্রসাধন দ্রব্যগুলো, ময়শ্চারাইজার, নারিশিং ক্রিম, ট্যালকাম পাউডার, লিপস্টিক এগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে পারে না, পারে না অরিন্দম ঘোষকে কামড়ে দিতেও। তাই সে মুখে বলল—ঠাকুমা আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলে বসে আছে। যান না। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আর, লাবণির ঠাকুমার ঘরের দিকে যেতে যেতে অরিন্দমের আবার ফিরে এল সেই বদমেজাজ। সেই কালো ভিমরুলের চাকের মতো মুখ। এতই গম্ভীর, এত অস্বাভাবিক যে সে যখন নীচে নেমে এল, তার মুখ দেখে লাবণির মা তো বটেই, লাবণি নিজেও ভয় পেয়ে গেল। দুজনেই মনে করল লাবণির ব্যবহারের জন্যই এই গাম্ভীর্য, রাগ। কিন্তু তা নয়, লাবণির কাকা-কাকিমা আর তাঁদের একটি ছেলে একটি মেয়ে এল, ভাল করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারল না অরিন্দম। বনানী আগেই জাকে বলে রেখেছিলেন খুব হাসিখুশি, মিশুকে, হুল্লোড়ে তাঁর হবু ছোট জামাই। জা যাবার সময়ে বলে গেলেন—কই দিদি তুমি যে বলেছিলে হাসিখুশি? এ তো দেখছি রামগরুড়ের আরেক অবতার, মনে কিছু করো না দিদি, লাবু তো অমন গম্ভীর লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে হাঁপিয়েই মরে যাবে।

বনানী আমতা আমতা করে বললেন—না রে সত্যিই ও খুব হাসিখুশি, আজকে এলও তো খুব হাসতে হাসতে অবনকে জিজ্ঞেস কর।

লাবণির বাবা বললেন—মাথার ওপর কত দায়িত্ব এই বয়সেই। হঠাৎ হয় তো অফিসের কোনও প্রবলেম মনে পড়েছে...

বাবা যা-ই বলুন লাবণিকে তার মা সে রাতে শুধু মারতে বাকি রাখলেন।

—হাসতে হাসতে এল ছেলেটা, মুখে যেন আলো জ্বলছে। কী এমন তুমি বলেছ যে মুহূর্তে তার মেজাজ পাল্টে যায়! সুন্দরী-সুন্দরী করে লোকে মাথায় তুলেছে, মনে কোরো না তুমি দারুণ একটা কিছু। তোমার মতো চটকদার মেয়ে এখন কলকাতার রাস্তায় ছদো ছদো ঘুরছে। ওর কাছে তুমি কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুনে রাখো আমার এই কথা, আমি মা হয়ে তোমাকে বলছি—এমন বর তুমি ভূ-ভারতে আর কোথাও পাবে না। তোমার অনেক ভাগ্য যে আকাশের চাঁদ আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। তোমার অসভ্যতায় ও যদি চলে যায় তা হলে একটা মর্কট ছাড়া কিচ্ছু জুটবে না তোমার।

এত সব কড়া কড়া প্রাণ বিঁধোনো কথাও লাবণি কোনওদিন তার মায়ের কাছ থেকে শোনেনি। কিন্তু সে জানে সে কী করেছে, কী বলেছে। কেন অরিন্দম অমন পাল্টে গেল। সে দোষী, নিঃসন্দেহে।

কী কথায় অরিন্দম রাগ করল তা তো সে কোনওদিন মাকেও বলতে পারবে না। মায়ের তিরস্কারের উত্তরে সে শুধু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে অবনই বলল—দিদি আর কাঁদিসনি। তোর চোখ মুখ ফুলে গেছে। অরিন্দমদা একটা আস্ত পাগল!

অরিন্দম জানে না তার মেজাজ কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। লাবণি একটা বিশ্রী কথা বলেছিল সত্যি, কিন্তু তারপর তো সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে। লাবণিকে সে সান্ত্বনাও দিয়েছিল। তখনও লাবণি চুপ করে ছিল, তার মন খারাপ যায়নি, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার না। তাতে তো তার রাগ করবার কিছু থাকতে পারে না। আর ওইরকম খারাপ মেজাজ! লাবণির কাকা-কাকিমার সঙ্গে আজ তার প্রথম দেখা হল, অথচ সে ভাল করে একটা কথাও বলতে পারল না। ওঁদের ছেলেমেয়ে দুটিকে তো স্রেফ ইগনোর করল। ভাল ভাল রান্না করেছিলেন লাবণির মা, —সে তো একটু নাড়াচাড়া করে উঠে এল। নিজে ওঁদের সঙ্গে অভদ্রতা করেছে বলে দ্বিগুণ তিক্ততায় তার মন ভরে আছে।

স্টিয়ারিং-এ হাত, আপনাআপনি যান্ত্রিকভাবে ঘুরছে, গিয়ার চাপছে, মন অন্যত্র, খুঁজছে, খুঁজছে, সকালের বদমেজাজ আর এই রাতের বদমেজাজ একই জাতের। কেন? কেন? কী? তারপর হঠাৎ সে লাবণির সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে কারণটা পেয়ে গেল। অমৃতা। অমৃতার প্রসঙ্গ। সকালে সে অমৃতার কাছে তার বাবা-মায়ের পাঠানো চিঠি নিয়ে গিয়েছিল। আশা করেছিল কত খুশি হবে অমৃতা, কত কৃতজ্ঞতা জানাবে তাকে, বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলবে, সে দুঃখ আর বিষাদ থেকে অমৃতার মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু না, সে সব কিছুই ঘটেনি। সামান্য কিছু কথাবার্তা, অমৃতার নিঃশব্দ কান্না, তার পর অমৃতা এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে সে একটা মানুষ যে অতক্ষণ ধরে চুপচাপ তার সামনে বসে আছে, এটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেল। সে যখন—'আজ আসি। অফিস যেতে হবে' বলে উঠে পড়ল তখন অমৃতা ঠিক সেইরকম অন্যমনে যান্ত্রিকভাবে ঘাড় নাড়ল। তার যাওয়া অথবা আসা কোনওটাই অমৃতার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। তাই, তাই তার অমন অমানুষিক মেজাজ খারাপ হয়েছিল। ইগো কী? ইগো আহত হয়েছে বলে? না, না, না বোধহয়। তারপর সে সেই ভয়ানক উপলব্ধির সম্মুখীন হল। সে ভালবাসে। না লাবণিকে না, আর কাউকেই না, শুধু অমৃতাকে, শুধু অমৃতা, শুধু অমৃতা।

১৬

ভরা শ্রাবণে যখন শেহনাই-শামিয়ানা-শামি কাবার সহযোগে শম্পা-সৌমিত্রর বিয়ে হয়ে গেল, তখন শম্পা অঝোরঝোরে কাঁদছিল। তার ইচ্ছে ছিল, মায়ের টাকা যেন একেবারে খরচ না হয়। রেজিস্ট্রি বিয়ে, কিন্তু মায়ের ইচ্ছে তা নয়। সৌমিত্রও এমনই অদ্ভুত, যে টোপর পরতে শতকরা নিরানব্বুই দশমিক নয় নয় জন বাঙালি বর প্রিয়জনদের ঘোল খাইয়ে দেয়, সেই টোপর পরতে সে রীতিমতো আগ্রহই প্রকাশ করল। সৌমিত্রর বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। সে মানুষ হয়েছে হস্টেলে হস্টেলে। পারিবারিক জীবনের প্রতি সামাজিকতার প্রতি তার ভী-ষণ টান। এটা সাধারণত হস্টেলি ছেলেদের হয় না। কিন্তু সৌমিত্রর দেখা গেল সামাজিক আনুষ্ঠানিক বিয়েটা খুব পছন্দ। তবে মায়ের টাকা বেশি খরচ হল না, সৌমিত্র বলল তার যে কজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদেরও বিয়ের দিনেই আপ্যায়িত করা হবে। তার মেসোমশাই ও মাসতুতো বোন জামাইবাবু ব্যাপারটার ভার নিলেন। অর্ধেক খরচ সৌমিত্রই করল। পিচ রঙের কাঞ্জিভরম শাড়ি আর মায়ের গয়না স-ব পরে শম্পা সিঁথিময়ূর পরে আর পাঁচজন বাঙালি মেয়ের মতোই আলপনা কাটা পিঁড়িতে বসল। আশেপাশে তার জ্যাঠতুতোপিসতুতোরা। মামাতোরাও বেশ আগ্রহের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন দেখা গেল। বরটি

খুব কোয়ালিফায়েড ও ভাল চাকরি করে তো? শম্পার মায়ের মান রাখতে দুই মামা মিলে একটা ভাল মুক্তোর সেট এবং মাইসোর সিল্ক উপহার দিলেন, বরকে আংটি। জ্যাঠামশাইরাও একটা বারোমেসে সোনার হার দিয়েছেন, বরের কোয়ালিফিকেশন এবং ভাল চাকরির খাতিরে। নিবেদিতার আনন্দ ও গর্বের সীমা নেই দেখা গেল। খালি শম্পা যে কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলছে তা কারওরই জানা হল না। প্রথমত কারওর মনেই হয়নি, এটা একটা খোঁজ নেবার বিষয়। কেউ তো তেমন আপনও নেই তাদের। দ্বিতীয়ত বিয়ের দিনে মেয়েদের কান্নাকাটি একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সেই যে কবে থেকে চলে আসছে কান্নার ট্র্যাডিশন।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছিল ভাতারখাকি বলে।

আত্মীয়রা একটু খেয়াল করলে বুঝতেন ব্যাপারটা শম্পার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। আজকাল মেয়েরা বিয়ে হতে অত কাঁদেও না, অনেকেই নিজের নির্বাচিত পাত্র বিয়ে করে, বাবা-মার নির্বাচিতকেও দেখতে-শুনতে পায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাটা কিছুটা কম থাকায় তারা নিজেদের বিয়েটা মোটামুটি উপভোগই করে। তবে শম্পা কেন এত কাঁদছে?

এ কথা শম্পাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলত যে সে কাঁদবে না তো কাঁদবেটা কে? সেই পাঁচ বছর বয়সে বাবা অকালে মারা যাবার পর সে আর তার মা পরস্পরের প্রগাঢ় বন্ধু। শম্পার খুব আশা ছিল, সৌমিত্রর যেহেতু কোনও পরিবার নেই, ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে সে থাকতে রাজি হবে। কিন্তু মা অনেক করে অনুরোধ করা সত্ত্বেও শম্পা অনেক কাকুতি-মিনতি করা সত্ত্বেও এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি তার টান থাকা সত্ত্বে সৌমিত্র প্রস্তাবটা নস্যাৎ করে দিয়েছে। একেবারে নস্যাৎ। সে তার সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের ফ্ল্যাট থেকে কোথাও নড়বে না। এমনকী, শম্পার মা তাদের সঙ্গে বরাবর থাকুন এতেও তার আপত্তি। শম্পা জানে মা এ প্রস্তাবে রাজি হবে না, কিন্তু নিজের বিবেচনা বোধ থেকেও তো সৌমিত্র কথাটা বলতে পারত। বলল না দেখে শম্পা অগত্যা একটু ইঙ্গিতই দিল, —মা যে একা কী করে থাকবে—সে বলেছিল। সৌমিত্র তাতে বলল—কেন, বাড়ির অপর অংশেই তোমার জ্যাঠামশাইরা থাকেন! তা ছাড়া, এতদিন তো মা নিজেই নিজেকে দেখছিলেন। তুমি কি মনে করেছ তুমি মাকে দেখাশোনা করছিলে? হেসে বলল সৌমিত্র।

—স্বীকার করছি মাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হয়েছে, কিন্তু শেয়ার করতে তো আমি ছিলাম! তা ছাড়া মায়ের শরীর-টরীর খারাপ হলে কে দেখত আমি ছাড়া? সঙ্গ বলেও তো একটা কথা আছে।

সৌমিত্র বলেছিল—আমিও তো এতদিন একা থাকতাম!

এর পর আর কী বলা যায়?

বিয়ে করতে বসে শম্পার মনে হচ্ছে সে ভীষণ স্বার্থপর। মাকে সে একটা অন্ধকার ধোঁয়াশা-ভরা একলা জীবনের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছে। ঠিক একটা পাখির ছানার মতোই সে উড়তে শিখেই ফুড়ুৎ।

আরও একটা কারণ আছে। সেটা অবশ্যই অমৃতা। অমৃতা, তার বেস্ট ফ্রেন্ড, বলা যায় ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড তার শ্বশুরবাড়ির ষড়যন্ত্রে নিখোঁজ হয়ে গেল। আর সে? সে? সে কী করছে? না বিয়ে করছে। দস্তুরমতো শানাই বাজিয়ে, বেনারসি পরে, পাত পেড়ে লোকজন খাইয়ে বিয়ে।

সীমামাসি আর বিশ্বজিৎকাকুকেও কাঁচুমাচু মুখে তারা নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল। ওঁরা খুব খুশি দেখালেন। মানে, ওঁদের পক্ষে যতটা খুশি দেখানো সম্ভব।

নিবেদিতা বলেছিলেন—আমাদের খুব খারাপ লাগছে-ভাই। অমৃতার এখনও কোনও...

সীমা বলেছিলেন—তাই বলে কি শম্পা বিয়ে করবে না? না—না খুব ভাল হয়েছে, নিজে দেখে

শুনে বিয়ে করছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। এটাই দরকার। এই দুটোই—নিজে দেখা-শোনা, আর নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

এসেছিলেনও ওঁরা। দুপুরে এসেছিলেন, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আসতে হয়তো সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। খুব অদ্ভুত উপহার নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা। একটা তো শাড়ি, আর একটা ছোট্ট অ্যালবাম, তাতে শম্পা আর অমৃতার টু না থ্রি থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছরের একটা করে স্কুলের গ্রুপ ফটো। কোনওটাতে ক্লাস-টিচারের সঙ্গে একাসনে বসে, কোনওটাতে পেছনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সব সময়ে দুজনে পাশাপাশি। গোলমাল বেবি-বেবি চেহারা থেকে সদ্য কৈশোরে পা রাখা দুই বন্ধু, যখন চেহারা, ব্যক্তিত্ব আলাদা হতে শুরু করেছে তখন পর্যন্ত। শেষ দিকের তিন-চারটে ফটো আবার শুধুই শম্পা আর অমৃতা, অমৃতা আর শম্পা, অমৃতা এক বিনুনি শম্পা দু বিনুনি, শম্পা স্কার্ট, অমৃতা মিডি। শম্পা শাড়ি অমৃতা সালোয়ার।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। সব। স-ব। কীভাবে একবার অমৃতা অনেক নম্বর পেয়ে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল বলে, শম্পা রাগে ফুঁসছিল—তুই আমাকে সব ক্লাস-নোটস্ দিসনি। না হলে দুজনের মার্কসের এত তফাত হয় কী করে? তোর সঙ্গে আর কখনও এক বেঞ্চে বসব না। তার রাগ আর জলভরা চোখ দেখে অমৃতা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে বাংলার দিদি রেণুদিকে গিয়ে বলেছিল—আচ্ছা, দিদি, আমার মার্কস একটু কমিয়ে দিলে হয় না?

—মার্কস কমিয়ে দেব। —কেন? —রেণুদি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

অমৃতা ঢোঁক গিলে বলেছিল—না, মানে আমাদের বন্ধুদের থেকে অত বেশি নম্বর আমি কী করে পেতে পারি?

—তুমি কি আমার জাজমেন্টকেই কোয়েশ্চন করছ? আচ্ছা স্পর্ধা তো তোমার!

—কী ব্যাপার?—শেফালিদি, রেণুদির রাগ দেখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সব শুনে শেফালিদি বলেছিলেন—আমি বুঝেছি রেণু, বন্ধুরা নয়। ওই শম্পাই ওর ঘোরতর বন্ধু। সে নিশ্চয় কান্নাকাটি করছে কম নম্বর পেয়ে।

দুই দিদি মিলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শম্পাকে। সমস্ত ঘটনাটা বলেছিলেন। তার পর তাকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। নম্বর পাও তোমরা যে যার মেরিটে, অমৃতা এবার খুব ভাল করেছে, তুমিও আসছেবার ভাল করার জন্যে খাটো। নিশ্চয় পাবে। আর শম্পা, অমৃতা তোমাকে কী ভীষণ ভালবাসে সেটা বুঝেছ তো! তোমার চোখের জল ওর সয়নি বলে ও রেণুর কাছে নিজের নম্বর কমাবার জন্যে দরবার করতে এসেছিল। এ রকম অনুরোধ আমরা জীবনে কখনও শুনিনি, এরকম ঘটনাও আর কোথাও ঘটেছে বলে জানি না।

তবু তো শম্পা কীভাবে অমৃতাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, তার কিছুই দিদিরা জানতেন না।

বিশ্বজিৎকাকুও একদিন বলেছিলেন—শম্পা, তোর বাংলা ইংরেজির প্রশ্নোত্তর সব সময়ে অমৃতার দেখে নিয়ে লিখিস কেন রে? অমৃতা কি অঙ্কগুলো তোর দেখে দেখে করে? সব সিঁড়ি নিজে নিজে ভেঙে ভেঙে উঠতে হয়। না হলে শেখাটা ঠিক হয় না।

এতেও শম্পার ভীষণ অভিমান হয়েছিল। সে বিশ্বজিৎকাকুর কাছে পড়তে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। একদিন স্কুল ছুটি হবার পর দেখে বিশ্বজিৎকাকু দাঁড়িয়ে আছেন ঘর্মাক্ত কলেবরে। শম্পাদের দেখে বললেন—চ, শম্পা অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাস না।

তখন অমৃতারা রমণী চ্যাটার্জীতে উঠে গেছে। শম্পার মাকে ওঁর অফিসে ফোন করলেন বিশ্বজিৎকাকু, তার পর ওদের দুজনকে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। কী আদর! কী আদর! কী খাওয়া! কী খাওয়া! সীমামাসি সেদিন তাঁর সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে রেঁধেছিলেন বোধহয়, শম্পা যা যা খেতে ভালবাসে।

—কেন এতদিন আসিসনি রে? —বিশ্বজিৎকাকু জিজ্ঞেস করলেন খেতে বসে।

শম্পা অপ্রস্তুতমুখে বলল—বড্ড দূর হয়ে যায় যে।

—তা-ও তো হপ্তায় দু দিন ধরে আসতিস, এখন কি আর তোর উঁচু ক্লাসের অঙ্ক সায়েন্স পড়াতে পারছি না?

শম্পা ভীষণ অপ্রস্তুত।

অমৃতা বলল—তা নয় বাবা, মান হয়েছে মানিনীর।

সীমামাসি তার মুখে মাছের চপ গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—কে মেরেছে কে বকেছে, কে বলেছে কী? তারপর কাকুর দিকে ফিরে বলেছিলেন—তোমাদের মাস্টারদের ওই বড্ড কড়া স্বভাব। একটা জিনিস জানবে ছেলেদের পড়ানো আর মেয়েদের পড়ানো এক জিনিস নয়। ছেলেদের তোমরা ঠেঙিয়ে শেখাতে পারবে। মেয়েদের বেলায় কিন্তু শেখাতে হবে ভালবেসে।

অমৃতা চোরা চোখে চাইছিল শম্পার দিকে, মুখে মিটি মিটি হাসি। সেই হাসিটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শম্পা। তার মুখের ওপর পানপাতা চাপা দেওয়া, সেই পানপাতার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে অমৃতা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, একটা বিনুনি করা নীল চেকচেক একটা ধনেখালি শাড়ি পরা, শাদা ব্লাউজ, অমৃতা হাসছে মিটিমিটি—মান হয়েছে মানিনীর? তাই কান্না? দেখতে দেখতে হু হু করে জল পড়ে শম্পার মুখের সব মেকাপ ধুয়ে গেল। ফুলে ফুলে উঠছে বুক।

এত স্পষ্ট কেন দেখতে পাচ্ছে সে অমৃতাকে? অমৃতা কি মারা গেছে? কথাটা মনে হতেই যেন ইলেকট্রিক শক লাগল তার বুকে। বিষ লাগতে লাগল শানাইয়ের সুর, কেটারারের খাবারের গন্ধ, জুঁইয়ের মালার সুবাস, নানান গয়নার কিঙ্কিণী, শাড়ির খস্‌খস্‌। ভুলে গেল সে সৌমিত্রের মুখ। কদিন পরেই আন্দামানে হানিমুন করতে যাবে সেই সুখ।

কেউ বোধহয় নিবেদিতাকে খবর দিয়েছিল শম্পা ভীষণ কাঁদছে। নিবেদিতা জানেন শম্পার মাকে ছেড়ে যেতে, থাকতে হবে বলে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। তাঁদেরও কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু শম্পার মাতৃবিরহের প্রকৃতি আলাদা। তাঁরা যে কত বছর ধরে দুজন শুধু দুজনের। সেই নিভৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর কোনওদিনও কারও সঙ্গে হবে না শম্পার, হতে পারে না। তিনি সব ফেলে তাড়াতাড়ি এলেন।

—শম্পা এ কী করছিস? কাজল-টাজল সব ধেবড়ে গেছে, চোখের জলে মুখ ডোরা কাটা, এ কী?

মায়ের নতুন গরদ-শাড়ির বুকে মুখ গুজে শম্পা বলল—মা আমার অমৃতার জন্যে ভীষণ মন কেমন করছে। আমি আর থাকতে পারছি না।

অরিন্দম ঘোষ অনেক, অনেকক্ষণ বরযাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে বসে উসখুস করছিল। বরযাত্রীরা ভাবছে সে শম্পাদের পক্ষের লোক, শম্পার আত্মীয়রা ভাবছে সে বরযাত্রী। কে যে কী তা-ও সে আদৌ বুঝতে পারছিল না। বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল। অমৃতা শম্পার খবর জানতে চায়। প্রথমটা চেয়েছিল উদাস ভাবে। একটিবার মাত্র উল্লেখ করেছিল। তারপর সে অরিন্দমকে সরাসরি অনুরোধ করে। সময় করে সে যেদিন আসতে পারল, দেখে বাড়িটার সদর দরজায় মাথায় লেখা—শম্পা ওয়েড্‌স সৌমিত্র। একবার ভাবল—এই তো খবর জানা হয়ে গেল। এবার ফিরে গিয়ে জানিয়ে দেওয়াই যায়—অমৃতা তোমার বন্ধু ওয়েড্‌স সৌমিত্র। জানাতে তার একটা নিষ্ঠুর আনন্দ হবে। যেন এতে করে বলা হয়ে যাবে—অমৃতা, সারা পৃথিবীতে কেউ তোমার জন্যে বসে নেই। সংসার চলছে তার নিজস্ব নিয়মে। তোমাকে সবাই ভুলে গেছে। তোমার জন্য বসে আছে—শুধু একলা আমি, অরিন্দম। তুমি একটু আমার দিকে ফেরো।

কিন্তু এই সময়ে কে খবর দিল, কনে ভী-ষ-ণ কাঁদছে। সৌমিত্রর কোনও বন্ধুই বোধহয় বলল—'এই শুনলাম অনেক দিন ধরে মন দেওয়া-নেওয়া চলছে, কেমন মন দিলি রে সৌমিত্র,

তোর বউ নাকি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।' কথাটা শুনে সৌমিত্র টোপরটা পাশে খুলে রেখে, খুব স্মার্টলি হঠাৎ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। অরিন্দম কৌতূহলী হয়ে বসে রইল, বসেই রইল, অন্তত আধঘণ্টা পরে সৌমিত্র ফিরল, মুখটা উদাস।

এক বন্ধু বলল—কী রে প্রসপেক্টটা একটু ফেরাতে পারলি?

সৌমিত্র বলল—ওর ছোটবেলার বন্ধু হারিয়ে গেছে, তাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে।

বন্ধু বলল—বিয়ের লগ্নে বন্ধু? এহ্ সৌমিত্র, তোর হয়ে গেল।

সৌমিত্র বলল—বাজে ফাজলামি করিস না। মেয়েটি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে হঠাৎ কীভাবে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। মনে হয় শী ইজ ডেড অ্যান্ড গন, বাই নাউ।

ডেড অ্যান্ড গন—ডেড অ্যান্ড গন—মাথার মধ্যে ভীষণ একটা কষ্ট অনুভব করল অরিন্দম। অমৃতা মারা গেছে—এই খবরটা মিথ্যা, তবুও সে সইতে পারছে না সেটা। শম্পা তার বিয়ের মুহূর্তে অমৃতার জন্য কাঁদছে, আর কারও জন্য নয়। অমৃতার জন্য অর্থাৎ 'শম্পা ওয়েড্স সৌমিত্র' এই সংবাদটা যতটা নিষ্ঠুর শোনাচ্ছিল, ততটা নিষ্ঠুর আর রইল না। কী গভীর তৃপ্তি। অমৃতা বেঁচে আছে। শম্পার স্মৃতি ও সত্তার মধ্যেও অমৃতা বেঁচে আছে। তার মনে হল, জীবনের এই শুভ মুহূর্তে শম্পাকে তাকে দেখতেই হবে। কে এই শম্পা যে বিবাহলগ্নে অমৃতার জন্য কাঁদে? সে উঠে পড়ে ভিড় ঠেলতে লাগল। এদিক ওদিক প্রশ্ন ছুড়তে লাগল—শম্পা কোথায়? শম্পা?—যেন সে শম্পার একজন বন্ধু। আর কাউকে এই বিয়ে বাড়িতে তো চেনে না। তাই, তা ছাড়াও উপহারটা তো তাকেই দিতে হবে। তাই সে শম্পাকে খুঁজছে।

একজন নিবেদিতাকে খুঁজে আনল। নিবেদিতা বললেন—শম্পাকে ওর বোনেরা একটু সাজিয়ে দিচ্ছে। একটু অপেক্ষা করবেন? আপনি কি 'উইল পাওয়ার'-এর।

উইল পাওয়ারই বটে—অরিন্দমের সেই মুহূর্তে মনে হল—ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির কী প্রচণ্ড জোর। এত প্রবল তার আকর্ষণ; যে ঠিক সেই সময়টাই আপাত-উদাসীন অমৃতার শম্পার কথা জানতে ইচ্ছে হল, যখন শম্পার মনও অমৃতার জন্য উতলা। সে নিচু গলায় বলল—খুব ইমপর্ট্যান্ট একটা খবর এনেছি শম্পার জন্য। ভয় নেই, ভাল খবর। একটু যদি ডেকে দেন, খবরটা ভিড়ের মধ্যে দেওয়ার নয় কিন্তু।

নিবেদিতার মুখের চেহারা এমন পাংশু হয়ে গেল যে তাকে আবার বলতে হল,—ভয়ের কিছু নেই।

শম্পার মুখ পুরো ধুয়ে গিয়েছিল চোখের জলে। সৌমিত্র সেই অবস্থাতেই তার সঙ্গে দেখা করে—সৌমিত্র আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। অথচ অমৃতার কোনও খোঁজ নেই সে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অমৃতার কথা আগে শুনেছিল সৌমিত্র ঠিকই, কিন্তু অমৃতা যে এত গুরুত্বপূর্ণ শম্পার শান্তির জন্য তা আগে বুঝতে পারেনি। সে কনেকে প্রাণপণে শান্ত করবার চেষ্টা করে—ঠিক খোঁজ পাওয়া যাবে, দেখো, খারাপ কিছু তো শোনা যায়নি, তবে?

—আজকালকার দিনে কেউ কাউকে খুন করে পুঁতে ফেললে কি আর খবর পাওয়া যায়?

সৌমিত্র তখন মনে, বাচনে দৃঢ়তা এনে তাকে বলে—অত সোজা নয় শম্পা। কেঁদো না, কেঁদে কিছু করতে পারবে? আমি বলছি—তুমি ভাল খবর পাবে।

এ-ও একরকম উইল পাওয়ার। হয়তো এই পাওয়ারই অরিন্দমকে অন্দরে শম্পার খোঁজে টেনে আনল।

বোনেরা শম্পার মুখ ধুয়ে, শুধু একটু পাউডার লাগিয়ে দিয়েছে। আর কোনও প্রসাধনের পুনরাবৃত্তি শম্পা কিছুতেই করতে চায়নি। নিবেদিতা গিয়ে মেয়েদের দঙ্গলকে ওঠালেন—শম্পা 'উইল পাওয়ার' থেকে একটি ছেলে তোর খোঁজ করছে, বলছে কী বলার আছে।

উইল পাওয়ার? শম্পা শূন্যে হাতড়ায়? কে? শুক্লা, না রাঘবন? ব্যানার্জি? কে এল? কেন? কী খবর? তাদের প্রজেক্টটা কি ফিরে এল? একলা ঘরে অরিন্দমকে নিয়ে নিবেদিতা ঢুকলেন।

কে? এঁকে তো চিনি না?—শম্পা ভাবল!

অরিন্দম দেখল কচি বাঁশগাছের মতো তন্বী নমনীয় শ্যামলী একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের কনের সাজগোজ বলতে তেমন কিছু নেই, যেটুকুও বা আছে তাকে দখল করে রয়েছে এক বিপন্নতা। এক মানুষের জন্য আরেক মানুষের এই বিষাদ মানুষকে এক অদৃষ্টপূর্ব শ্রী দেয়, সেই শ্রী শিশির বিন্দুর মতো লেগে আছে মেয়েটির সমস্ত অবয়বে। সে স্তব্ধ হয়ে ভাবল, কেন যে এতদিন অমৃতা এর খোঁজ করেনি সেটাই তো এক বিস্ময়।

সে সোজা শম্পার দিকে তাকাল, বলল—আমি অমৃতার কাছ থেকে আসছি।

শম্পা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সে কথা বলতে পারছিল না। নিবেদিতাও। অরিন্দম বলল—আপনার বিয়েতে অমৃতা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। আর ভালবাসা।

—আপনি কে? অমৃতা কোথায়? কেন সে....

শম্পা কথা শেষ করতে পারল না।

অরিন্দম বলল—কাঁদবেন না, অমৃতা ভাল আছে। ওই মামলাটার কারণে ওর ঠিকানা, খবর কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। বিশেষত আজকের দিনে।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন তো?

—মিথ্যা বলে আমার লাভ? ব্যাস এবার মন ভাল করে, হাসিমুখে বিয়ে করুনগে যান। আপনার বরটিও বেশ ভাল। বেশ ভাল লেগেছে আমার। আমারও শুভেচ্ছা রইল।

সে হাতজোড় করে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এল। মা, মেয়ে দুজনেই এত অবাক, যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। নিবেদিতা যে ভদ্রলোককে কোনও সৌজন্য দেখাবেন, খেয়ে যেতে বলবেন, সে সবের অবকাশ যখন এল তখন অরিন্দম বাইরে চলে গেছে। বিধবার মেয়ের বিয়ে, আত্মীয়স্বজন নিজেদের মজা লুটতেই ব্যস্ত। ভদ্রমহিলার হয়ে অতিথি-আপ্যায়নের মানসিকতাই নেই। তার ওপরে আবার বরের বাড়ির অচেনা লোকেরাও আছেন। তাঁদের আপ্যায়ন করবার জন্যে স্বয়ং বরের মাসতুতো বোন ভগ্নীপতি, মেসোমশাইও এসেছেন। দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেলে আর দায় থাকে না। খালি মজা থাকে। সুতরাং অরিন্দম নির্বিবাদে মাঝের দালান উঠোন পেরিয়ে, বরাসনে আর একবার বরকে দেখে সদরের বাইরে চলে গেল।

'শম্পা ওয়েড্‌স সৌমিত্র' এখন পেছনে পড়ে গেছে। সে ছুটে চলেছে এক নতুন প্রভাতের দিকে। নব আনন্দে জাগো। উইল পাওয়ার উইল পাওয়ার। অমৃতার যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে কোনও মানুষের প্রেমে পড়া কি সম্ভব? কিন্তু এই সময় তো আর চিরকাল থাকবে না। পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, অরিসূদনের শাস্তি হবে। অমৃতার পরীক্ষা হয়ে যাবে, তার সন্তান জন্মে যাবে, সে তার মা-বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরতে পারবে। ততদিন পর্যন্ত অরিন্দম অপেক্ষা করে থাকবে। দু পায়ে ইচ্ছা নিয়ে, যেন পদব্রজে নয়, দু ডানায় ভর করে সে উড়ে যেতে থাকে তার মারুতির দিকে। তার পর তার খেলনা গাড়ি উন্মুখ হাওয়ায় জোরে ছোটে। উইল টু পাওয়ার। উইল টু লাভ। উইল টু বি লাভড।

১৭

প্রোফেসর জয়িতা বাগচির কাছে অল্প কিছু ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায়। তিনি সেভাবে কোচিং করেন না। কেউ জানেও না তিনি কোচিং করেন। দু-চারজন ছাত্র-ছাত্রী থাকে নাছোড়বান্দা। ক্লাস থেকে বেরোচ্ছেন—জয়িতাদি! স্টাফরুম থেকে বেরোচ্ছেন—জয়িতাদি! লাইব্রেরিতে ঢুকছেন—জয়িতাদি! এই নাছোড়বান্দাগুলোর মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি পাত্তা দেন। পড়ানোর জন্য বেশ উচ্চ ফি নিয়ে

থাকেন। এরা অন্যদের লুকিয়ে টুকটুক করে জয়িতাদির বাড়ি যায়। পড়ে। নোট্‌স্‌ নেয়। তিলক এদের মধ্যে একজন। সে বেচারি মরিয়া হয়ে গেছে আসলে। পড়ছে বাংলা, এদিকে ছেলে, কোথাও কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। চাকরির দরখাস্ত সে এখন থেকেই পাঠাতে শুরু করেছে, কম্পিউটার শিখছে। কিন্তু একটা কথা—বিষয়টা পড়তে তার সত্যি-সত্যি ভাল লাগে। এই ভাল লাগাটা অদ্ভুত। তার বয়সী বেশির ভাগ ছেলের সঙ্গেই মেলে না। কিন্তু তার এই ভাল লাগাটা জীবনে কোনও কাজে আসবে না—ভাবতে তার খুব খারাপ লাগে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেও সে পাঁচশো টাকা দিয়ে জয়িতাদির কাছে পড়তে যায়। সপ্তাহে একদিন। একজন অধ্যাপক হতে গেলে কী এবং কতটা আয়ত্ত করতে হয় সেটাই সে জয়িতাদির কাছ থেকে জেনে নিতে চায়।

জয়িতাদির ক্লাসের পড়ানোটা অন্য রকম। সেটা যেন একটা পারফর্ম্যান্স, যেমন গায়ক গান করেন, নট অভিনয় করেন একটা পরিশীলিত, মার্জিত, বহুদিনের অভ্যাসে রপ্ত ব্যাপার। সেটা একটা শোনবার জিনিস। এত তাড়াতাড়ি একটা ভেতরের ভাললাগার তোড়ে বলে যান তিনি ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগ সময়েই স্তব্ধ হয়ে শোনে। বিশদ নোট নিতে পারে না, কেননা তাতে করে রস উপভোগের বাধা হবে। টেক্সট হলে তার মার্জিনে, না হলে দু-চারটে কথায় তারা ধরে রাখতে চায় এই ম্যাজিক। কিন্তু বাড়িতে পড়ানোর সময়ে জয়িতাদি একটু একটু করে ইট গাঁথেন, সযত্নে লাগান সিমেন্ট, পলেস্তারা। সেটা থেকে শেখার সুবিধে হয়।

জয়িতাদির বাড়িতে যেতে কোনও অসুবিধেও নেই। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে সল্টলেক সেক্টর থ্রি খুবই কাছে। কিন্তু অসুবিধেটা অন্য জায়গায়। জয়িতাদি হয় তো পড়াচ্ছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে তারা লিখে রাখছে সব। জয়িতাদির স্বামী প্রোঃ সুপ্রতীক বাগচি, ভেতর থেকে হাঁক পাড়বেন—জয়িতা! জয়িতা!

হন্তদন্ত হয়ে জয়িতাদি চলে যান। কোনও দিন পাঁচ মিনিট, কোনও দিন দশ মিনিট, কোনও দিন তারও বেশি সময় চলে যায়। অনেক সময়ে ভেতরে একটা চাপা কথা কাটাকাটির আওয়াজ পাওয়া যায়। একটু পরে হয়তো অধ্যাপক সুপ্রতীক বাগচি বেরিয়ে যান। জয়িতাদি আবার এসে বসেন।

সেদিন তিলক গেছে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে। ভিজে ভিজে সে যখন পৌঁছল জয়িতাদির বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ। সে বেল দেবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দরজাটা খুলে দিলেন জয়িতা বাগচি নিজেই।

—ও তুমি এসেছ? এ কি? ভিজে গেছ যে একেবারে।

—হ্যাঁ এলোমেলো ছাঁট ছিল তো!

—এত ভেজা অবস্থায় আজকে নাইবা পড়লে তিলক। আর কেউ আসেওনি। উনি বসবার ঘরের আলো জ্বেলে দিতে দিতে বললেন।

—ঠিক আছে। তিলকের একটু একটু শীত অবশ্য করছিল। কিন্তু ভেজা জায়গাগুলো পাখার তলায় কিছুক্ষণ বসলেই শুকিয়ে যেত! মাসে পাঁচ শ' টাকা! দিদি তো অন্য কোনও দিন আর দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। জয়িতাদি বললেন—অনেকদিন ধরে তোমায় একটা কাজ দেব ভাবছি। করবে?

—কেন করব না? বলুন।

—আমি তোমাকে একটা প্যাকেট দেব, তুমি সেটা অমৃতাকে দিয়ে আসবে?

—অমৃতা? তিলক হাঁ হয়ে গেছে।

—শোনো ও বেঁচে আছে, ভালই আছে, সমস্ত ব্যাপারটা সম্ভবত একটা পারিবারিক ষড়যন্ত্র, যার থেকে ও কপালজোরে বেঁচে গেছে। ও যেখানে আছে সেখান থেকে ও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযোগ করে। কিন্তু ও বেরতে পারে না। নিরাপত্তার জন্য, বুঝতেই পারছ। এই প্যাকেটটা ওর কাছে পৌঁছে দিলে ওর খুব উপকার হবে। আমারও মনে হবে আমি একটি অসহায়

বিপন্ন মেয়ের জন্য কিছু করতে পারলাম।

অমৃতা বেঁচে আছে এ খবর সে অরিন্দমদার কাছে শুনেছে। কিন্তু জয়িতাদির সঙ্গে তার যোগাযোগ, জয়িতাদির হঠাৎ অমৃতার উল্লেখ সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে জয়িতাদি সবে পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করছেন সুপ্রতীকবাবুর গলা শুনতে পেল তিলক।

—মানে কী এর? মানে কী? দিলে কী ওটা? নোট্‌স? ওটা তো তোমার-আমার করা বেস্ট নোট্‌স—ওইগুলো দিয়ে দিলে?

জানলার মধ্যে থেকে আসছে কথাগুলো।

—তোমার আর কী করা? আমারই। আমি বুঝেছি দিয়েছি। কোনও কোনও সময়ে একটু অতিরিক্ত করতে হয়, যেমন তোমার জন্যে করেছিলাম।

—তোমার এই কথা আমি নিজের থুতু গেলানোর মতো করে গেলাব তোমাকে একদিন।

—গেলাও না। আমার চেয়ে বেশি শাস্তি তাতে আর কেউ পাবে না সুপ্রতীক। অস্বীকার করতে পার এই চোদ্দো বছর এক জায়গায় অনড় হয়ে বসে আছ? কলেজ পলিটিক্স ছাড়া আর কিচ্ছু করছ না! অস্বীকার করতে পার দুজনের মিলিত দায়িত্বের ওয়ান থার্ডও তুমি নাও না—তুমি আমাকে তোমার স্যালারির যে অংশটা দাও তাতে কী হয়? হয় কিছু? আমার ভরণপোষণ তো দূরের কথা, তুতুর আর তোমারও কী হয়? হয় না!

—আমি যেমন উপার্জন করি, তুমি সেই স্ট্যান্ডার্ডে চললেই হয়। দ্যাট য়ু ওন্ট ডু, য়ু অ্যামবিশাস বিচ।

পাথরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তিলক। অন্যের কথা এভাবে শোনা ঠিক নয়, সে জানে, কিন্তু পারছে না। জয়িতাদি, মাথার ওপর ঝুড়ি চুল, ঈষৎ চৌকো মুখের অত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জয়িতাদি যিনি নিজের মারুতি এইট হানড্রেড চালিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে আসেন, যাঁর ডক্টরেটের থিসিস বাজারে বই হয়ে বেরিয়ে গেছে, তিরিশ থেকে শুরু করে নব্বই দশক পর্যন্ত যাঁর উপন্যাসের আলোচনাগ্রন্থ প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই তাঁকে তাঁর স্বামী—বিচ বলছেন? অ্যামবিশাস বিচ? আর সে শুনবে না!

—মাইন্ড ইয়োর ল্যাংগুয়েজ সুপ্রতীক। হোয়াট ডু য়ু মিন বাই ইওর স্ট্যান্ডার্ড? মদ সিগারেট আর আড্ডা মারার খরচ সামলে কত টাকা তুমি আমাকে দাও? নিম্নবিত্তের সংসারও আজকালকার দিনে আর ওতে চলে না। আর অ্যামবিশন নিয়ে প্রায়ই তোমায় বক্রোক্তি করতে শুনছি। ব্যাপারটা কী বলো তো? আমি তো তোমার মতো পলিটিক্স করি না, লবি-টবিও জানি না। নিজের ক্ষমতায় পড়াশোনা করে কিছু অর্জন করলে, মানুষের সম্মান শ্রদ্ধা পেলে সেটাকে ঘৃণা করতে হবে? অ্যামবিশন? আমি কি তোমার মতো প্রেমিকার নোট্‌স পড়া ফার্স্ট ক্লাস?

একটা চাপা গর্জন, একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর 'উঃ' বলে একটা ক্রুদ্ধ কাতর চিৎকার শুনতে পেল তিলক। সুপ্রতীকবাবু কি জয়িতাদিকে মারছেন? মারছেন একজন ফার্স্ট ক্লাস কলেজের প্রোফেসর তাঁর স্ত্রীকে যিনি য়ুনিভার্সিটির বিভাগীয় প্রধান? সম্ভব? এটা সম্ভব? সে এখন কী করবে? পালিয়ে যাবে এখান থেকে? সেটা কাপুরুষতা হবে না? আর যদি থাকে? যদি ঢোকে? সেটাও তো হবে পরের ব্যাপারে নাক গলানো। খুব তাড়াতাড়ি চিন্তাটা করছিল সে। এখন মন স্থির করে জোর বেল দিল। রিং রিং রিং রিং রিং। এতক্ষণ কোনও সভ্য মানুষ আরেক সভ্য মানুষের বাড়িতে বেল টেপে না।

দরজাটা খুলল বেশ একটু পরে। সামনে সুপ্রতীকবাবু। মুখটা লাল, চোখ দুটো দপদপ করছে। কিন্তু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার? আবার ফিরে এলে যে?

—ম্যাডামকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

—পরে জিজ্ঞেস করলে হয় না? শী ইজ বিজি নাও।

—অনেক দূরে থাকি সার, প্লিজ একবার ডেকে দিন।

সুপ্রতীকবাবু ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জয়িতাদি এলেন, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, মুখে চোখে জল দিয়েছেন। শাড়ির সামনেটা ভিজে। চুলে বোধহয় একবার চিরুনিও চালিয়ে এসেছেন। মারটা কি চুল ধরেই হয়েছিল?

—কী ব্যাপার? তিলক? একই প্রশ্ন দুজনে করলেন দুভাবে। সুপ্রতীকবাবু করেছিলেন রীতিমতো ক্রুদ্ধ গলায়। অভদ্রের মতো। জয়িতাদির প্রশ্নটায় সামান্য বিরক্তি। খুব সামান্য। কিন্তু গলার একটা থির থির কাঁপুনি তিলক টের পেল।

সে বলল—ম্যাডাম, আপনি অমৃতার ঠিকানাটা কিন্তু আমায় দিতে ভুলে গেছেন।

—ঠিকানাটা প্যাকেটের ওপরই লেখা আছে। দেখো!

—ও, একটু ভেতরে আসতে পারি ম্যাডাম?

—এসো, আমি আসলে এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

—একটু ডিরেকশনটা জেনে নিতাম।

—ও, তুমি ওদিকটায় যাও না, না? গড়িয়াহাটের মোড় আসবার দু-তিন স্টপ আগে রাস্তাটা, ওখানটায় একটু জিজ্ঞেস করে নিও। ফিরতে গিয়ে আবার মুখোমুখি হলেন উনি তিলকের। বললেন—অনেকটা চলে গিয়েছিলে, না?

তিলক বুঝল উনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। সে বলল—অনেকদূর, প্রায় ওই আইল্যান্ড পর্যন্ত, ছুটতে ছুটতে আসছি। সেই জন্যেই...

কথা শেষ না করে হঠাৎ তিলক তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে জয়িতাদিকে একটা প্রণাম করল। উনিও অবাক হলেন। তিলকও। সে আর দাঁড়াল না। পেছন ফিরে প্রায় ছুট লাগাল।

এই সব দাম্পত্য-কলহে কথায় কথা বেড়ে যায়, সে জানে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে। করতে করতে এক সময়ে ব্রহ্মাস্ত্রের আগুন বেরিয়ে আসে। একেবারে বধ। এটা সে দেখেছে। এতটা দেখেনি। কখনওই না। কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এর ছোট সংস্করণ বাড়িতে দেখেছে। কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হল। মা বাবাকে ঠেস, বাবা মাকে ঠেস। তারপরই বাবা অবধারিতভাবে মায়ের বাপের বাড়ির নিন্দা আরম্ভ করবে। ব্যাস ক্রোধ আর কষ্ট চোখের গরম জল হয়ে বেরিয়ে আসবে। মা খাবে না। বাবা বলবে একদিন না খেলে কিছু হয় না। তারা মাকে সাধবে। মা কিছুতেই উঠবে না। তিলক বিরক্ত মুখে বলবে—'তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমি খেয়ে নিচ্ছি।' পরের দিন ঈষৎ গম্ভীর-বিষণ্ণ মুখে মায়ের অবতরণ, বাবার নির্দেশ—জলখাবার না খেয়ে মা যেন কোনও কাজ না করে...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বাড়িতে এত ভদ্র মার্জিত, উচ্চকোটির ব্যাপার এঁদের, সল্টলেকে ছবির মতো বাংলো বাড়ি, বাইরের লনে একটি ফুটফুটে কিশোরী মেয়েকে দেখা যায় অনেক সময়েই। এইখানে 'য়ু অ্যামবিশাস বিচ?' এইখানে একজন প্রোফেসর স্বামী আরেকজন প্রোফেসর পত্নীকে মারেন?

বাসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিলকের মাথায় শুধু এই চিন্তাই ঘুরছিল। তার বাবা পদে ফোরম্যান, বিদ্যায় ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার, মা বি.এ পাসকোর্স। তাঁরা পর্যন্ত ঝগড়াকে মারামারি পর্যন্ত গড়াতে দেয়নি। আর এঁরা? জয়িতাদিই বা কী? ওই ভদ্রলোককে অমনি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে না বললেই কি চলছিল না? তবে সত্যিই যদি ভদ্রলোক পলিটিক্স করেন, মদে সিগারেটে আড্ডায় নিজের উপার্জন বেশিটাই খরচ করে ফেলেন, স্ত্রীকে গোটা সংসার চালাতে হয়, তবে এসব কথা উঠতেই পারে। উপরন্তু, ওই নোট্‌স নিয়ে আদেশজারি? জয়িতাদির নোট্‌স তিনি কাকে দেবেন, তিনি বুঝবেন? সার কেন খবরদারি করতে আসেন? ওঁদের কথায় বোঝা যায় কোনও এক সময় ওঁদের প্রেম-পর্ব চলাকালীন জয়িতাদি তাঁর নোট্‌স দিয়ে সারকে সাহায্য করেছিলেন। তার ফলেই সার ফার্স্টক্লাস পান। কিন্তু তারপর থেকে আর কিছুই করেননি। অথচ ওঁর স্ত্রী করে চলেছেন—এই নিয়েই অশান্তি।

হঠাৎ একটা কথা তিলকের মাথায় খেলে গেল। ওঁদের কথাবার্তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার, যে এই প্যাকেটে যা আছে তা হল নোট্‌স। অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো জয়িতাদির করা। এগুলো দেখবার লোভ সে সামলাতে পারছে না, পারবে না। হঠাৎ জয়িতাদিদের বাড়ির গোলমাল-অশান্তি, সুপ্রতীকবাবুর অভব্য আচরণ সব হুড়হুড় করে পেছনে সরে যেতে লাগল। সে জায়গায় সামনে যেন সমুদ্র মন্থন করে উর্বশীর মতো উঠে এল অপরূপ রূপবতী এক নগ্নিকা—নোট্‌স। জয়িতা ভাদুড়ি ভূতপূর্ব জয়িতা রায়ের রেকর্ড মার্কস পাওয়া নোটস্‌।

বাড়ি ফিরতে তিলকের আর তর সইছিল না। পথে আর একবার বৃষ্টি নামল। নোটস্‌-এর প্যাকেট পলিথিন-কাগজে মোড়াই ছিল, তবু সে দাঁড়িয়ে গেল একটা দোকানে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে দোকানটায়। ছাতা গুটিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টিটা দেখাচ্ছে ঘন কুয়াশার মতো। কুয়াশা স্থির থাকে, বৃষ্টিজনিত কুয়াশা খালি অস্থির। বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরে যাচ্ছে। তার পেছনে আর একটা কুয়াশার পরদা। সেটাও সরে যাচ্ছে একইভাবে। তার পেছনে আর একটা।

একজন বললেন—সব কেলো হয়ে গেল, বুঝলি নিতাই। সন্ধেবেলা তেরপল তছনছ হয়ে যাবে। তার তলায় তোর ম্যারাপে জল ঢুকে গিয়ে রং ধেবড়ে জঘন্য একটা ব্যাপার হবে। সাতশো লোক নেমন্তন্ন হয়েছে। তিনশোও হলে হয়।

নিতাই নামধারী বললেন—এ-ও হতে পারে দ্বিজুদা, এই দিনের বেলা বিষ্টিটা হয়ে আকাশটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সন্ধেবেলাটা ঠাণ্ডা, সাতশো না হোক ছশো নব্বুই জন লোক আরামে এসে গেল।

দ্বিজুদা বললেন—সবই নির্ভর করছে তোর এই বোনটা বাদুলে কি না তার ওপর।

—বা বা বা বা! বিয়ে ঠিক করবে শ্রাবণ মাসে, বিষ্টি হলেই কনের দোষ...

—ও দাদা একটু চেপে দাঁড়ান না...আর এক ব্যক্তি উঠে এলেন।

—দাঁড়ানোর আর জায়গা নেই, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

—একটু মাথাটা বাঁচাতে দিন। অবস্থা দেখুন না...চশমা পুরো ঝাপসা—এক বিন্দুও দেখতে পাচ্ছি না।

—কই জামাইকে তো তোমরা বাদুলে-টাদুলে বলো না!

—পিতৃতান্ত্রিক, দ্বিজুদা বললেন, বুঝলি না পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, সবটাতেই মেয়েদের দোষ ধরে।

—ধরে আবার কী! ধরি বলো।

একজন জনান্তিকে আর একজনকে বললে—একে বৃষ্টিতে ছয়লাপ। এদিকে আবার নারীবাদের আলোচনা ধরেছে। হাড়ে দুব্‌বো গজিয়ে দেবে আজ।

—আঃ ঠেলছেন কেন? পড়ে যাব যে!

—দেখুন, এখানে ঠেলাঠেলি একটু হবেই। দশজনের জায়গায় কুড়িজন দাঁড়িয়েছে, আমি আপনাকে ঠেলছি না।

—তবে আমি ঠেলিত হচ্ছি কী করে?

—আজ্ঞে, ভিড়ের স্বাভাবিক চাপের জন্যে।

আর একজন বললেন গোটা দেশটারই তো অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। ধরো পঁচিশ কোটি লোক খেয়ে-পরে শুয়ে-বসে আরাম করে থাকতে পারে, সে জায়গায় যদি নিরানব্বই কোটি লোক হয়ে পড়ে, তো সবেতে টান ধরবেই, সবেতেই ঠেলাঠেলি...

এই ঠেলাঠেলির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিলক ভাবছিল—হাঃ হাঃ হাঃ তোমরা জানো না, এই উতলধারা বাদল ঝরে'র মধ্যে সাত কোটি নিরানব্বুই কোটির ঠেলাঠেলির মধ্যে একজন জাস্ট একজন দ্যাট চোজ্‌ন ওয়ান দাঁড়িয়ে আছে, যার হাতে-নাতে উর্বশী। জয়িতা রায়ের নোট্‌স।

এই সময়ে বৃষ্টিটা একটু ধরল। অনেকেই নেমে গেল। তিলকের ছাতা নেই। ছাতা আবার তার বয়সের ছেলে কবে ব্যবহার করে? কিন্তু আজ সে কোনও ঝুঁকি নিল না। একটা বুড়ো পাকশিটে

মতো রিকশাঅলার রিকশায় নির্লজ্জের মতো উঠে বসল। বসেই বলল, এই হ্যাট্ হ্যাট্।

রিকশাওলা তার ঠোঙার মতো পলিথিনের কভার-এর ঘোমটা সরিয়ে খিঁচিয়ে উঠল—হ্যাট্ হ্যাট্ বলছেন কেন? রিকশা চালাই বলে কি আমাদের জান-মান নেই?

তিলক মনে মনে একটা জিভ কেটে বলল—না রিকশাদাদা, কিচ্ছু মনে করবেন না, এই জলে আপনাকে পেয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া পেয়েছি একটা।

এ কথায় কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেল না লোকটা। থুক করে একদলা থুতু ফেলল জলের মধ্যে। কোথায় যাবেন?

—আমহার্স্ট স্ট্রিট। এই আর একটু ভাই।

—আমহাস ইস্টিট অনেকটা।

—আরে না না, বেশিদূর না। বৈঠকখানার একটু আগে।

—তিরিশটা টাকা দিতে হবে কিন্তু।

—তিরিশ? আচ্ছা পঁচিশ দেব।

রিকশাঅলা ঠুং-ঠুং করতে করতে জল ভাঙতে লাগল।

বাদলের শেষ দুপুরে মাথা মুছে, জামাকাপড় পাল্টে এক কাপ চায়ের জন্যে রান্নাঘরের দিকে গেল তিলক। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাজের মাসি মিনু তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে মিনতির সুরে বলল—মিনুমাসানি একটু চা করে দেবে? বড্ড ভিজেছি ডিয়ার।

মিনু মাসানিটা শুনলে মিনু মাসি কেন যেন বড্ড খুশি হয়। সে হাসিমুখে ভ্রূকুটি করে বলল—সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু ডিয়ার ফিয়ার বললে দোব না।

আচ্ছা—ডিয়ার নয়, সুদ্ধু মাসানি। প্লিজ এক কাপ নয়, এক গ্লাস। মানে গেলাস।

কোণের ঘরে সে পড়ে। ছোট্ট ঘরটায় টেবিলে বইয়ের গাদা অগোছালো হয়ে আছে। দেওয়ালে একটা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে—জয় বাবা দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুর।

উর্বশীর ঢাকনা খুললে সে।

প্রিয় অমৃতা,

এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছ, তোমাদের জয়িতাদিকে যা ভাবতে তিনি তা নয়। কঠিনকঠোর নয়, তিরস্কারপ্রবণ নয়, ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাইভেট কোচিং-এ টাকা কামিয়ে বাড়ি-গাড়ি করার মতলবে ক্লাসটাকে অবহেলা করার ইচ্ছাও তাঁর নেই। তুমি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছ, যখন তোমায় আর ছাত্রী, শুধু ছাত্রী বলে মনে করতে পারছি না। তোমার এই ঘটনা আমার ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামীর দ্বারা ক্লোরোফর্মড হয়ে নার্সিংহোমে প্রেরিত হয়েছিলে, একটা সম্পূর্ণ সুস্থ মায়ের সুস্থ ভ্রূণকে বিনা কারণে অকালে নষ্ট করার জন্য, সম্পূর্ণ তোমার সম্মতি ছাড়া? এটা জানবার পর থেকে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে। অমৃতা, আমার দ্বিতীয় সন্তানকে আমি এমনিভাবেই হত্যা করেছিলাম। তখন আমাদের জীবনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সময়। সল্টলেকের জমিতে বাড়ি শুরু হয়েছে। ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছি। মেয়েকে অত্যন্ত দামি স্কুলে ভর্তি করেছি। আমার স্বামী যখন বললেন এ সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে, ভয়ে চমকে উঠেছিলাম। তারপর ভেবে দেখলাম—আমার আর কোনও সহায়সম্বল নেই, নিজের মেধা এবং পরিশ্রম করবার শক্তি ছাড়া। স্বামী অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, বুঝতেই পারছ কেন বিবাহিত দম্পতির পরিকল্পিত জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান আসে। দায় সম্পূর্ণ তার। সেই সে, অনায়াসে অবলীলায় নিজের সন্তানকে গর্ভে হত্যা করতে চাইছে, অর্থাৎ এর আর্থিক দায়িত্বও সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ একা আমার। তখন ভয়ে দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হয়ে এম.টি.পি করাই, তখন অ্যাক্ট পাস হয়ে গেছে। অমৃতা, তখন সে সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। জানি না তার লিঙ্গ। কিন্তু যা-ই হোক সে, আমার কাছে সে স্বাগত ছিল। জানি সে শুধু সম্ভাবনার তৃণাঙ্কুর। তবু তারপর

থেকে সে আমার দিনে-রাতে আমার চেতনা-অচেতনায় পেছু নেয়। অকাল-মৃত পিটার প্যানের মতো সে জানলার কার্নিশে বসে আমার দিকে তার শিশু চোখ মেলে থাকে, বলে, মা তুমি আমায় নিলে না? মা, তুমি আমার জন্যে কাঁদবে না মা? আমি তাকে নিইনি, কিন্তু তার জন্য বোধহয় আমরণ কাঁদব। তোমাদের ক্লাসে লেকচারের সময়েও সে হঠাৎ-হঠাৎ পেছনের বেঞ্চে এসে বসে থাকত। তখন আমি কথা খুঁজে পেতাম না। চোখে সব অন্ধকার দেখতাম। পড়তে গিয়ে আজকাল অনেক সময়ে বুঝতে পারি যে কিছু বুঝতে পারছি না। যেন গ্রীক ভাষা, লাতিন ভাষার গ্রন্থ খুলে বসে আছি। আমার সেই একান্ত নিভৃত জায়গা থেকে অমৃতা আমি তোমায় নমস্কার করছি। তোমার অবস্থানও আমার থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। কিন্তু তুমি তাকে স্বাগত করছ, করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। অমৃতা তোমার ভাল হোক। আজ থেকে, এখন থেকে আমি তোমার দিদি, দিদিও নয়, হয়তো বন্ধু। আমার কাছে তোমার দুয়ার খোলা। আমারই জন্য।

জয়িতাদি।

তিলক পাতা উল্টোল। ফিফথ্ পেপার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ উল্টে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, সিক্সথ্ পেপার থিয়োরি, থিয়োরি উল্টে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, সেভেনথ্ পেপার মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, এইটথ্ পেপার। প্রত্যেকটি টেক্সট ধরে খুঁটিনাটি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দীর্ঘ রচনা, পড়তে পড়তে তিলকের আর দিনরাত জ্ঞান রইল না। গভীর কোনও উপন্যাস, কিংবা পাতায় পাতায় ছড়ানো কোনও মগ্ন কবিতা, কিংবা সরস আলোকিত নিবন্ধের মতো রসময় সে সব। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মননে, হার্দ্য গুণে গভীর ভাষার ওজস্বিতায়, সংক্ষিপ্ততায় আদ্যন্ত চমক সৃষ্টি করা।

সে বুঝতে পারল কেন জয়িতা বাগচি গত পঁচিশ বছরের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে বিবেচিত, পুরস্কৃত। কেন তিনি সমস্ত য়ুনিভার্সিটি পলিটিক্স, পার্টি পলিটিক্সকে মাথা হেঁট করিয়ে তাঁর আসনে বসেছেন। এ-ও সে বুঝতে পারল—কেন জয়িতাদির আরও আরও কোনও উজ্জ্বল উত্তরণ ঘটছে না।

তারপরে তার চৈতন্যের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল। মাসিক পাঁচশো টাকা দিয়ে সে জয়িতাদির কাছে পড়তে যায়, কিন্তু এর সিকি ভাগও তিনি কোনওদিন তাকে বা আর কাউকে দেননি। প্রচণ্ড ক্ষোভ, আক্রোশ হল তার একটা। তখন রাত নটা। সে ছুটল নোট্স ফটোকপি করাতে। বহু রাত অবধি খোলা থাকে নিখিলদার জেরক্স কাম এস.টি.ডি. বুথ। নিখিলদা বললেন—রেখে যা। কাল বিকেলে দেখি শেষ করতে পারি কি না।

সে বলল—তা হবে না নিখিলদা, যতটা আজ পারেন করে আমায় দিন, রেখে আমি যাব না।

পর দিন বিকেলের মধ্যে যখন সব হয়ে গেল, মার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নেওয়া কড়কড়ে তিনশো টাকার তিনটে নোট সে তুলে দিল নিখিলদার হাতে। তার পরে আবার বিশদ পড়া। আসলগুলো আগের মতোই পর্বে পর্বে স্টেপ্‌ল করা, যাতে কিছু বোঝা না যায়। অমৃতার প্রতি জয়িতাদির চিঠিটা আলাদা কোনও খামের মধ্যে ছিল না, ছিল নোটসগুলোর সবচেয়ে প্রথম পাতায়, যেন সেটা কোনও মুখবন্ধ। নান্দীমুখ। তারপর আবার শুরু করল বিশদে পড়া। নকলগুলো। দেখবার জন্যে যে সব ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে কি না।

পরিষ্কার গাঢ় কালো কালি দিয়ে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লেখা। কেনই বা তার ফটোকপি খারাপ হবে? কিন্তু এইবার তিলক আবছাভাবে বুঝতে পারল কেন এ নোট্স জয়িতাদি তাদের দেননি। তারা কেউ এর সদ্ব্যবহার করতে পারবে না। এগুলোর সঙ্গে যেই নিজেদের কথা, নিজেদের রচনা, একটা বাক্যও ঢোকাতে যাবে, তেলে জলে মিশ খাবে না। এসব তাদের জন্য নয়। অনেক পড়াশোনা থাকলেই এগুলো ব্যবহার করা যায়। অমৃতাকেই বা কেন দিয়েছেন? অমৃতা-ও সে দরের ছাত্রী নয়। সে-ও এগুলো ব্যবহার করতে পারবে না বলেই তার ধারণা, জয়িতাদি এগুলো ওকে দিয়েছেন অভিনন্দন, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা জানাবার জন্য। সে সময়ে তাঁর অধ্যাপকী বিচারবৃত্তি কাজ করেনি।

পরের দিন যখন সে এসপ্ল্যানেডে এসে পাতাল রেল ধরল, তার মনে হচ্ছিল সে যাচ্ছে এক দুঃসাহসিক অভিযানে। কতদিন পরে দেখবে অমৃতাকে। অমৃতার প্রতি যে তার বিশেষ কোনও টান আছে তা নয়। আজকাল সমপাঠিনীরা সমপাঠীদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। খুব চালাক-চতুর হিসেবি হয়ে গেছে মেয়েগুলো। আগে কত শোনা যেত ক্লাস-বন্ধুদের রোমান্টিক প্রেম, রোমাঞ্চকর বিয়ে। ধুস্‌স্‌। মেয়েরা দেবে বাংলার অর্ডিনারি ছেলেকে পাত্তা? ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের, বন্ধুত্বও নয়, ক্লাস-বন্ধুত্বের। ওই একটু ক্যান্টিন কি কফিহাউজে হইচই। নোট্‌স আর বই দেওয়া নেওয়া, লাইব্রেরিতে চেইন-সিস্টেম তৈরি করে রাখা। শর্মিষ্ঠা ফেরত দিলে দোলা নেবে, দোলা ফেরত দিলে তিলক নেবে, তিলক ফেরত দিলে চঞ্চল। এইরকম। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে সেন্টের গন্ধ পায় ছেলেরা, কিন্তু কোনও রকম সেন্টু দেওয়ার ধারকাছ দিয়ে যায় না। অমৃতা আবার তার ওপর বিবাহিত মেয়ে। কিন্তু তিলকের এটা বরাবরই মনে হয়েছে অমৃতা একটু আলাদা। বড্ড যেন ঋজু, মেয়েলিপনা কম, বড্ড বেশি ওর আত্মবিশ্বাস, পরীক্ষার ফলাফলে ওর হেলদোল সবার থেকে কম। অথচ ওরা সবাই জানে, অমৃতাও ওদেরই মতো একটা কেরিয়ার চায়। প্রয়োজন অনুভব করে। এম.এ. পার্ট ওয়ানে শর্মিষ্ঠার ফার্স্ট ক্লাস এসেছিল, তিলক এগারো নম্বর কম পায়, অমৃতা মিস্‌ করে মোটে তিন নম্বরের জন্যে। হেলায় বলে দিল পার্ট টু-তে মেক-আপ দেবার চেষ্টা করব। দেব নয়, চেষ্টা করব।

—তোর আফসোস হচ্ছে না? দোলা জিজ্ঞেস করে।

—দূর! আফসোস করে হবেটা কী? ফিরবে আর রেজাল্টটা?

দোলা পঞ্চান্ন পার্সেন্টিও রাখতে পারেনি। কেঁদে কেটে একসা করছিল। অমৃতা ওকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

—করছিস কী দোলা, তুই কি এখনও স্কুলের ছাত্রী? খালি ক্যাসেট বাজিয়ে আর লেট-নাইট মুভি দেখে সময় কাটাবি, আর রেজাল্ট বেরলেই কাঁদবি?

—বেশ, আমি নষ্ট করি আমার সময়, তোরটা তো আর করি না! তোর কেন এক্সপেক্টেড রেজাল্ট এল না? তুই কী করছিলি?

—আমি? আমি এই রেজাল্টই আশা করিনি। আর আমার সময় কী করে কাটে একদিন তোকে তার হিসেব দিয়েছিলাম, হারিয়ে ফেলেছিস হিসেবের খাতাটা?

এরপর দোলা চুপ করে গিয়েছিল। তিলক বলেছিল—ঠিক আছে তুই আশাতীত রেজাল্ট করেছিস। সময় পাস না পড়বার। তো তোর পেপারে পেপারে এত তফাত কেন?

—যেটা ভাল লাগে না সেটা আসলে আমি পড়তে পারি না। যা হোক করে সেরে দিই। বোধহয় এই জন্যেই...

—জানিস যদি তো চেষ্টাটা ঠিকভাবে করলেই পারিস।

—দূর। যেটা ভাল লাগে সেটাই পড়ে শেষ করতে পারি না।

সেই অদ্ভুত মেয়ে অমৃতার আস্তানায় সে যাচ্ছে আজ। যথাসম্ভব গোপনতা অবলম্বন করে। কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন জয়িতাদি।

তখন বিকেল বেশ গাঢ় হয়ে উঠছে। বর্ষার গুমোট ভেঙে একটা মেঘলা হাওয়া দিচ্ছে। কালীঘাট স্টেশনে নেমে সে গড়িয়াহাটের অটো নিল একটা। মোড়ের আগে নেমে পড়ল। এইবার খুঁজতে হবে রাস্তাটা। এমন সময়ে সে দোলাকে দেখল। দোলা একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। ট্যাক্সিটা তার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকে একটি যুবক মুখ বার করে হাত নাড়ছে তখনও দোলার

দিকে তাকিয়ে। দোলাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। আজ ও ক্লাসে আসেনি। এইরকম কামাই করে প্রায়ই। তিলক প্রায় চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল—দোলা! এই দোলা! হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তার অভিযানের গোপনতার কথা। সে সুট করে বাসন্তীদেবী কলেজের দেওয়ালে সেঁটে গেল, দোলা কেমন দুলতে দুলতেই রাস্তা পার হল। ওদিকে গিয়ে বোধহয় বাস ধরবে কসবার। অটো-ফটোও ধরতে পারে। কে জানে কোথা থেকে কোথায় অটো চলে এদিকে। ছেলেটা কে? বেশ মডেল মডেল দেখতে। স্টাইলিশ। ট্যাক্সিতে এখানে দোলাকে নামিয়ে দিয়ে মডেল কেন হুশ্ হয়ে যায়? দোলার বয়ফ্রেন্ড না কি? ক্লাস কেটে এর সঙ্গে ঘুরছে দোল দোল দুলুনি! ঘোর বাবা ঘোর। তোরাই ঘোর। বড়লোকের মেয়ে, ব্যাগ-ভর্তি পয়সা-টাকা ঝনঝনিয়ে আসিস। প্রায়ই খাওয়াস ক্লাস-বন্ধুদের। কেরিয়ারের ভাবনা নেই। মডেল বয়ফ্রেন্ডও নিশ্চয় চাকরি-বাকরি ভালই জুটিয়েছে। জীবনের যা কিছু মজা তোরাই লুঠে নে রে দোলা। তিলকদের জন্যে আছে খালি বাবার প্রাণপণ উপার্জনের পাঁচশো টাকা মাস-মাস খরচ। আবার তিনশো টাকা দিয়ে অন্যের নোট্স চুরি।

বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগল। একটা রাস্তা আরেকটা রাস্তার সঙ্গে কাটাকুটি খেলছে এখানে বারবার। এদিকে যাবে? না ওদিকে? এদিকটাও ডোভার লেন। ওদিকটাও ডোভার লেন। লোককে এদিক ওদিক জিজ্ঞেস করতে করতে সঠিক ঠিকানায় এসে যাবার পর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিলক কুলকুল করে ঘামতে লাগল। এই সবুজ দরজা তো শুধু একটা দরজা নয়, একটা রহস্যের ঢাকনা। মিসেস শিবানী দত্ত। কে ইনি? অমৃতার বাড়ি সল্টলেকে করুণাময়ীতে। সেখানে থাকছে না অমৃতা। ওই শিবানী দত্ত কি ওর মাসি-পিসি জাতীয় কেউ হবেন? ওরা গোস্বামী মানে ব্রাহ্মণ। তবে কি আর ব্রাহ্মণদের কায়স্থ মাসি-পিসি হয় না? হতেই পারে। সে বেল টিপল। হাতটা বেশ কেঁপে গেল। একটু পরে দরজা খুলে গেল।

—কাকে চাই?

—মিসেস শিবানী দত্তর সঙ্গে একটু দেখা করব।

এই সময়ে ভেতরের কোনও ঘরে শাঁখ বেজে উঠল।

—ভেতরে আসুন।

যে ঘরটাতে বসতে দিল মেয়েটি সেটা একটা বৈঠকখানা ঘর। কিন্তু সোফাগুলোর ওপর ডাস্ট-কভার পরানো। বোঝাই যায় খুব বেশি বাইরের লোকের আনাগোনা নেই এখানে। কেমন একটা ধুলো-ধুলো গন্ধ। বদ্ধ ঘরের আবহাওয়াটা। মেয়েটি সুইচ টিপে দিতেই টিউববাতি উলঙ্গভাবে আছড়ে পড়ল আধময়লা ঘরটার ওপর। পাখা চলতে ক্লিক-চিক করে একটা শব্দ হতে লাগল, ক্যানোপিটাতে লাগছে বোধহয়। একটু পরে এক দোহারা চেহারার ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। কালো নকশা-পাড় শাড়ি পরা। কালো ব্লাউজ, বেশ ফিটফাট।

—তুমি...তোমাকে তো...

—আমার নাম তিলক মজুমদার। আমি অমৃতার য়ুনিভার্সিটির বন্ধু।

—অমৃতা? কে অমৃতা?

একটু ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেলেও তিলক বলল—জয়িতাদি মানে প্রোফেসর জয়িতা বাগচি আমার হাতে কিছু নোট্স পাঠিয়েছেন অমৃতার জন্য। আমি জানি এ ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। জয়িতাদি বিশ্বাস করে আমাকে দিয়েছেন।

—বসো একটু। উনি চলে গেলেন।

একটু পরে কাজের মেয়েটি এসে তাকে ওপরে যেতে বলল। উঠোনের ওপাশে ঢাকা দালানের মাঝ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। মেয়েটি সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

সিঁড়ির ঠিক মাথায় অমৃতা দাঁড়িয়েছিল। তিলক বিস্ময়ে, ধাক্কায় আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। অমৃতার বুকের তলা থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে পেট। তাকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে যে তিলকের

প্রথম ধাক্কায় চিনতে অসুবিধে হয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি তার মনে পড়ল জয়িতাদির চিঠিতে অন্তঃসত্ত্বা কথাটা। কেমন লাল হয়ে যাচ্ছিল সে।

—তিলক! তি-লক! তুই এসেছিস? ওঃ আমার কী যে ভাল লাগছে। একেবারে অন্যরকম।

তিলককে প্রায় হাত ধরে একটা ঘরে নিয়ে গেল অমৃতা। একদিকে তার পড়ার টেবিল। স্তূপীকৃত বই আর খাতা। সব গোছানো। চেয়ারের পিঠে একটা তোয়ালে ঝুলছে। একদিকে একটা ডিভান। বড় বড় জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। পর্দা উড়িয়ে।

তিলক বলল—এই নে, জয়িতাদি এই প্যাকেটটা তোকে দিয়েছেন।

—কী আছে রে এতে?

—নোট্‌স। আমার ধারণা।

—তোরা সব কে কেমন আছিস?

—ভাল। তুই?

—আমি? আমি আছি সেই রূপকথার রাজকন্যার মতো রাক্ষসপুরীতে ঘুমিয়ে। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি বদল করে আমায় জাগান যিনি, 'তিনি অবশ্য কোনও রাজপুত্তুর নন। তিনি আমার শিবানী মাসি। আমার ছোটবেলার বন্ধু সম্পদের মা। যাঁকে তুই নীচে দেখলি।'

—তোর বিপদ কেটেছে?

—যতক্ষণ না কেসটা উঠছে, কিছু তো বলা যায় না। ও সব কথা থাক। তোকে দেখে আমার য়ুনিভার্সিটির কথা, কলেজের কথা, ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই অ্যাটমসফিয়ারটা তুই বয়ে নিয়ে এসেছিস।

—তোর ছাত্রজীবন তো চলছে এখনও?

—না রে, আমি যেন কোনও বয়স্ক বিধবা প্রাইভেট পরীক্ষা দিচ্ছি। আমার কোনও বন্ধু ছিল না। সহপাঠী ছিল না। কোনও টিচার আমায় কোনও দিন...

—তুই অজ্ঞাতবাসে আছিস তাই। আমরা প্রত্যেকে তোর জন্যে ভাবি। গেলে দেখবি সেই আগের মতো।

—তোরা তেমনি কফিহাউজে গিয়ে গুলতানি করিস?

—যাই। গুলতানিটা খুব জমে না। তুই নেই তো।

—বাজে কথা বলিস না তিলক। মন-ভোলানো কথা বলছিস এবার।

—সত্যি বলছি। মাঝখান থেকে একজন উবে গেলে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়, হাওয়া সেখানে ঢুকতে পারে না।

—দূর, আমি জানি দোলা খুব খুশি আছে, লাবণি খুব ভাল আছে, শম্পা খুব...অবশ্য শম্পাকে তো তুই চিনিস না।

—হয়তো। ওদের কথা বলতে পারি না। আমি খুব, আমার খুব বাজে লাগত। অরিন্দমদা আমাদের আশ্বস্ত করলেন তাই...

—কে অরিন্দমদা?

—উনি লাবণির...মানে লাবণির সঙ্গে বিয়ের জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে এসেছিলেন।

—আচ্ছা? লালটু ঘোষ? উনি তো প্রায়ই আসেন এখানে।

—সত্যি? আসলে তুই হয়তো জানিস না লাবণি তোর ব্যাপারটার পর খুব ভয় পাচ্ছিল বিয়ে করতে। ওকে আশ্বস্ত করতেই উনি আমাদের নিয়ে 'উজ্জীবন'-এ ডঃ কার্লেকরের সঙ্গে দেখা করেন। পরে ডঃ কার্লেকর ওঁকে কী বলেছেন জানি না। উনি আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন। তা হলে তোর সঙ্গে ওঁর রেগুলার যোগাযোগ আছে।

—আরে উনিই তো মা-বাবার খবর আমায় এনে দেন। আমার খবর মা-বাবাকে দেন। তোদের খবরও মোটামুটি...

—এ সব কিছু কিন্তু উনি আমাদের বলেননি। শুধু বলেছেন ডঃ কার্লেকর তোর ব্যাপারে সব জানেন। ভয়ের কিছু নেই।

শিবানী মাসি প্রচুর খাওয়ালেন তিলককে।

পরদিন সকাল আন্দাজ সাতটা। তিলকদের ফোন বেজে উঠল। তিলকই ধরেছিল।

—হ্যাললো—

—তিলককে একটু ডেকে দেবেন।

—তিলক বলছি।

—ও, তিলক! আমি অমৃতা। শোন ভাল করে, তুই যা আমায় দিয়ে গেছিস সেগুলো অমূল্য রত্ন। ওগুলো আমি তোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

—সে কী? জয়িতাদি ওগুলো দিয়েছেন তোকে। আমি তো জয়িতাদির কাছে বাড়িতে কোচিং নিই। আমাদেরও নিশ্চয় দেবেন।

—দিলে ভাল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এগুলো স্পেশ্যাল নোট্স। উনি আমাকে বিশেষ ভালবেসে, করুণা করে...

—তবেই দেখ। তোরই জন্যে ওগুলো।

—ঠিক। কিন্তু তুই আমাকে এগুলো অখণ্ড, অমলিন পৌঁছে দিয়েছিস, তোর আর আমার স্পেশ্যাল পেপার এক। শোন, আমি এগুলো জিরক্স করিয়ে নিচ্ছি, দুটো করে কপি। একটা তোর, একটা আমার...

এবার তিলক আর থাকতে পারল না। সে অস্ফুট গলায় বলল—অমৃতা, আমি ওগুলো অল রেডি জিরক্স করে নিয়েছি। জয়িতাদির চিঠিটাও পড়েছি। প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করিস।

ও প্রান্তে নীরবতা। কিন্তু তিলক ফোন ছাড়তে পারছে না। একটু পরে সে আবার বলল—বুঝতে পারছি, আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। আমি নোট্স বুঝে ওগুলো দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি রে। চিঠিটা তো কোনও খামের মধ্যে ছিল না। খুলতেই সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে, নোট্সগুলো ইউজ করবার ক্ষমতাই আমার নেই। কিন্তু চিঠিটার মর্ম থেকে বোধহয় কিছু শিখতে পারব...

ও পাশ থেকে ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এল—আমি তোর মনটা বুঝতে পারছি। কিন্তু...কিন্তু জে.বি. ওটা দেবার মতো বিশ্বাস একমাত্র তোকেই করতে পেরেছিলেন।—অমৃতা ফোনটা রেখে দিল।

সারাদিন ছটফট করতে লাগল তিলক। মা, বাবা, দাদা, সবাই লক্ষ করেছেন।

মা বলল—কী হয়েছে বল তো তোর? কাল বোধহয় সারারাত পড়েছিস। অমন করিস না। অত পড়লে পরীক্ষার সময়ে মাথায় সব গোল পাকিয়ে যাবে।

বাবা বলল—তোর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু আশা করে আমরা বসে নেই রে তিলু, তুই নিজেকে বেশি কষ্ট না দিয়ে যতটুকু পারবি, তাতেই হবে।

দাদা বলল—তা ছাড়া কম্পিউটারও তো শিখছিস। কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

সবাইকার কথার মধ্যে বাবার কথাগুলোই সবচেয়ে বিঁধল তিলককে। তার কাছ থেকে অসাধারণ কিছু আশা করেন না? কেনই বা আশা করবেন? একটা অর্ডিনারি ছেলের থেকে বেশি কী-ই বা সে? দাদা বেটার। কিন্তু, সব বাবা-মাই নিজের ছেলের কাছ থেকে বড় কিছু আশা করে থাকেন। তার বেলায় সে আশাটুকুও নেই বাবার?

দাদাই বা কী? কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে? দাদা স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট করে আই এস আই-তে যোগ দিয়েছে। মাইনে-কড়ি ভাল। তার চেয়েও ভাল তার খাতির।

দাদার বিয়ের সময়ে ঘটা করে পাত্রী দেখা হবে। প্রকৃত গৌরবর্ণা, উচ্চশিক্ষিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তার বেলায় জুটবে একটা খেঁদি-পেঁচি। কেউ তার জন্যে তার চেয়ে বেশি আশা করে না তো!

য়ুনিভার্সিটি যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। যাই হোক। কম ক্লাস, এবং জে.বি-র ক্লাস নেই। সে আড়াইটের সময়ে বাড়ি ফিরে এল। তারপর তিনটে সওয়া তিনটেয় একটা ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ক্লাসে দোলা এসেছিল আজ। প্রথমটা সে লক্ষই করেনি। পরে হঠাৎ দোলা সামনে দিয়ে যেতে সে দেখল দোলার মুখ চোখ কেমন বসে গেছে। রোগা হয়ে গেছে খানিকটা। কালোও।

সে কয়েকটা কথা ছুড়ে মারল দোলার দিকে—কী রে? খুব প্যার মারছিস?

দোলা চমকে ফিরে তাকাল, ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

—ফ্যাকাশে মেরে গেলি কেন? ভাল তো? প্রেম-ট্রেম তো খুব স্বাস্থ্যকর জিনিস, যে বয়সের যা!

—এ ভাবে বলার মানে?—দোলার গলায় রাগ।

—কী আশ্চর্য! দেখলাম মডেল-বাহার এক ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! বলব না?

—আমার গার্জেন না কি তুই?

—কখনওই না। তোর বন্ধু, সখা। প্রাণসখা নই অবিশ্যি। তা জোটালি কোত্থেকে?

দোলা এবার খেপে গেল—ইয়ার্কি মারিসনি তিলক, ভাল হবে না।

—ভাল তো আমার এমনিতেও হবে না। অমনিতেও হবে না। ইয়ার্কিই তো সম্বল। তো বাড়িতে নুকিয়ে নুকিয়ে, ক্লাস কেটে প্রেম পরীক্ষার মুখোমুখি! খারাপ হলে আবার কাঁদিসনি—ভেউ ভেউ ভেউ।

তিলক সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল। লাবণি আর শর্মিষ্ঠা আসছে। পেছনে চঞ্চল। এক্ষুনি বলবে—কী হয়েছে রে দোলা? তখন তিলকের চেয়ে দোলাই বেশি অপ্রস্তুতে পড়বে।

এখন ডোভার লেনের ঠিকানাটা পরিষ্কার চেনা হয়ে গেছে তার। সে নেমে, একটা দোকানে একটা চিকেন রোল খেল। আর একটা মুড়ে নিল পলিথিন ব্যাগে।

চারটে বেজে গেছে। আশা করা যায় অমৃতার বিশ্রাম হয়ে গেছে। সে বেল বাজাল। শিবানী দত্ত দরজা খুললেন। সে প্যাকেটটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা অমৃতাকে দিয়ে দেবেন।—তারপর পলিথিন প্যাকেটে রোলটাও এগিয়ে দিল—এটাও। মানে আমি খেলাম তো...তাই...

—চলে যাচ্ছ কেন? বা রে ছেলে। এতটা পথ এসে মাসির বাড়ির দোরগোড়ায় ঢুকবার আগেই খেয়ে এসেছ, আবার চলে যাওয়া হচ্ছে!

—একটু তাড়া আছে আজকে মাসিমা।

—ও সব আমি শুনছি না। ওপরে যাও। তোমার প্যাকেট, রোল সব যার জিনিস তাকে দিয়ে দাও। আমি পারব না।

খুব চালাক মহিলা। একটা জিনিসও হাত দিয়ে ছোঁননি।—এসো। এসো বলছি!

অগত্যা, ভেতরে ঢুকতে হয়। ওপরে উঠতেও হয়, অমৃতা ডিভানে শুয়ে ছিল। তাকে দেখে উঠে বসে বলল—ওমা তুই! আয়! আয়!

—বসব না রে, কাজ আছে, তুই এই প্যাকেটটা রাখ, আর এই রোলটা খা।

রোলটা হাত বাড়িয়ে নিল অমৃতা। প্যাকেটটা নিল না। বলল—তোর?

—আমি খেয়ে ঢুকেছি।

—শিবানী মাসির বাড়ি কক্ষনো খেয়ে ঢুকবি না, উনি রেগে যাবেন।

—কে কীসে রেগে যায় আমি কেমন করে জানব বল।

রোলে একটা কামড় দিল অমৃতা।

—আ-হ। কদ্দিন পরে খেলাম। অমৃত, একেবারে অমৃত।

—ভাল লাগছে?

—বলছি তো—অমৃত। আমার এখন নিমপাতাও ভাল লাগে। সে জায়গায় এ তো চিকেন রোল।—তা ওটা কী?

—একটা প্যাকেট!

—আবারও প্যাকেট? এবার কে দিলেন। এ. আর.? সব্বাইকে আমার খোঁজখবর দিয়ে দিয়েছিস, না কী?

তিলক বলল—আমার একটু তাড়া আছে। চলি। পরে খুলে দেখিস।

হাত বাড়িয়ে তাকে খপ করে ধরল অমৃতা। —যাবি কোথায়?

—প্যাকেট খুলে আগে দেখব কী আছে এতে, তবে। যদি আর ডি এক্স থাকে? তিলক হাসল না। বসলও না। দাঁড়িয়েই রইল।

অমৃতা খুলে দেখল ফটোকপিগুলো।

তার দিকে তাকিয়ে বলল—খুব রাগ করেছিস?

—না, না। রাগ করব কেন?

—তবে? অভিমান? লজ্জা? অপমান? অনাদর? ক্ষোভ? অনুতাপ?

তিলক কিছুই বলল না।

—সবগুলোই, না রে? জয়িতাদি তোদের এই সব নোট্‌স দেন না কেন রে? কত টাকা ফিজ নেন?

—পাঁচশো।

—পাঁ-চ-শো?

—হ্যাঁ আমি পাঁচশো দিই, অন্য কেউ ছশোও দিতে পারে। সাতশো, আটশোও আছে।

—তবু তোদের নোট্‌স না দেওয়ার কী মানে?

—আমাদের ক্ষমতা কী যে এ সব নোট ব্যবহার করি। বাড়ি গেলে যত্ন করে পড়ান। দরকার মতো নোট্‌সও দেন বই কি।

—বোস তিলক, প্লিজ। আমি তোর কাছে মাফ চাইছি।

—আমার কাছে? কেন?

—আগে বোস।

তিলক বসলে সে বলল—আগে বল যা বলব তাতে কিছু মনে করবি না?

তিলক কিছু বলল না।

অমৃতা বলল—কাজটা তুই অনৈতিক করেছিস। আমার বিচারে জয়িতাদিও ন্যায় করেননি। এই যদি ওঁর মনে ছিল, উনি নিজে এসে দিতে পারতেন এগুলো। অবশ্য, দ্যাট ইজ এক্সপেক্টিং টু মাচ। সেটা উনি পারেননি। একজন ছাত্র যে পাঁচশো টাকা নিয়ে ওঁর কাছে পড়ে, তার হাত দিয়ে তিনি অমূল্য সব নোট্‌স পাঠালেন এমন একজনের কাছে, যে ওঁকে একটা বাড়তি পয়সাও দেয় না।

—অমৃতা, তোর কেস আলাদা। এটা আমরা বুঝি। তুই দিনের পর দিন ক্লাস করতে পারছিস না, লাইব্রেরি ইউজ করতে পারছিস না...। তা ছাড়া তোর এখন ভাল রেজাল্ট করা দরকার।

—কথাটা তা নয় রে, ছাত্রদের বিশেষত কোচিঙের ছাত্রদের প্রতি টিচারদের দায়বদ্ধতা থাকার কথা। ঠিক আছে, উনি তোদের যা দেন, তা-ই দিতে পারতেন আমাকে। দুরকম করলেন কেন? এটা উনি করেছেন ঝোঁকের মাথায়।

—না, না, উনি তোকে বিশেষ ভালবাসেন। ভালবাসার দানের কোনও বিচার নেই।

—ভালবাসা নয়, করুণা, নিজের ভেতরের পাপবোধ।

—আচ্ছা তাই। কিন্তু উনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অমৃতা তোকে উনি নমস্কার পর্যন্ত জানিয়েছেন।

—সেই ইমপালসিভ, নিজের বিবেক দংশনের শাস্তির জন্য নমস্কার আমি গলবস্ত্র হয়ে নিতে পারি না তিলক কী এমন করেছি আমি? যখন অ্যাবরশন করাতে অরাজি হই, তখন কি জানতাম এ নিয়ে আমার প্রাণসংশয় হবে? ওরা আমার ওপর জবরদস্তি করবে? মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে? যদি জানতাম তা হলে অবশ্য পালাতাম। কিন্তু সেটা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। আমার মধ্যে যে বেড়ে উঠছে তার জন্যে কোনও বাৎসল্যবোধ থেকে নয়।

—এত বিশ্লেষণ করিস না অমৃতা, জয়িতাদির জন্যে তোর কষ্ট হয় না?

—হয়, হয়। কিন্তু সেটা আলাদা কথা। উনি যেটা করেছিলেন তার মধ্যে ওঁর স্বামীর চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু উনিও ওই বাড়ি, ওই গাড়ি, ওই জীবনযাত্রা, ওঁর প্রথম মেয়ের শিক্ষা ইত্যাদিকে বড় করে দেখেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, এখনকার আইনের চোখে এটা ক্রাইম নয়, কিন্তু নৈতিকতা-মানবিকতার দৃষ্টিতে চিরকালই এটা পাপ থাকবে। সেই মানবিকতা বোধ বিকল করে দিয়েছে জয়িতাদিকে। নিশ্চয় তাঁর জন্য আমি ফীল করছি। কিন্তু আমি সিচুয়েশনের সঙ্গে ওঁরটার কোনও ইকোয়েশন আসে না। কে বলতে পারে সে রকম সিচুয়েশনে আমি কী করব। অরিসূদন বলে লোকটা বা তার বাবা বা মা কেউ সামনে এলে এখন আমি অকাতরে এদের খুন করে ফেলতে পারি। একটা রিভলভার আর কিছু কার্তুজ চাই অবশ্য। ছুরি টুরি মারতে পারব না। তা এটাই কি মানবিক?

—না। ওঁরা তোর চরম ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, কাজেই...এটা স্বাভাবিক।

—না স্বাভাবিক নয়। প্রাণ নেওয়ার অধিকার কারও নেই। আর সত্যিই আমি এটা কথার কথা বলছি না। আই ফীল লাইক কিলিং দা হোল লট অফ দেম। ইন কোল্ড ব্লাড, দেম অ্যান্ড দেয়ার লাইকস। ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু ক্যাসট্রেট দ্যাট ফেলো, অ্যান্ড দেন কিল। যদি না করি, সেটাও কিন্তু অন্যায় হবে। আর সেই অন্যায়টা আমি করব আইন আর সমাজের ভয় থেকে। জয়িতাদির পাপবোধ থেকে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকার এসেছে। সেই বিকার থেকেই এই নমস্কার। আমরা কেউ কারও শ্রদ্ধার যোগ্য নই রে, সবাই পরিস্থিতির শিকার। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সবাই।

—তোর হাজব্যান্ডও?

—না, ও পাপিষ্ঠগুলোকে বাদ দিচ্ছি। তবে আমি আজও জানি না ওদের মোটিভটা ঠিক কী? তুই ভাব না—নিজেদের প্রথম সন্তান, নিজেদের প্রথম নাতি আসছে, সংসার সচ্ছল। সুদ্ধু বউ কিছুদিনের জন্যে ওঁদের চাকরানিগিরি করতে পারবে না বলে...নাঃ ভাবা যায় না।

—তাই? এই রকম ব্যাপারটা?

—তাই তো বুঝেছি। আরও কিছু আছে। থাকলে থাকবে, না থাকলে না থাকুক। ইন দ্য মিন টাইম, তিলক আমরা এই নোট্‌সগুলো একটু ডিসকাস করে পড়তে পারি। এগুলো মুখস্থ করে উগরে দিলে কিছু শেখা যাবে না।

—বলছিস? তুই তাই চাস?

—ভী-ষণ উপকার হয় আমার তা হলে। যদি চাস আমি জয়িতাদিকে জানিয়ে দেব, আমি এগুলো তোর সঙ্গে শেয়ার করছি। বড্ড কঠিন বলে।

—তুই যা ভাল বুঝিস করিস। শনিবার-রবিবার আসছি তা হলে?

—হ্যাঁ। ঠিক দুপুর আড়াইটে। রাইট?

১৯

তিলক যেমন দোলাকে দেখেছিল, দোলাও ঠিক তেমনি তিলককে দেখতে পেয়ে যায়। মানুষই চোখের কোনা দিয়ে, আবার অনেক সময়ে সোজাসুজি না তাকিয়েও দেখতে পায়, এ সেই রকমের

দেখা। কিন্তু তখন সে রাস্তা পার হচ্ছে, তিলকের মতো বাসন্তী দেবী কলেজের গায়ে সেঁটে যাওয়ার উপায় তার ছিল না। আগে ট্যাক্সি থেকে দেখতে পেলে, আর একটু সাহসী হয়ে বিজন সেতুটা পার করে দিতে বলত সে অমিতকে। এমনিতে দেখা হয়ে গেলে সে এতটা বিব্রত হয়ে পড়ত না। শম্পার সঙ্গে যখন পার্ক স্ট্রিট-রাসেলের মোড়ে দেখা হল তখন তো শম্পাকে সে আইসক্রিম পার্লারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলই। কিন্তু আজকে তার মন খিঁচড়ে ছিল। ট্যাক্সিটাকে তারা ধরে ঠিক সন্ধের মুখে, বিদ্যাসাগর সেতু পার হয়ে চলে যায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মুখ পর্যন্ত। আবার ফেরে, তারপর জু গার্ডেনের পথে বেলভেডিয়ার আলিপুরের নির্জন রাস্তাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বড্ড বেশি সাহসী হয়ে উঠেছিল অমিত। অতিরিক্ত। দোলার শরীর টং টং করে সরোদের মতো বাজছিল। বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। ইচ্ছেও না। কিন্তু এই সময়ে ট্যাক্সিচালক বলে ওঠে আপনারা বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। হোটেলের ঘরে-টরে এসব করগে যান না, বেশ্যাদের তাই তো দস্তুর। আমার ট্যাক্সি ভদ্দরলোকের ট্যাক্সি।

অমিত তেড়ে উঠে বলেছিল—মুখ সামলে কথা বলবে। কে তোমার পরামর্শ চেয়েছে। এক্ষুনি থামাও, তোমার গাড়ি থেকে নেমে যাব আমরা।

—সেই ভাল, ট্যাক্সিচালক বলে, নইলে আমি সিধে আপনাদের আলিপুর থানায় নিয়ে যাব।

তারা ভাড়া চুকিয়ে নেমে যেতে ট্যাক্সিচালক হঠাৎ দোলার দিকে তাকিয়ে বলে—আপনারে তো বাইরে থেকে বেবুশ্যে বলে প্রত্যয় হয় না। সেকালে ওই ছোকরাটাই বেবুশ্যে। খানকি একটা।

হুস করে গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল তার পর।

আরেকটা গাড়ি ধরতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তখন দোলার চোখ দিয়ে ক্রোধ ও অপমানের অশ্রু গড়াচ্ছে। অমিত ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে অনেকভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

তখন আপনমনে অমিত বলেছিল—ট্যাক্সির এই ধরনের ব্যবহার তো আজ নতুন নয়, অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাই এভাবে ট্যাক্সিতে...এমন কি নববিবাহিত দম্পতিরাও, শুধু কলগার্ল আর তাদের ক্লায়েন্টদের সম্পত্তি নয় ট্যাক্সি, এ লোকটা অমন ভাবে রি-অ্যাক্ট করল কেন? আসলে ও নিজেও এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিল বুঝলে? নিজে পাচ্ছে না। অন্যে পাচ্ছে।

ক্রোধ ও লজ্জার বদলে ঠাণ্ডা মাথার এই বিশ্লেষণে দোলার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথাও সে বলেনি। বাড়ি ফিরে প্রথমেই বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছিল, সাবানের চন্দন গন্ধে অশ্লীল শব্দগুলোর নোংরা যেন নিজের গা থেকে ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু স্মৃতিকে তো ধোওয়া যায় না। বাথরুম থেকে যখন বেরোলো মা অবাক হয়ে বলল—তোর কী হয়েছে বল তো? কার সঙ্গে ঝগড়া করে এলি? তিলক না লাবণি?

মুহূর্তে মায়ের জন্য করুণায়, আর নিজের জন্য অকথ্য গ্লানিতে মন ভরে গেল তার। বেচারি মা, এত বয়স, এত অভিজ্ঞতা, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, নাতিপুতি হল বলে, কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারে না। দোলা অনেকদিন ধরেই এ রকম অনিয়মিত আসা-যাওয়া করছে, আয়নায় চেয়ে দেখলে নিজের চোখের তলায় অনিয়মের কালি দেখতে পায় সে। খেতে পারে না ভাল করে। বেশি কথা বলে না কারও সঙ্গে। মা, বাপি কেউ তার এই পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক মনে করেনি। বাপি সেদিন বলল—পরীক্ষাটাকে অত সিরিয়াসলি নিসনি দোলা। এ আবার কী ধরনের নার্ভাসনেস? টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি।

মা বলল—পুজোর সময়ে চলো কোথাও ঘুরে আসি। কদিন একটু ফ্রেশ হয়ে নেবে। তারপর পরীক্ষাটা শেষ হলে বেশ বড় করে বেড়ানো যাবে। কী রে দোলা? দোলা ঘাড় নেড়ে ছিল।

প্রেম তা হলে মানুষকে এমনি একা করে দেয়? মনটা হু হু করে ওঠে তার, এই মা, এই বাপি, এই বাড়ি, ওই জানলা সবই কেমন অবান্তর হয়ে গেছে আজকাল তার কাছে। কেমন উদ্বৃত্ত, অদরকারি! যে মা বিশেষত বাপিকে সে চক্ষে হারাত, তাদের এখন অল্প চেনা মানুষ বলে মনে হয় তার। মা

গা ঘেঁষে দাঁড়ালে তার বিরক্ত লাগে, বাপি মাথায় হাত রাখলে অস্বস্তি হয়। আর সত্যিই তো পরীক্ষা এগিয়ে আসছে!

দোলা বই খুলে বসে, অক্ষরগুলো পোকার মতো হেঁটে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে টেব্‌ল ল্যাম্পের আলোর বৃত্তের মধ্যে। বইয়ের পাতায় মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ তাকে খেতে ডাকতে এসে তার মায়ের হৃদয় দ্রব হয়ে যেতে থাকে। উঃ কী খাটুনিই না যাচ্ছে মেয়েটার! কী যে সিলেবাস করে এরা।

তাঁদের সময়েও আটটা পেপার ছিল। একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে হত। একদিন অন্তর অন্তর। একেবারে নিয়ম করে। এখন তো তবু দুটো পার্ট। নভেম্বরে চারটে পেপার আর দিতে হবে দোলাকে। পার্ট ওয়ানটাতে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রাখতে পারেনি। আজকাল মুড়িমুড়কির মতো ফার্স্ট ক্লাস বেরোয়। সে জায়গায় ফিফটি-ফাইভ-ও না হলে দোলার মান থাকবে না। তাঁর ইচ্ছে এম.এ. করে দোলা কিছু কাজ-টাজ করুক। একটা টি.টি ট্রেনিং নিয়ে নিলে অনায়াসে তাঁদের স্কুলে নিয়ে নিতে পারা যায়। তাঁর কিন্ডারগার্টেন ট্রেনিং আছে। তিনি নার্সারি, কেজিগুলো দেখাশোনা করেন, তার ওপরের গুলোতে দোলা পড়াবে। মা মেয়ে দুজনে বেশ একসঙ্গে স্কুলে যাবেন। বড়মেয়ের বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। কথাবার্তায় ধরন ধারণে সে যেন এখনই সাত গিন্নির এক গিন্নি। রান্না, শাড়ি, পরিচর্চা, বরের চাকরি এ ছাড়া আর ভূ-ভারতে কোনও কিছুতে আগ্রহ নেই। দোলাটা আর কিছুদিন কুমারী জীবনযাপন করুক। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুখ স্বাধীনতা উপভোগ করুক।

তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকলেন— দোল। খাবি না! আয় টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছে।

দোলা তেমনি ঘুমিয়ে যেতে লাগল। মাথাটা জোর করে একটু তুলতে গেলেন তিনি। বই, বইয়ের পাশে খাতা। খাতার লেখাগুলোর কালি জলে ধেবড়ে গেছে। বইয়ের পাতাও ফুলেও উঠেছে। দোলার নাকের পাশে চোখের জলের নুন শুকিয়ে রয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। —অমৃতা! অমৃতাকে আজও পাওয়া যায়নি। দোলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাঁদছে তার জন্যে। তিনি জানেন দোলার কাছে অমৃতা কী! ওর পরামর্শদাতা, বন্ধু, শ্রদ্ধামিশ্রিত একটা বন্ধুত্ব বোধ আছে দোলার অমৃতার জন্যে। এমনিতে তাঁর মেয়ে খুব খোলামেলা। কিন্তু ইদানীং ও অমৃতার কথা বলতই না। কথা তুললেও চুপ করে যেত। বেদনা যখন গভীর থেকে আরও গভীরে চলে যেতে থাকে তখন এই ধরনের গুমোট নেমে আসে একটা মানুষের মেজাজে। অমৃতার জন্য তিনিও কম উদ্বিগ্ন নন। একজন মা বলে, একজন নারী বলেও। কিন্তু দোলার সঙ্গে কি আর তাঁর উদ্বেগের তুলনা চলে? ইস্‌স্‌ কত কালো রোগা, গম্ভীর, আনমনা হয়ে যাচ্ছে তাঁর আদরের মেয়েটা।

—দোলা, দোলা,—এবার জোরে জোরে ডাকলেন তিনি।

দোলা আধখানা চোখ মেলল, লাল চোখ।

—চল, খাবি চল।

—ন্‌না।

—না বললে হয়?

—খিদে নেই।

—এমন কোরো না দোলা। বসবে তো চলো, বাপি কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এ-সো—তিনি একটা টান দিলেন দোলার কাঁধে।

—উঃ, এমন জবরদস্তি করো না! একটুও ভাল্লাগে না।

খুব অনিচ্ছুক পায়ে উঠে গেল দোলা। খেতে তার গা বমি-বমি করছিল।

পরের দিন মা-বাপি বেরিয়ে গেলে যখন অমিতের ফোন এল, সে রুক্ষ গলায় বলল—আমি মাঠে-ঘাটে আর ঘুরতে পারব না। আমাদের বাড়িতে এসো। মায়েদের সঙ্গে কথা বলো।

—কী কথা?

—কী কথা মানে? ব্যাঙের মাথা।

দোলা ফোন রেখে দিল। য়ুনিভার্সিটি চলে গেল।

পর দিন আবার ফোন। মা বাড়ি ছিল। মা-ই ধরেছিল। বলল—তিলক ফোন করছে। তোদের য়ুনিভার্সিটির।

দোলা সত্যিই ভেবেছিল তিলক।

তিলকের আবার আমাকে কী দরকার পড়ল? ফাজিল একটা...ফোন ধরতেই ও পাশ থেকে গাঢ় গলা ভেসে এল—দোলা, দোলা, দে দোল দোল, এ মহাসাগরে তুফান তোল, বঁধুরে আমার পেয়েছি এবার ভরেছে কোল...

—কী হচ্ছে? দোলার গলায় ভাবের ছোঁয়া লেগেছে।

—প্লিজ দোলা, মনে হচ্ছে কতদিন দেখিনি।

—আমার যা বলবার বলে দিয়েছি তো! পড়াশোনা নেই? তোমার চাকরি নেই?—আড়চোখে মা চলে গেছে দেখে সে বলল।

—কাজ যার যার সে তো আছেই। আমি তো চিনসুরায় ট্যুর করব, আর তুমি তো লাইব্রেরি যাবে। যাবে না?

—না।

—শনিবার, তোমার ক্লাস নেই, আমারও হাতে সময় আছে। একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে। দেখলে ভী-ষণ অবাক হয়ে যাবে, খুশি হবে।

—কোথায়? তাজ বেঙ্গল?

—দূর পেটুকরাম, দেখোই না, তাজ বেঙ্গল নয় একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল।

সেই রয়্যাল বেঙ্গলেই আজ এসেছে সে। সল্টলেকের পূর্বাচলে একটা চমৎকার বাংলো বাড়ি। একটা অপরূপ ঘাসের লন পেরিয়ে, কয়েকটি সুদৃশ্য ধবধবে সিঁড়ি পেরিয়ে একটা আয়না পালিশের দরজা। তাতে পেতলের ওপর কাজ করা মোটা হাতল। দরজার মাঝখানে একটা পেতলের ভেনাস বসানো। সগর্বে তালা খুলল অমিত। শেষ দুপুরের ঝিমিয়ে পড়া আলোয় যেন স্বপ্নলোক উঠে এল। এ ঘরের সেন্টার টেবল হল একটা মস্ত তামার টাট। কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর আদর করে বসানো। চার পাশে নরম কোরা রঙের সোফাকৌচ, তাতে ঝলসাচ্ছে কতকগুলো নানান ডিজাইনের কুশন। চমৎকার একটা কোরা, লাল খয়েরির কার্পেট তলায়। পর্দাগুলোও কোরার ওপর ছোট্ট ছোট্ট ডিজাইন। পাশে পাশে সুন্দর নিচু নিচু শোকেস নানান উচ্চতার, কোনওটাতে বই, কোনওটাতে ক্রিস্ট্যাল, কাট গ্লাস, কোনওটাতে নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করা শিল্পদ্রব্য। প্রায় প্রত্যেকটা কেসের মাথায় পাশে পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, কি পিতলের আধারে সবুজ পাতা মেলা গাছ। একটা দেওয়ালে একটা বিরাট ছবি। মধুবনীর। নানান গ্রাম্য কাজকর্মের নকশা তাতে। তার ঠিক তলায় একটা লম্বা বেতের ডিভান। আর একটা দেয়ালে লম্বিত স্ক্রোল একটা। অজন্তার বুদ্ধ রাহুল যশোধরার।

সিডি প্লেয়ারের মধ্যে রেকর্ড পুরে চালিয়ে দিল অমিত। অমনি মধুর সেতারের আওয়াজে ঘরের দিবানিদ্রা ভেঙে গেল। চমকে উঠে এ ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল গাছগুলো। পাখার হাওয়ায় সামান্য একটু দুলে উঠছে ওদের পাতা।

—কার বাড়ি এটা?

—ধরো যদি আমাদের হয়?

—ধরতে হবে কেন?

—যদি হয়। তুমি খুশি হবে?

দোলা কিছু বলল না, তার মুখে আবেশ।

—বিলায়েৎ, না?

—ওহ, ইয়েস।

—বলো না কার বাড়ি?

—আমার এক বন্ধুর, থাকে কানাডায়, এখানে একটা আস্তানা করে রেখেছে। যখন কালে-ভদ্রে আসে, এখানে থাকে। শোভাবাজারে সাবেক বাড়িতে একগাদা লোকজন, নোংরা, চেঁচামেচি—থাকতে পারে না।

—কে দেখাশোনা করে?

—কেয়ার-টেকার আছে। আমি আবার কেয়ার-টেকারের কেয়ার-টেকার আছি। একটুও মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কেউ থাকে না?

—সত্যি! গাছগুলো!

—সব আর্টিফিশিয়াল। বাইরে থেকে আনা। অন্য ঘরগুলো দেখবে?

—চলো।—দোলা এমন উৎসাহের সঙ্গে বলল যেন সে সত্যিই কিনবে বা ভাড়া নেবে বলে বাড়ি দেখতে এসেছে।

ডাইনিংরুমে সব বেতের আসবাব। বেতের ডিনার টেবল, চেয়ার, বেতের সাইড-বোর্ড, যামিনী রায়ের ছবি দেওয়ালে, সুইচ টিপতেই একটা স্বপ্ন-আলো নেমে এল ঘরটায়। টেবলের ঠিক ওপরে লাল কোনাচে শেডের বাতি জ্বলছে। টেবিল সাজানো।

—ও মা। কার জন্যে?

—তোমার জন্যে দোলা, আমাদের জন্যে।

—কে সাজাল?

—কেয়ার-টেকারকে বলে দিয়েছিলাম। ও এনে সাজিয়ে গেছে। ক্যাসেরোলে রয়েছে খাবারগুলো। মাইক্রো-ওয়েভও রয়েছে। কিন্তু ঠাণ্ডা হতে দেবে কেন?

—দূর, কে এখন অত সব খায়! আগে বলোনি কেন?

—বাঃ, তুমি যে তাজ বেঙ্গলের নাম করলে? তাজ-এ কি কেউ শুধু আড্ডা মারতে যায়? নাও হাত ধুয়ে নাও।

চিকেন ফ্রায়েড রাইস, আর গার্লিক প্রন ছিল। অল্প একটু খেল ওরা। ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম বার করে আনল অমিত। দোলা হেসে বলল—এতক্ষণে একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলে। পূর্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে অমিত। দোলা দেখল অমিত কী অসহ্য সুন্দর! চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। ঘিয়ে রঙের একটা টি শার্ট পরেছে, একটা চকলেট রঙের জিনস। সুন্দর একটা আফটার শেভের গন্ধ সব সময়ে ঘিরে থাকে ওকে। মুগ্ধ একরাশ চুল, ইন্দ্রজালময় চোখ দুটো, টসটসে ঠোঁট দুটো। যেন একটু টোকা মারলেই মধু ঝরবে।

—আর ঘরগুলো দেখবে না?

—আর কটা রুম আছে?

—বাঃ, বেডরুম আছে, লাইব্রেরি বা স্টাডি যা-ই বলো আছে একটা, একটা গেস্টরুম আছে।

স্টাডিটা দেখেও দোলা অবাক। এত বই! পুরনো কালের স্টাইলের টেবল চেয়ার। বড় বড় রাজস্থানি কাজ করা পট। মাটির পট। মেহগনি রঙের সব বুক কেস বইয়ে ভর্তি। ফুল সেট রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, সংস্কৃত-সাহিত্য সম্ভার, ম্যানশনস অফ ফিলসফি, পুরো সেট হেমিংওয়ে। কত? কত?

—খুব পড়ুয়া তোমার বন্ধু, না?

—আরে দূর। সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা। যখন আসে, সময় কাটাবার জন্যে হয়তো একটু-আধটু পড়ল। এ সবও আসবাব।

—তাই?

—আবার কী? এসো বেডরুমটা দেখো!

—ন্ না।

একটি একলা পুরুষের বেডরুম দেখতে দোলার কেমন লজ্জা বোধ হল। সে বলল—আমরা বাইরের লোক, বাইরেই থাকি। যা দেখেছি তা-ই যথেষ্ট সুন্দর। আর সুন্দর দেখে কাজ নেই।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ ম্যাডাম।

ওরা বসবার ঘরে বসে বাজনা শুনতে শুনতে মৃদু স্বরে গল্প করতে লাগল।

—আমার ওপর খুব কি রাগ করেছ?

—খুব না হলেও বেশ।

—কেন?

—এ ভাবে আমাকে মুগ্ধ করবার, সম্মোহিত করবার কী অধিকার তোমার আছে?—দোলা জল চকচকে দু চোখ মেলে বলল।

—দোলা!—দু হাতে দোলাকে বুকে টেনে নিল সে।

—সেদিন ওই কুৎসিত পরিস্থিতির জন্যে তোমার কাছে আমি কী ভাবে মাফ চাইব? দোলার কোলে মুখ ডুবে গেল।

দোলার হাত মাথা ভর্তি ঢেউ খেলানো চকচকে নরম চুলের ওপর। তার দুই উরুর অতীব স্পর্শকাতর সংযোগস্থলে ওর মুখ। ও মুখ ঘষছে।

—ওঠো! মুখ তোলো, তোলো প্লিজ... দোলা ওকে জোর করে তুলতে গেল। ও মেঝেতে কার্পেটের ওপর এখন। দোলা স্পর্শকাতর সোফায়। দু হাত দিয়ে দোলার কোমর জড়িয়ে ও তাকে ঘনিষ্ঠভাবে মৃদু আকর্ষণ করছে। তার হালকা সমুদ্র-সবুজ ওড়না খসে গেল।

—ওঠো, অমিত! খুব ক্ষীণ এখন তার কণ্ঠ। খুব কাতর। সে একটা কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। টলমল টলমল করছে।

কেমনভাবে যে দুজনের স্থান অনবরত বদলাতে লাগল, অমিত বুঝল কি না কে জানে, দোলা কিন্তু বুঝল না। সে একটা সমুদ্রের ব্রেকারের মাথায় চড়েছে, দুলছে, কখনও ওপরে, কখনও নীচে, কখনও সু-উচ্চে শৃঙ্গে, কখনও আবার দুই ব্রেকারের মধ্যবর্তী বিপজ্জনক খাতে। দাঁড়িয়ে এবং শুয়ে এবং বসে পাশাপাশি, মুখোমুখি, যতরকমভাবে পারা যায় তারা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই যতক্ষণ পর্যন্ত না দোলার সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রতিরোধ কূলপ্লাবী সমুদ্রস্রোতের মধ্যে হারিয়ে যায়। কখন যে অমিত তার মধ্যে প্রবেশ করেছে সেই নির্দিষ্ট ক্ষণটা পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি, এত বেসামাল এত অভিভূত ছিল।

অবশেষে প্রথম বিদ্ধ হবার সূচীমুখ যন্ত্রণা তাকে কিছুটা জাগিয়ে দিল। সে অস্ফুটে বলল—প্লিজ, অমিত প্লিজ।

এ কি তার সম্মতি না অসম্মতি সেটা পর্যন্ত রহস্যে রইল। এবং তারপর চূড়ান্ত হর্ষের শিখরে দুজনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল দমকে দমকে।

২০

অক্টোবরের পনেরো তারিখে বাংলা পয়লা আশ্বিন, তার মায়েরও জন্মদিনে অমৃতার পুত্র জন্ম নিল। গভীর ক্লেশে, যন্ত্রণায়, অবশেষে যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে। প্রসবান্তে অমৃতা অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনে হচ্ছিল যে লোকটা এখন তার স্ত্রীকে হত্যা করবার চেষ্টার অপরাধে ভারতীয় পিনাল কোডের ৩০৭ ও ৩০৮ ধারা অনুযায়ী তিন বছর জেল খাটছে, সেই অরিসূদনের বংশধরের জন্ম দিচ্ছে সে। এক অনিচ্ছুক মা। ওই মাংসপিণ্ডের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা, দায়বদ্ধতা নেই। নিয়ে যাক ওকে কেউ ওর শয্যা থেকে রাত্রির অন্ধকারে, মানুষে অথবা কুকুরে, অমৃতা ফিরেও দেখবে না। একটা শয়তানের ছেলে। ওই শয়তানের জিন ওর শরীরে। শয়তানটা না কি আগেও একটা বিয়ে করেছিল। তখন থাকত উত্তরপাড়ায়, সেই বউকেও বিয়ে করেছিল অনেক যৌতুক নিয়ে, ঠিক এই একভাবে মেরে ফেলেছিল তাকে। এগুলো স-বই ঘটনা। কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ করা যায়নি একেবারে ঠিকঠাক হত্যার উদ্দেশ্য ছিল তার বা স্বাভাবিকভাবে গর্ভপাত হয়নি। আগের বিয়ের খবরটা গোপন করেছিল, সেই গোপনতার জন্য চূড়ান্ত জেরার সম্মুখীন হয়েছে সে। আত্মপক্ষে তার বক্তব্য এক্ষুনি নাকি তারা সন্তান 'অ্যাফোর্ড' করতে পারবে না। তার মা অবসর নেওয়ার মুখে, বাবা বহুদিন অবসর নিয়েছেন, বাবা-মা ছাড়াও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে তার, আছে বাড়ি করার দেনা, বাবার কিছু দেনাও নাকি সে এখনও মিটিয়ে চলেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শয়তানটা চমৎকার অভিনয় করছিল—অমৃতা, প্লিজ ফিরে এসো, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাদের সন্তানকে আমরা যেমন করে পারি পালন করব। প্লিজ...

অমৃতা তখন কঠিন মুখে দাঁড়িয়েছিল, তার হালকা গোলাপি শাড়ির আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর টেনে, যদিও তার উদরের স্ফীতি নিয়ে তার কোনও লজ্জা সংকোচ ছিল না। সাক্ষীর কাঠগড়ায় সে এক উদাসিনী। তখন শয়তানটা বলে উঠেছিল,—আমি তোমাকে ভালোবাসি অমৃতা—সারা কোর্টঘর হেসে উঠেছিল, ডাঃ রঞ্জন কার্লেকর মুখ ঘৃণায় বিকৃত করে বিচারশালা থেকে চলে গিয়েছিলেন। এসেছিল তার বন্ধুরাও। স-ব ক্লাসবন্ধু। তিলক তো বটেই, আরও। চঞ্চল, নিশান, লাবণি, শর্মিষ্ঠা, অণিকা ...সব স-ব। হাসিটা কি তিলকের নেতৃত্বে ওরাই হাসে? কে জানে? ছিলেন বাবা, মা, শিবানী মাসি, শম্পা, শম্পার বর...সব। ছিল না খালি দোলা।

—কী দিচ্ছে রে শালা, বলছে ভালবাসে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। জজ বললেন—অর্ডার অর্ডার। এবং অরিন্দম ঘোষ সারাক্ষণ মুখে তীব্র কৌতূহল নিয়ে চেয়ে ছিল অরিসূদনের দিকে। তার অর্ধেক-নামধারী এই গিধ্‌ধড়টার জন্যে তার জীবনে মননে অনুভূতিতে সম্পর্কে কতকগুলো অনভিপ্রেত জট পাকিয়ে গেছে।

প্রসব হয় ভোররাতে। আন্দাজ চারটে, সাড়ে চারটে। তারপর সে বোধহয় মিনিট দশ পনেরো অজ্ঞান হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসতে দুর্বলতায়, রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কে জানে হয়তো ঘুমের জন্য কিছু দেওয়াও হয়েছিল তাকে। ঘুম যখন ভাঙল তখন ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারের রাউণ্ডও শেষ। নিস্তব্ধ নার্সিংহোমে ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়ার টুং টাং শোনা যাচ্ছে। অমৃতার ঘুম ভাঙল। সে দেখল জানলার নিচু পর্দার ওপারে শরতের নীল আকাশ, দু-এক টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কে জন্মাল? সে না ওই শিশুটি? তার মনে হল সে-ই নতুন করে জন্মাল। কী সুন্দর আকাশ, কী সুন্দর মেঘ আর তার ওই ধীর ভেসে যাওয়া! কোনও একটা ঝাঁকড়া গাছের মাথাও দেখা যাচ্ছে পর্দার ওপরের পটে। দুপুর আকাশে কয়েকটা চিল। পাখসাট মারছে। যেমন মারত তাদের মানিকতলার বাড়ির ছোটবেলার আকাশে। সুদ্ধু এইটুকু, এইটুকু দেখার জন্যেই বোধহয় মানুষ বারবার জন্মাতে পারে।

শরীরের ভেতরটা দুয়ে ধুয়ে-মুঝে সাফ হয়ে গেছে। অরিসূদনের ছেলের জন্য। আর মনটা স্বস্তিতে সুখে শান্ত, পরিষ্কার হয়ে গেছে অরিসূদনের শাস্তিপ্রাপ্তির জন্য। এখন সে পুনর্বার কুমারী। একটা পুরো জীবনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

সিস্টার মাধুরী ঢুকলেন। বড় মাধুরী। ছোট মাধুরী দেখতে বেশি ভাল, বয়স কম। কিন্তু তার বড় মাধুরীকেই ভাল লাগে বেশি। ওঁর ওপর নির্ভর করা যায়। উনি জানেন। স-ব জানেন।

—কেমন লাগছে এখন?

—ভাল।

—খিদে পাচ্ছে?

—ভী-ষণ।

—মনে হচ্ছে আকাশ খাই পাতাল খাই?

অমৃতা হাসল।

—তবু আজ এ বেলা শুধু ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ, আর চার পিস রুটি। মিষ্টি দিয়ে গেছেন মা, মাসি, বন্ধুরা, খেতে পারেন।

—ঠিক আছে—

—এবার বাচ্চাকে আনি!

—না। প্লিজ।

মাধুরী সেন হঠাৎ নরম গলায় বললেন—ওর ওপর রাগ করছেন কেন? ওর কী দোষ?

—না। রাগ করব কেন? অমৃতা একটু লজ্জা পায়।

—ফীড করতেও হবে আপনাকে। কালই দুধ এসে যাবে।

মাধুরী সেন চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকা-লাগানো ক্রিব টানতে টানতে নিয়ে এলেন অমৃতার খাটের পাশে। কাপড় জড়ানো শিশুটিকে তিনি অমৃতার কোলে তুলে দিলেন। অমৃতা অবাক হয়ে দেখল তার কোলে তার মা ছোট্টটি হয়ে শুয়ে আছেন। অরিসূদন বা অনুকূলচন্দ্র বা সুষমা, এমনকী তার নিজের সঙ্গেও কোনও সাদৃশ্য নেই ছেলের। একেবারে তার মা বসানো। অমনি টকটকে রঙ। মাথা-ভর্তি মিশকালো, কোঁকড়া চুল, লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটোতে অপূর্ব ঢেউ। চোখ বুজিয়ে আছে। কিন্তু চোখ মেললেই সেই অপূর্ব আকৃতির চোখ সে দেখতে পাবে তাতে তার আর কোনও সন্দেহই রইল না।

অমৃতার বুক টনটন করে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। আনন্দাশ্রু। সে দুর্বল হাতে বাচ্চাটাকে তুলে নিজের গালে ঠেকাল, বুকে ঠেকাল তারপর আবার কোলে নামিয়ে রেখে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। মাকেও তো সে বারবার জননী স্নেহেই পালন করেছে। তার মা এক অসহায় বালিকা, যিনি ভুল করে চেয়েছিলেন, যা পেয়েছিলেন তা চাননি। সেই বিষাদ, সেই কারুণ্য সব সময়ে ঘিরে থাকত মাকে। ছোট্টখাট্ট মানুষটি। পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা হবেন না। কিন্তু এমন অনুপাত আর এমন সৌষ্ঠব তাঁর অঙ্গসংস্থানে যে দেখলে মনে হবে এই-ই-ঠিক। এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য ভাল নয়। মার যখন শরীর খারাপ হত মায়ের পথ্য তৈরি করা থেকে, বেডপ্যান দেওয়া, স্পঞ্জ করানো সব সে করেছে এগারো বারো বছর বয়স থেকে। তার আগে করতেন বাবা, বাবাকে কচি কচি হাতে সাহায্য করত সে বারবার। বাবা সে সময়ে খুব বিরক্ত হতেন, গম্ভীর মুখে বেডপ্যান দিতেন। বার্লিটা যখন গ্যাসের ওপর নাড়তেন তখন তাঁর মুখে কোনও প্রসন্নতা থাকত না। মা কুঁকড়ে যেত প্রকৃতির ডাক এলে। যতক্ষণ পারত চেপে থাকবার চেষ্টা করত। ঈশ্বরকে ডাকত করুণ অস্পষ্ট কণ্ঠে। কিন্তু ঈশ্বর তো আজ পর্যন্ত কাউকে বেডপ্যান দেননি। তাই শেষ পর্যন্ত বাবাকেই আসতে হত, যতদিন না অমৃতা তাঁর হাত থেকে এ কাজের ভার নিয়ে নেবার মতো বড় হল। বাবা যেন বাঁচলেন, খাতা আর টুইশনির পাহাড়ে তাঁর কাঁধ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ডুবিয়ে দিলেন। মা কিন্তু বাঁচল না, তার চুলে চোখে গালে হাত বুলিয়ে মা বলত—কী ভাগ্য করেই এসেছিলাম! কত পাপ ছিল গত জন্মের কে জানে! কিন্তু যেটুকু পুণ্য করেছিলাম, সেইটুকুই আমার মেয়ের রূপ ধরে এসেছে।

মা এইসব বললে অমৃতা আরও স্নেহাতুর, আরও জননী-জননী হয়ে উঠত, আরও যত্ন করে মায়ের খাবার তৈরি করত। মায়ের প্রশংসা, মায়ের প্রসন্নতার স্বাদই আলাদা। সে পড়ার টেবিলের পাশে টেব্‌ল-ক্লক নিয়ে বসত। ওষুধ খাওয়াবার সময়ের যেন একটুও এদিক-ওদিক না হয়। তবু

হয়তো মায়ের আপন জননীর তৃষ্ণা মেটেনি। ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে আর দেখেননি তাঁকে। লোকমুখে শুনেছেন তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর কথা। সে শোক বুকে চেপে রেখে দিতেন। একটা ফটো পর্যন্ত ছিল না বাড়িতে। সেই জননীকে পাবার জন্যেই কি মা তোমার শিশু অংশটা আমার কোলে চল এল?

—বাঃ, এরই মধ্যে দুধ এসে গেছে?—সিসটার মাধুরী খুব খুশি গলায় বললেন—অমৃতার ব্লাউজ তখন চুপচুপে ভেজা, বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। ব্লাউজটা পাল্টে দিলেন সিসটার। শিশুকে কোলে দিয়ে এক হাঁটুর নীচে বালিশ দিয়ে দিলেন, বললেন—খাওয়ান, এই ভাবে।

এবং অমৃতধারা একজনের বক্ষ থেকে আর একজনের মুখগহ্বরে বয়ে যেতে লাগল, নিশ্ছিদ্র, নিঃশব্দ স্রোতে, এমন একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল যা পৃথিবীতে বারবার হয়েছে মাতা আর সন্তানের মধ্যে, তবু যেন কখনও হয়নি। কেন না, কোথায় আর এমন মা আছে যে গর্ভাবস্থার প্রথমে তার শিশুকে বাঁচাতে চেয়েছিল, সবাইকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তারপর দিনে দিনে তার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়, প্রসবের সময়ে যার হৃদয়ে ছিল শিশুর প্রতি দুরন্ত ঘৃণা, কিন্তু তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে স্বামী নয়, মাতৃমুখ আবিষ্কার করে যে এমন আপ্লুত হয়ে যায় যে সঙ্গে সঙ্গে উৎসারিত হয় অমৃত-স্রোত?

শিশুটি পুংলিঙ্গ, তবু তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে অমৃতা মনে মনে বলতে লাগল—খাও মা খাও, সুস্থ হয়ে ওঠো শরীরে ও মনে, আনন্দে থাকো মা, আর ভেবোনা, আর কেঁদো না, এই তো আমি আছি।

বিকেলবেলা ভিজিটিং আওয়ারে প্রথমেই এলেন শিবানী মাসি।

—কী রে কেমন লাগছে এখন?

—ভাল—সে হেসে বলল।

—দেখেছিস বাচ্চাটা অবিকল সীমার মতো হয়েছে?

—দেখেছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল বাবা-মা। দুজনেরই মুখে আলো জ্বলছে। —কেমন আছিস খুকি?

—তুমি কেমন আছ মা?

বিশ্বজিৎ বললেন—এইবার নাতিকে তোর মায়ের কোলে ফেলে দে। ও ভাল হয়ে যাবে।

উপস্থিত সকলেই হাসলেন।

তৃতীয়জন এল অরিন্দম ঘোষ সঙ্গে লাবণি।

লাবণি এসেই ছুটে গেল বাচ্চাটার ক্রিবের কাছে।

—কী সুন্দর হয়েছে রে বাচ্চাটা! এইটুকু ছানা তো সাধারণত বাঁদর ছানার মতো হয়!

শিবানী মাসি বললেন—ওজন আট পাউন্ড তো! তাই মানুষের আকৃতিই পেয়েছে। মানে মানুষের ছানার।

সবাই হাসল।

লাবণি বলল—কিছু মনে করলি না কি রে তুই?

—দূর।

অরিন্দম যতক্ষণ রইল চুপ করেই রইল। এত চুপচাপ যে শিবানী মাসি ও অমৃতা দুজনেরই সেটা চোখে পড়ল।

অমৃতা বলল—কী ব্যাপার? অন্যদিন তো আপনার মুখে খই ফোটে। আজ এমন চুপ?

অরিন্দম শুধু হাসল। কিছুই বলল না।

চতুর্থজন এল তিলক।

—কী রে? তোকে কবে ছাড়বে? লেখাপড়া শুরু করতে হবে তো! নাকি এখন থেকেই জননী জন্মভূমিশ্চ হয়ে গেলি?

অমৃতা বলল—একটু তর দে আমাকে! আমার অবস্থাটা বোঝবার জন্যে তোরও একটা বাচ্চা হওয়া দরকার। তোর নিজের গর্ভে।

এ সময়টা বড়রা নীচে গিয়েছিলেন।

অমৃতার কথায় অরিন্দম পর্যন্ত হেসে উঠল।

তিলক বলল—যাক বাবা, ইয়ার্কি-ফাজলামির পরিচিত ওয়ার্ল্ডে ফিরিয়ে আনতে পারলুম তোকে।

—তুই পারলি? তুই কে রে? আমি নিজেই ফিরেছি।

অরিন্দম এইবার বলল—উঁহু! আপনার ওই বাচ্চাটা আপনাকে ফিরিয়েছে।

চতুর্থজন এলেন জয়িতাদি। লাবণি পালাল।

—অমৃতা!!!

সেই যেদিন তাকে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির মুখে ধমকে ছিলেন, তারপর এই দেখা।

নিচু হয়ে তার কপালে গালটা একটু ছোঁয়ালেন উনি। তারপর তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বললেন—না, না। এখন তোমার কাছে যাওয়াটা ঠিক না। তোমাকে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কিন্তু পার্ফেক্টলি নর্ম্যাল। তাই তো?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, একটু দুর্বলতা শুধু।

—ম্যাডাম-ট্যাডাম আবার কী? এটা কি আশুতোষ বিল্ডিং না তার তিনতলার ঘর, না তার সেন্টিনারি বিল্ডিং?

—জয়িতাদি—অমৃতা হাসিমুখে বলল।

—বাচ্চাটা কই? দেখতে পারি?

—ওই তো! মশারি-ঢাকা ক্রিবটার দিকে দেখাল তিলক।

জয়িতাদি একা একা গেলেন কোণটায়, মশারির চালের ওপর মুখ রেখে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে বললেন—এ তো একটা দেবশিশু?

তিলক বলল—অমৃতার পুত্র তো?

অমৃতা বলল, সব শিশুই তো দেবশিশুই দিদি!

—হেভ্‌ন লাইজ অ্যাবাউট আস ....

জয়িতাদি আস্তে আস্তে বললেন। বলতে বলতে কেমন দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে গেল কথাগুলো। তারপর তার কাছে এসে আর একবার কপালে হাত ছুঁইয়ে মৃদুস্বরে বললেন—যখন যা দরকার হবে বোলো। একটু থেমে বললেন...শুধু পড়াশোনার ব্যাপারে নয়। একটা প্যাকেট রাখলেন তিনি অমৃতার মাথার কাছে।—এবার যাই?

তিলক ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। একা অরিন্দম।

অমৃতা বলল—আপনি এত চুপচাপ যে! কী হল?

অরিন্দম একটু ইতস্তত করে বলল—না, আসলে আপনার পার্সন্যালিটিটাই বদলে গেছে। যেন আপনাকে চিনতে পারছি না।

—আপনি কি তবে ভেবেছিলেন দুঃখ প্লাস বিষাদ প্লাস বিপদ ইকোয়াল টু অমৃতা?

—না, না, কখনওই না। তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল অরিন্দম।

লাবণি এই সময়ে ঢুকে ব্যস্তভাবে বলল—চলো অরিন্দম, যাবে না?—লাবণি আজকাল মা-বাবার আড়ালে অরিন্দমকে 'তুমি' বলে।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বলল—আজ আসি?

নার্সিংহোমের করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছিল এই সুখ, এই ব্যক্তিত্ব যেন সে কোথায় দেখেছে, কোথায়? কিছুতেই মনে করতে পারছে না। লাবণিকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ফিরতে ফিরতে সে চিন্তা করছিল। পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গির ক্রসিং-এ পেয়ে গেল। আকারগত কোন

সাদৃশ্য নেই। কিন্তু যাঁর সঙ্গে অমৃতার মিল আজ সে দেখেছে তিনি হলেন ভার্জিন মেরি। সেই কুমারী মাতা, সান্‌ৎসিও রাফেইল্লোর আঁকা।

ডক্টর কার্লেকর ঢুকেই বললেন—সে কী! এত ফুল কেন? সিসটার সরান, সরান। বাচ্চাটার ক্ষতি হবে।

—বাচ্চাটাকেই বরং নার্সারিতে সরিয়ে দিই। আপনার পেশেন্টের ফুল খুব ভাল লাগছে।

—তা তো লাগবেই। আমার ঘরেও দু-চারটে পাঠিয়ে দিতে পারেন। কী অমৃতা আপত্তি আছে?

পরীক্ষা করার পর, মাধুরী সেন চলে গেলে, অমৃতা বলল—ডক্টর আমার জন্য পাঠানো ফুল কেন, আমি নিজেই তো আপনাকে ফুল দিতে চাই।

—কোথায় পায়ে? পুজো-টুজো করবে না কি?

—করাই তো উচিত।

—আচ্ছা এবার ভাল করে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।

ডাক্তার চলে গেলে সে জয়িতাদির প্যাকেটটা খুলল—গোটা ছয়েক নানান রঙের ঝাপলা। এক প্যাকেট ন্যাপি। কয়েকটা সুন্দর নরম তোয়ালে, আর একটা কাঁচা হলুদ রঙের উলের সেট—জামা, টুপি, মোজা। সব কিছুর তলায় একটা অফ হোয়াইটের ওপর ছোট ছোট নীল মোটিফ-অলা-নরম ছাপা শাড়ি। এই উলের সেট কি জয়িতাদি নিজেই বুনেছেন?

২১

যে ভোররাতে অমৃতার সন্তান জন্মাচ্ছিল, দোলা সে সময়ে বিছানায় খালি এপাশ ওপাশ করছিল। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, এই ভোরেও ঘুম দূর অস্ত্। উঠে সে এক গ্লাস জল খেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বমির ধমকে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল। 'মা' বলে একটা আর্ত চিৎকার করে সে মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

তার মা ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলেন সেই ডাক। যেন দুঃস্বপ্ন দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। সেই মুহূর্তে আবার ডাকটা এলো—'মা-আ-আ' এবার আরও আস্তে, কিন্তু নির্ভুল। তিনি ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। একঘর হড়হড়ে বমির মধ্যে দোলা নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে।

—দোলা!!! দোলা—তিনি প্রাণপণে দোলাকে তুলে বিছানায় শোয়ালেন, মুখ হাত এক দফা মুছিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে জামাকাপড় বদলে দিলেন। একটু জল খাওয়ালেন। দোলা পাশ ফিরে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন শুধু এই মাতৃস্পর্শটুকুর জন্যেই তার ঘুম অপেক্ষা করছিল।

আস্তে মেয়ের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে তিনি উঠে মেঝে পরিষ্কার করলেন, বমির মধ্যে কঠিন বস্তু প্রায় নেই-ই। খালি জল, খালি জল, আর গলনালির ভেতরের স্বাভাবিক হড়হড়ানি। ফিনাইল দিয়ে ধুলেন সব। কী হল মেয়েটার। ইদানীং খাওয়া আরও কমে গেছে। জন্ডিস হল না কি? কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কি না।

সকাল দশটা। খাবার টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। স্বামী আর স্ত্রী। একটু আগেই ডাক্তার তাঁদের মেয়েকে দেখে চলে গেছেন। বাড়ির ডাক্তার। সব কিছুতেই আগে ওঁকে ডাকা হয়।

—কী হল বলুন তো? রক্ত-টক্তগুলো পরীক্ষা করাতে হবে না কী?

—রক্ত নয়, ইউরিন।

—ইউরিন, ইউরিনারি কোনও ইনফেকশন...বাবা সব্যসাচী বললেন।

—না ইনফেকশন নয়, ডাক্তার বললেন, আ অ্যাম শিওর, তবু টেস্টটা করাব। শি হ্যাজ কনসীভ্‌ড্‌।

সেই থেকে সব্যসাচী আর সুমনা মুখোমুখি বসে আছেন। দোলা ঘুমোচ্ছে। তাঁরা বসে আছেন। কারও মুখে রক্ত নেই। অফিস যাবার জোগাড় নেই, স্কুল যাবার জোগাড় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে যেন ইলেকট্রিক শকে তাঁদের আপাদমস্তক ঝলসে গেছে।

অনেকক্ষণ পর সব্যসাচী বললেন—তুমি কিছু জানতে না? এটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

—কী জানব?

—কারও সঙ্গে ওর কোনও অ্যাফেয়ার চলছে কি না।

—তুমি জানো, আই, উই অ্যাবসলুটলি ট্রাস্ট হার। কিছু হলে ও আমাকে বলবে—এটাই তো প্রত্যাশিত? আই কান্ট টেক ইট সব্যসাচী। আই কান্ট টেক ইট ফ্রম হার।

—আশ্চর্য! তবে কি ওকে কেউ রেপ করল?

—সেটাও কি ও চেপে রাখবে? রাখবার কথা? বলতে বলতে সুমনার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল।

—এত দেখছে চারদিকে, এত শিখছে! স্কুল-কলেজে এ সব সোজাসুজি শেখায় না ঠিকই। তবু তো ঠারে ঠারে ওরা শিখেই যায়। টি.ভি. দেখছে দিনরাত্তির! সুমনার গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

—তোমার নজর রাখা উচিত ছিল। —সব্যসাচী ঠোঁট চেপে রূঢ়ভাবে বললেন।

—একশোবার। কালো হয়ে যাচ্ছে, রোগা, ভাল করে খায় না, অন্যমনস্ক। সন্ধে পেরিয়ে বাড়ি ফেরে প্রায়ই। কিন্তু নাকের গোড়ায় পরীক্ষা, এ সব তে হবেই! হতেই পারে!

—কী হবে এখন? সব্যসাচী বললেন।

—প্রথম কথা জানতে হবে ব্যক্তিটা কে!

—ইটস আ ডেলিকেট কোয়েশ্চন...

সুমনা বললেন—ও বোধহয় জানেও না ওর কী হয়েছে। হঠাৎ জানলে বা হঠাৎ কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি সাইকলজিক্যাল কিছু...

—কড়া হলে চলবে না—সব্যসাচী বললেন—যদিও ইচ্ছে করছে বেধড়ক ঠাঙানি দিই।

—প্লি-জ—ককিয়ে উঠলেন সুমনা—বলেনি যখন তখন এটা খুব গোলমেলে ব্যাপার হতে পারে। কোনও আধবুড়ো প্রোফেসর, কি বিবাহিত কেউ, কিংবা ক্লাসের কোনও ছেলে যার কোনও চালচুলো নেই। আচ্ছা—তিলক বলে ছেলেটা তো মাঝে মাঝেই ফোন করত!

—করত! তো সে তো চঞ্চল, নিশান, আরও কী কী নামের বন্ধু আছে ওর।

—তিলক একটু বেশি করত।

—ট্রাস্ট! বিশ্বাস! কাউকে করতে নেই সুমনা, এই বয়সের ছেলেমেয়েকে তো একেবারেই না। মা-বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, সব কথা আলোচনা হয়...এ সব স্রেফ যাকে বলে বকোয়াস। এজেড পিপ্‌ল আর এজেড, দা ইয়াং আর ইয়াং, দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ এনি কমিউনিকেশন।

—'মা-আ'— দোলার ঘর থেকে আবার ডাক ভেসে এল।

—দেখো, কী চাইছে!

সুমনা গিয়ে দেখলেন দোলা উঠে বসে আছে, দু হাত দিয়ে মাথা টিপে ধরেছে।

—কী হল? মাথার যন্ত্রণা?

—না, ভীষণ ঘুরছে। কী হল বলো তো—স্পন্ডিলোসিস? এমন নিষ্পাপ ভঙ্গিতে সে বলল কথাটা যে সুমনার সেই মুহূর্তে মনে হল ডাক্তার একটা ভুল করেছেন। তিনিও খুব সরল মুখ করে বললেন—তোর পিরিয়ড ঠিকঠাক নিয়মিত হচ্ছে তো?

—আমি একটু ইরেগুলার, জানোই তো! আগের মাসে হয়নি।

এই সময়ে ফোনটা বাজল। দোলা উঠতে যাচ্ছিল, সুমনা আটকালেন। সব্যসাচী ধরলেন ফোনটা।

—আমি তিলক বলছি। দোলাকে একটু দেবেন?

—দোলা একটু অসুস্থ ঘুমোচ্ছে। কিছু বলার আছে।

—হ্যাঁ, অমৃতার আজ ভোররাতে ডেলিভারি হয়েছে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আবার বিকেলে যাব। দোলা এল না দেখে...

—শোনো...তুমি একবার আমাদের বাড়ি এসো।

—আমি? আপনাদের? ডোভার লেনে, না?

—উহুঁ নিউ বালিগঞ্জ। ঠিকানাটা লিখে নাও।

—আজ পারব না মেসোমশাই, কাল 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম হয়ে যাব। অমৃতাকে এখন আমরা রোজই...আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না...

তিলক এল নীচের তলায়। দোলা জানতেও পারল না। ভী-ষণ দুর্বল শরীর। মাথা ঘুরছে, প্রতিদিন সকালে বমিও হচ্ছে একটু-একটু। কাঠ-বমি যাকে বলে।

সে শুয়ে শুয়ে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে রবিশংকর-মেনুহিন শুনছে।

তিলককে চা এবং প্রচুর খাবার দিয়েছেন সুমনা।

তিলক হেসে বলল— দোলা বুঝি আপনাদের বলেছে আমি ভী-ষণ পেটুক?

জোর করে একটু হাসলেন ওঁরা।

সব্যসাচী বললেন—খুব বন্ধু তো তোমরা! প্রায়ই ফোন করো, একসঙ্গে বেড়াতে-টেড়াতেও যাও নিশ্চয়ই। খুব হালকাভাবে বললেন তিনি কথাটা।

তিলক মুখে একটা ফিশফ্রাই তুলছিল, একটু কামড় দিয়ে বলল—হ্যাঁ আমাদের গ্রুপটা মানে আমি, চঞ্চল, লাবণি, দোলা, অমৃতা আমরা খুব ক্লোজ। তবে কফিহাউজ কিংবা য়ুনিভার্সিটি ক্যানটিন...আর কোথাও যাবার সুযোগই পাইনি ...যা পড়ার চাপ। বাব্‌বাঃ। মাঝে মাঝে এক্সকারসানের কথা হয় আবার ধামাচাপা...।

—না আমি বলছি। ডোন্ট মাইন্ড, তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই?

তিলক একটু অবাক হয়ে গেল, মুখে সেটা প্রকাশ করেও ফেলল—আমার গার্লফ্রেন্ড? বাংলার ছেলেদের কোন গার্ল পাত্তা দেবে, মেসোমশাই! তা এই কথা জিজ্ঞেস করতে আপনি আমায় ডেকে...

—না...না...তুমি অত আপসেট হয়ো না! তোমার না হয় গার্লফ্রেন্ড এখনও হয়নি। কিন্তু তোমার বন্ধুদের আর কারও? ধরো, দোলার?

এইবারে ব্যাপারটা বুঝল তিলক। এই জন্যে। এখন, দোলা যা গোপন করে গেছে সেটা ফাঁস করা বন্ধু হিসেবে তার উচিত কী? সে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল, তারপর বলল—থাকলে দোলাই আপনাদের বলবে। তাই না? শী ইজ আ গ্রোন-আপ গার্ল।

—শোনো—সুমনা ব্যাকুল হয়ে বললেন এবার—দোলা ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। যদি কিছু জানো, আমাদের কাছে লুকিও না, প্লিজ—তিনি তিলকের দ্বিধাটা টের পেয়েই বললেন।

—মাসিমা, আমি দোলাকে একটা ছেলের সঙ্গে দেখেছি। প্লিজ দোলাকে বলবেন না আমি বলেছি, আমার ভী-ষণ বাজে লাগছে এটা বলতে হচ্ছে বলে।

—বলব না, তুমি যা জানো বলো।

—ছেলেটা আমাদের চেনা কেউ না। য়ুনিভার্সিটার না। কিন্তু খু-ব হ্যান্ডসাম চেহারা। ফিলমের হিরোদের মতো...কিংবা বলতে পারেন মডেলদের মতো।

—নাম জানো না?

—উহুঁ, একদিন দোলাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করেছিলাম, ভী-ষণ রেগে গেল। ট্যাকসি থেকে গড়িয়াহাটের মোড়ে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল একদিন। আরেকটা কথা মাসিমা, দোলা কিন্তু ক্লাসে খুব, খু-ব ইরেগুলার।

তিলক চলে গেলে আবারও দুজনে বসলেন মুখোমুখি। একটা সূত্র পাওয়া গেল। ক্ষীণ একটা সুতো। সুমনা হঠাৎ বললেন—তিলক বলে যে ছেলেটা প্রায়ই ফোন করে সে কিন্তু এই তিলক নয়।

—কেন?

—তার গলা একেবারে অন্যরকম। কথা বলবার ধরনও আলাদা। এই তিলক তো টিপিক্যাল একটা কলেজের ছেলের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কথা বলে। যে ফোন করে তার গলা বেশ ভাল, পুরুষালি, খুব মার্জিত ভঙ্গি। ছেলেমানুষি নেই একদম।

—দোলা! দোলা শুনতে পেল না তার কানে ওয়াকম্যান, কিন্তু দোলা দেখতে পেল মা এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ খুলে কিছু বলছে। সে ওয়াকম্যানটা খুলে রাখল। মায়ের হাতে একটা রিপোর্ট। ডেফিনিটলি রক্ত আর ইউরিন পরীক্ষার।

—দোলা—মা বলল, মায়ের গলা কাঁপছে,—ছেলেটা কে? যার সঙ্গে তুই ট্যাকসি করে ঘুরে বেড়াস?

দোলার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ঢোঁক গিলে বলল—কে বলেছে?

—অনেকেই দেখেছে, অনেকেই বলেছে—এই ভিড়ে ভর্তি শহরে এসব লুকোনো যায় না। দোলা, তোমার ইউরিন রিপোর্ট বলছে তুমি কনসীভ করেছ মাস দুয়েকের মতো।

রক্তশূন্য মুখে দোলা কিছু বলতে গেল বারবার, মুখে কথা ফুটল না। অবশেষে সে উপুড় হয়ে পড়ল বিছানার ওপর। যেন খরগোস নিজের বিবরে মুখ লুকিয়েছে। কিন্তু পেছনটা উন্মুক্ত। যে-কেউ থাবা মেরে তুলে নিতে পারে।

তার পাশে বসে সুমনা আস্তে আস্তে বললেন—আমাদের বলনি কেন দোলা? আমরা তোমার বাবা-মা কী দোষ করেছি তোমার কাছে?

কোনও উত্তর এল না।

—তোমাকে কীভাবে আমরা বিশ্বাস করেছি, চিরকাল, কীভাবে শিক্ষা দিয়েছি, বন্ধুর মতো মিশেছি—তা তো তুমি জান। তবে?

এবার দোলার উপুড় শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কোনও মতে বলল—তোমরা ওকে অ্যাপ্রুভ করতে না। পার্থদার মতো বড় কিছু নয়... তা ছাড়া ও কিছুদিন লুকিয়ে রাখতে বলেছিল...

—'ও' বলেছিল বলে তুমি 'আমাদের' কাছে গোপন করলে? মা বাবাকে গোপন করতে বলে যে ছেলে, তোমার বোঝা উচিত ছিল সে ভাল নয়।

—না, না, ও ভাল, কিছুদিন সময় চাইছিল, এরিয়া ম্যানেজার হয়ে যাবে তারপর!

—ইতিমধ্যে সে এই কাণ্ড বাধিয়ে বসল?

দোলা লালমুখে নখ খুঁটতে লাগল।

—ইন এনি কেস, কে ছেলেটি? কী নাম?

—অমিতাভ সেনগুপ্ত। শুধু সেন লেখে। পার্থদা চেনে।

—পার্থ? পার্থ জানে ব্যাপারটা?

—না, না, পার্থদাদের অফিসের স্টিমার পার্টিতে আলাপ হয়েছিল।

—পার্থ? হ্যাললো পার্থ দত্ত, আছে? হ্যাঁ দিস ইজ হিজ ফাদার-ইন-ল'। ইয়েস ইট ইজ ভেরি-ভেরি আর্জেন্ট।

—ইয়েস, বাবা, কী ব্যাপার?

—অমিতাভ সেনগুপ্ত বা সেনকে চেন? তোমাদের অফিসের স্টিমার পার্টিতে এসেছিল?

—অমিতাভ সেন? কীরকম একটু যদি ডেসক্রাইব করেন...

—তোমার শালির সঙ্গে এত ভাব জমিয়ে ফেলল, আর তুমি এখন ডেসক্রিপশন চাইছ? হাউ ডু আই নো? তোমার রেসপনসিবিলিটি। তোমার জানার কথা।

তাঁর গলার স্বরে রাগ গোপন রইল না আর।

পার্থ বোধহয় কিছু মনে করল। করতেই পারে। বলল—ঝুলনকে জিজ্ঞেস করে বলব। এনিওয়ে কী হয়েছে? অ্যাফেয়ার?

—এসে শুনো।

ঝুলন আর পার্থ সন্ধেবেলায় এল। ওদের নীচেই বসালেন সব্যসাচী। সুমনা সর্বক্ষণ ওপরে দোলাকে পাহারা দিচ্ছেন।

পার্থ বলল—হ্যাঁ আমরা দুজনে মিলে প্লেস করতে পারছি। ছেলেটি খুব সম্ভব আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টের শালা, সে-ই যদি হয় তো আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলছেন—একটা অত্যন্ত ইরেসপনসিব্‌ল ছোকরা। অমন চেহারা, স্মার্টনেশ শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও বছরের পর বছর ওষুধের সেলস পার্সন হয়ে আছে। কাজে মন নেই। খালি সিনেমা, থিয়েটার, গার্লফ্রেন্ড, মিউজিক। যা রোজগার করে স-ব উড়িয়ে দেয়। চেহারা দেখে যদি আপনারা পাত্র পছন্দ করে থাকেন তো ঠকবেন। পরিবার ভালই। মা সেতার-টেতার বাজান, বাবাও কোনও বড় কোম্পানিতে পার্চেজে আছেন। তিনিও ওইরকম, উন্নতি করতে, খাটতে খুবই অনিচ্ছুক।

—কিন্তু আমাদের কোনও উপায় নেই পার্থ। ওরই সঙ্গে দোলার বিয়ে দিতে হবে। দোলা আর কাউকেই বিয়ে করবে না।

—আমি একটু বুঝিয়ে দেখব বাপি?—ঝুলন বলল।

—নাঃ আর উপকার তোমাকে করতে হবে না। স্টিমার পার্টি বলে বোনকে নিয়ে গেলে, একটু নজর পর্যন্ত রাখলে না। কার সঙ্গে মিশল, কার সঙ্গে কথা বলছে...ছিলে কোথায় ঝুলন? ছি, ছি...

পার্থ পরে বিরক্ত হয়ে ঝুলনকে বলেছিল—একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে তাকে কি পাহারা দিয়ে রাখতে হবে নাকি? তোমার বাবা-মার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাদের কী দোষ?

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে অমিতাভ সেনগুপ্তর বাবা-মাকে যদি বা খুঁজে পাওয়া গেল, অমিতাভকে আর পাওয়া যায় না।

টাউনসেন্ড রোডে, ওদের বাড়িতে গিয়ে প্রস্তাবটা রাখতে অমিতাভর বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

—অমুর বিয়ে দেব? বিয়ে করে দায়িত্ব নেবার মতলবই ওর নেই। কী দেখে আপনারা ভুললেন? চেহারা?

—আমরা ভুলিনি। আমাদের ছোট মেয়ে।

—তাই বলুন। এখন আমার ছেলে ভুলেছে কি না দেখতে হয়।

—দেখুন। সে কোথায়?

—সে ট্যুরে গেছে। ওষুধের কম্প্যানির সেলসম্যান। মাঝে-মাঝেই এদিক-ওদিক যেতে হয়।

দোলাদের বাড়ির দোতলার ঘরে একা অমিত ও দোলা। অমিত বলল—দোলা, আমাকে প্রেশারাইজ করাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

—মানে? এই অবস্থাকে তুমি প্রেশারাইজ করা বলছ?

—দেখো এসব ঘটনা ঝোঁকের মাথায়, ঘোরের মাথায় ঘটে যায়। কিন্তু ঘোরটা উভয় পক্ষেরই।

—মানে?

—তোমার সম্মতি না থাকলে কি আমি...

—বন্ধুর শূন্য বাংলো-বাড়িতে দুপুর কাটাবার প্ল্যানটাও কি আমার? আমার দায়িত্ব...? বলতে বলতে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকল দোলা, তার আবার বমি পাচ্ছে। সেই প্রবল উকি দিয়ে দিয়ে কাঠবমি। কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে সে নিজেকে সামলাল। যখন হাত সরাল, তখন সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে তোমার, দোলা? অমিতের গলায় যেন দুশ্চিন্তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

—জানো না কী হয়েছে? তোমাকে তো বলা হয়েছে! হয়নি?

—দোলা প্লিজ, এম. টি. পি. করিয়ে নাও। কেন শুধু শুধু কষ্ট পাবে? আমি এখনও প্রস্তুত নই। এতটা দায়িত্ব...

দোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অমৃতার কেস। সে এম.টি.পি. করতে রাজি হয়নি বলে কী ভাবে তাকে...

—তুমি যদি পুরুষ হও, তাহলে যে মুহূর্তে একটা মেয়ের সঙ্গে ইলভলভ্ড হয়েছ, সেই মুহূর্ত থেকে তোমার দায়িত্ব এসে যায়। তুমি কি আমাকে নিয়ে খেলা করছিলে তবে? এ কী মারাত্মক খেলা?... থেমে থেমে কথাগুলো বলল দোলা। ভেতরটা তার ত্রাসে দুঃখে ক্ষোভে কাঁপছে। কিন্তু এগুলোই তার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কথা। বলে ফেলে তার চোখ উপচোতে লাগল।

—আই লভ য়ু, দোলা, প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি, শুধু আমার অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে বলছি।

—আর যদি না বুঝি? যদি আমার মা-বাবা না বোঝেন?

—অগত্যা ...আর কী বলব? এম.টি.পি. আজকাল এত সোজা, বিশেষত তোমার এই স্টেজে। পরীক্ষাও তো তোমার সামনেই...

—'অগত্যা'? 'অগত্যা' কথাটার মানে কী—দোলার গলার স্বরে একটা অবাঞ্ছিত কর্কশতা একটা তীক্ষ্ণতা এসে গেল। যেন সে হঠাৎ একটা অতলস্পর্শ খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, ঝুলছে। পেছনে রিভলভার হাতে খুনি, তার মাথা কিংবা হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে অস্ত্র তুলেছে।

—আমি বুঝতে পারছি, তুমি বুঝবে না, দোলা, আসলে তুমি ভাবছ...

—কী ভাবছি?

—না থাক্।

এটা সকালের ঘটনা। দুপুরে আজও অফিস-স্কুল গেলেন না সব্যসাচী সুমনা কেউই, দুজনেই এই প্রথম অমিতাভকে দেখলেন। জামাই করলে ঘর আলো হয়ে যাবে, তাঁরা সত্যি-সত্যিই অবাক হয়ে গেছেন এই সিনেমা-সম্ভব রূপ দেখে। এ যেন সত্যি নয়। রুপোলি পর্দা থেকে কেটে নামিয়ে আনা হয়েছে। কথাবার্তাও অত্যন্ত মার্জিত, নম্র, সপ্রতিভ, অথচ পরিশীলিত। একমাত্র অপরাধ তার তেমন ভালো-নয় চাকরি, আর তার অখ্যাতি বা কুখ্যাতি। তার নিজের বাবা, জামাইবাবু পর্যন্ত তার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। মায়েরা ছেলেদের দোষ দেখতে পান না। কাজেই, অমিতাভর মা আর কী করে সোজাসুজি তার নিন্দা করেন। তিনি বলেছিলেন—অমিত একটু শিল্পীস্বভাবের ছেলে। এরা ভাল গৃহস্থ হয় না। বিয়ে যদি দেন, তা হলে নিজেদের দায়িত্বে দেবেন। পরে আমাদের দোষ দিতে আসবেন না।

সব্যসাচীর রাগ হয়ে গিয়েছিল, তবু রাগ চেপে বলেন—আপনি নিজেই তো একজন শিল্পী, তা আপনারও শিল্পীস্বভাব নিশ্চয়ই। তার জন্য আপনার গৃহস্থালির কোনও ক্ষতি হয়েছে?

ভদ্রমহিলা, নাম কৃষ্ণা সেন, বললেন—পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্য স্বীকার করবেন না, যে আমার সেতার, তার জন্য রেওয়াজ, জলসা, রেডিও, দূরদর্শন—এসব ওঁকে কখনও সখনও অসুবিধেয় ফেলে, উনি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু

আমার বদলে 'উনি' যদি শিল্পী হতেন তাহলে আমাকে চব্বিশঘণ্টা ঘরে-বসা আইডিয়াল গৃহিণীও হতে হত, আবার কিছু রোজগারপাতিও করতে হত। শিল্পীর আয়ে সংসার চলে না তো! আর দেখুন অমুর ব্যাপারটা হচ্ছে, ও শিল্পীস্বভাব, কিন্তু শিল্পী নয়। ও না শিখেও ভাল গান গায়, অভিনয় করতে পারে, স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে, কিন্তু ও অস্থির, চঞ্চল, কিছুতে লেগে থাকতে পারে না, সবসময়েই একটা হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে ভাব। নাও, য়ু ডিসাইড।

এখন ওঁরা আলোচনা করছেন—অমিতাভ বিয়ের পাত্র হিসেবে আদৌ অভিপ্রেত কি না। মেয়ের অবস্থার জন্য তাড়হুড়ো করে বিয়ে দিলে, মেয়েটা যদি সারাজীবন অসুখী হয়? এ তো আর আগেকার কাল নয় যে কুমারী গর্ভিণীকে আইনমাফিক গর্ভপাত করানো যাবে না!

সুমনা বললেন—এই গর্ভপাতের সাইকলজিক্যাল এফেক্ট মেয়ের ওপর কী হবে, একবার ভেবেছ? পরে যখন ওর বিয়ে দেওয়া হবে, এ ঘটনা লুকিয়ে দিতে হবে, ধরা পড়ে যেতেই পারে, আর দোলা যা মেয়ে ও ঠিক বলে ফেলবে। তখন...

সব্যসাচী গম্ভীরভাবে বললেন—তা যদি বলো, গোপন করতে তোমার মেয়ে যে ভালই জানে, লোকের চোখে ধুলো দেবার চালাকি যে সে চমৎকার আয়ত্ত করে ফেলেছে, তা তো প্রমাণিতই হয়ে গেছে সুমনা! এ সব কথা আর কেন?

এম. টি. পি.-র কথাতে কিন্তু দোলা ভয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল। মুখ রক্তহীন। সে শুধু কোনওমতে বলতে পারলে—মা, ওটা তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা...আমার ...আমার মা...তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে তার পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজল।

—ছেলেটি? তোমার ওই অমিতাভ? ও-ও তো একই কথা বলছে? ও-ও চায় না।

—ওরা ছেলে মা, বোঝে না এ সবের ইমপর্ট্যান্স, ফীলিং নেই। ওর একমাত্র আপত্তি টাকা-পয়সার। ফ্যামিলি সাপোর্ট করবার মতো আর্থিক অবস্থা ওর এখন নেই।

২২

সাতুই নভেম্বর বাংলা সেকেন্ড পার্ট ফিফ্‌থ পেপার পরীক্ষা দিতে এল অমৃতা, একজন সদ্য জননী, আর দোলা একজন সদ্য বিবাহিতা। অমৃতা এই তিন সপ্তাহে খানিকটা সেরে উঠেছে ঠিকই। কিন্তু মোটের ওপর সে দুর্বল। বাড়ি থেকে একটা কুশন নিয়ে এসেছে। এক ফ্লাস্ক গরম দুধ, টিফিন। বেশ কুসুম-কুসুম গরম করে দুধটা দিয়েছেন মাসি, খিদে পেলে সে টুক করে ফ্লাসকের ঢাকনা খুলে নামিয়ে দুধটা ঢেলে রাখে, লিখতে লিখতে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তবু অমৃতা এটা পেরে যাচ্ছে, কেন না সে জয়িতাদির নোট্‌স থেকে একটা মুল্যবান শিক্ষা নিয়েছে। কী করে অল্প কথায় বেশি বলা যায়। ভাষার ওপর অসামান্য দখল না থাকলে, শব্দভাণ্ডার অফুরান না হলে এটা সম্ভব নয়। অতটা পারবে না অমৃতা, পারবে না তিলকও। শোনা যায় জয়িতা রায় তিন ঘণ্টায় লেখা শেষ করে, বাকি একঘণ্টা রিভিশন করতেন, রিভিশনে ভুল কিছু বেরোত না, শূন্যস্থানও কিছু না, কিন্তু আরও ভাল শব্দ আরও সুন্দর শব্দ বসানো হত কিছু, স্টার দিয়ে মার্জিনে মার্জিনে আরও কিছু নতুন চিন্তা, পরীক্ষকরা সেই মার্জিনের অতিরিক্তটুকু পড়ে ধন্য হতেন। অমৃতা-তিলক পেয়েছে সেই নোটিস। কিছুট তো পারবেই। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষা দিতে, লিখতে ভীষণ ভাল লাগছে তাদের। অমৃতার প্রথমটা বাচ্চার খাওয়ার চিন্তায় কষ্ট হয়েছিল। পরীক্ষার সময়টার কথা মনে করে, ডাক্তারের পরামর্শে ওরা বাচ্চাকে বেবি ফুড খাওয়ানো অভ্যেস করিয়েছে। কিছুতে মুখে নিতে চায় না, চোখ বুজিয়ে ফেলে, ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর অমৃতার মনটা স্নেহে গলে যায়, শরীরটাও তার হয়ে যায় যেন নবনীতে

তৈরি, গলতে থাকে। কিন্তু মাসি কড়া হাতে শাসন করেছেন মা ছেলে দুজনকেই। তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত অমৃতা। আর, একবার প্রশ্নোত্তরের ভেতরে ঢুকে পড়বার পর তার আর জগৎ-সংসার কিছুই খেয়াল থাকে না।

দোলা পরীক্ষা দিচ্ছিল সিক-বেডে। ওদের থেকে আলাদা ঘরে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে যখন দোলার রেজিস্ট্রেশন হল, তার সঙ্গে হল পশ্চিমি কায়দার একটা রিসেপশন। আশ্বিন মাসে বিয়ের লগ্ন থাকে না। তাই রইল না টোপর, আলপনা-পিঁড়ি, গায়ে-হলুদ, অধিবাস, ছাদনাতলা, কিচ্ছু না। তবে শানাই বাজল, বাজল কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, সরোদ-সেতার-বেহালাও, স্বভাবতই রেকর্ডে। খাওয়া-দাওয়ার মেনুও খুব ভাল। কিন্তু কনের ফ্যাকাশে মনমরা চেহারায় বিয়ের সাজ ভাল ফুটল না।

আত্মীয়স্বজনরা মন্তব্য করলেন—পরীক্ষার মুখোমুখি বিয়েটা না দিলেই হত। মেয়েটা দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় যেন কেমন হয়ে গেছে। আমাদের সেই হাসকুটে টগবগে লাবণ্যময় মেয়েটা বলে চেনাই যাচ্ছে না।

উত্তরে একজন বললেন—বরপক্ষের নাকি ভীষণ তাড়া ছিল।

আর একজন বললেন—তাড়াটা কনেপক্ষেরও হতে পারে। জামাই যা দেখছি একে তো ফেলে রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে বেহাত হয়ে যাবে।

দোলা বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে চায়নি। কিন্তু সুমনা-সব্যসাচী ধরে ধরে প্রত্যেককে করেছেন। অনেকেই আসেনি। অমৃতা একবার ঘুরে গিয়েছিল সকালের দিকে। ছেলের জন্য বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। শর্মিষ্ঠা পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠছে না, তার কথা বাদ। কিন্তু লাবণি এসেছিল খুব সেজেগুজে অরিন্দমের সঙ্গে, আর এসেছিল সব কটা পেটুক ছেলে। পরীক্ষাই হোক, আর যা-ই হোক খাওয়া তার ওপর দোলার 'মালদার' বাবার দেওয়া রিসেপশনের খাওয়া ওরা মিস করবে না। আর একজনকে দোলা ফোনে নেমন্তন্ন করেছিল, কী ভেবে কে জানে। সে হল সীজার, অমৃতার শ্বশুরবাড়ির পাড়ার সেই পরোপকারী ছেলেটি।

দোলা সিক-বেডে পরীক্ষা দিচ্ছে শুনে সকলেই একটু অবাক। বিয়ে হতে না হতেই অসুখ বাধিয়ে বসলি? কী? না জন্ডিস। খালি তিলকের মাথায় একটা কথা কয়েকবার ঘুরপাক খেয়েছিল—'শী ইজ ইন গ্রেভ ডেঞ্জার।' পুরোপুরি বোঝার মতো সময় বা মনোযোগ তার ছিল না, কিন্তু কথাগুলো তার অজান্তেই তার মাথার ভেতর একটা সংকেত পাঠাচ্ছিল, রিং রিং রিং রিং...

২৩

অমৃতা যেন অনেক দূরের একটা তারা। বহু আলোকবর্ষ পার হয়ে তার স্নিগ্ধ স্তিমিত আলো এসে পৌঁছেছে অরিন্দমের কাছে। তা ছাড়াও আছে র‍্যাফেইলো, সেই ইতালীয় শিল্পীর তৈরি ম্যাডোনা ব্যক্তিত্ব। এখন আর অরিন্দমের আর ম্যাডোনার কাছে আসার কোনও যুক্তি নেই। তখন আসত বার্তা পৌঁছতে, বার্তা নিয়ে যেতে। অমৃতার বাবা-মা তাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন। পছন্দ করেছেন শিবানী মাসিও। অরিন্দম ভেবে দেখে সব বাবা-মা-মাসি-মেসোদের কাছেই সে খুব প্রিয়। কিন্তু এইসব মাসি-মেসোদের মেয়েদের সে তেমন আকৃষ্টই করতে পারছে না আজকাল। লাবণি তো খুবই মোহিত হয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু তারপর রুক্ষ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খানিকটা ঠেস দিয়ে কথা। অরিন্দম বোঝে না কেন। লাবণিকে তার ভালই লাগে। কিন্তু যাকে বলে প্রেমে পড়া, সেটা ঘটে ওঠেনি। অরিন্দম একজন লোভনীয় পাত্র—সিভিল এঞ্জিনিয়ার, অমুক কোম্পানিতে এই পোস্টে আছে, এত টাকা মাইনে পায়। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। বাবা-মা উভয়েই কাজ করেন। শিক্ষিত, কালচার্ড ফ্যামিলি। নিজেদের বাড়ি বকুলবাগানে। আর লাবণি এক লোভনীয় পাত্রী—এম. এ. পাশ

করতে যাচ্ছে, ফুটফুটে দেখতে, বেশ আকর্ষণীয় চেহারার একটি মেয়ে, যাকে তার বাবা-মা যত্ন করে বড় করে তুলেছেন, যাকে এবং যার বিবাহিত জীবনকে ঘিরে তাঁদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা এই রকম। তাঁরা অরিন্দমকে মিনতি করে বলেছেন—বড় মেয়েকে এমন দিয়েছি, ছোটকেও আমরা তেমনই দেব। এটা ওদের প্রাপ্য। তুমি লক্ষ্মীটি না করো না।

—আপনারা কি সেইসব খাটবিছানা, ড্রেসিং টেব্‌ল, আলমারি-টালমারি স-ব দেবেন? সর্বনাশ! আমার মান থাকবে?

—এগুলো তো দেবই।

—যদি আমি সিঙ্গাপুরে কি আমেরিকায় থাকতাম?

—তবু দিতাম। এখানে থাকত, এলে ব্যবহার করতে। আর টি.ভি. ফ্রিজ তো আজকাল সবার ঘরেই থাকে। বাহুল্যটা সত্যিই বিশ্রী। ভাবছি একটা মাইক্রোয়েভ ওভন দেব আর একটা এয়ার-কন্ডিশনার।

—সর্বনাশ! মাইক্রো-ওয়েভও আমাদের আছে। মাকে সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছিলাম। আর এ.সি. আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। লাবণির ঘরের জন্য দিতে পারেন। তার যদি এতই শখ।

—বলছ কী! লাবণির আর তোমার ঘর কি আলাদা হবে না কি? অরিন্দমের মাই ডিয়ার হবু-শাশুড়ি শঙ্কিত হয়ে বললেন।

—এ.সি. থাকলে হতেই হবে।

—সিঙ্গাপুর-আমেরিকায় কী করতে?

—ওখানে? গ্রীষ্মের দিনে যতক্ষণ পারি বাড়ির বাইরে থাকতাম। শীতে অবশ্য সেন্ট্রাল হিটিংটা লাগতই আমেরিকায়। সিঙ্গাপুরে এ.সি-টা অফ করে দিয়ে জানলা খুলে দিতাম চুপিচুপি।

—তা হলে কী হবে? লাবণির জন্যেও তো ওর দিদির মতোই টাকা রাখা আছে আমাদের।

—এক কাজ করুন না, মেয়ের নামে ইনভেস্ট করে দিন সব টাকাটা। আর কিছু দিতে হবে না। ফার্নিচার আমরা পছন্দ করে করিয়ে নেব। আমি যদ্দূর বুঝেছি আর কিছু থাক আর না থাক লাবণির একটা পেল্লাই ড্রেসিং টেবিল চাই-ই!

সব্বাই হাসতে থাকে। লাবণি বলে—এইজন্যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভাল্লাগে না। আমার সবকিছুই আপনার হাস্যকর লাগে। তাই না?

—কী মুশকিল, ড্রেসিং টেবিল কি খারাপ? আমি যেমন সেদিন একটা কম্প্যুটার স্ট্যান্ড কিনলাম। সাড়ে পাঁচ হাজার দাম নিল। ওটা না হলে আমার চলছিল না।

—হ্যাঁ এমনি করে বেশ বুঝিয়ে দিলেন, আপনার কম্প্যুটার, আপনি আঁতেল, টেকনোক্রাট, আর আমার ড্রেসিং টেবল,—একটা ফুলিশ ইম্‌ম্যাচিওর মেয়ে যে খালি রূপচর্চা করে।

লাবণির কথা শুনে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য! সে ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছিল লাবণির সম্পর্কে। তবু যে সে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে, সেটা ওই দূর নক্ষত্র যে এখন ভার্জিন মেরি—তার কাছে অসম্ভব বলে। অমৃতার জন্য তার যা আছে, তা একটা শ্রদ্ধা, আর দুর্নিবার আকর্ষণও। শ্রদ্ধাটা ঠেকে যায়, অমৃতার ঠাট্টা-তামাশায়।

—কী নিজেকে লালটু ঘোষ বলতেন কেন? অরিসূদন আর অরিন্দম-এ অনেক তফাত, সাউন্ডের দিক থেকে। আপনাদের দুজনের পার্সন্যালিটিতেও তফাত আকাশ-পাতাল। বুঝলেন লালটু ঘোষ! হুঁঃ।

আর আকর্ষণ? আকর্ষণটা ঠেকে যায় যখন স্নেহার্দ্র সুখে অমৃতা তার দেবশিশুকে কোলে তুলে নেয়। আদর করে। মনে হয়, সারা জীবনে এই একটা সম্পর্কই তাকে কিছু দিতে পেরেছে, এই একটা সম্পর্ককেই সে স্বীকার করতে প্রস্তুত। সেই ভার্জিন মেরিমাতার কাছে অরিন্দমরা অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কোনও কোনও রাতে একটি 'অস্পষ্ট' মেয়েকে দূর থেকে হাতছানি দিতে দেখে সে স্বপ্নেই ডাকে 'অমৃতা, অমৃতা,' কখনও তার স্বপ্নমগ্ন মগজ নামটা গুলিয়ে ফেলে ডাকে

'মৈত্রেয়ী! মৈত্রেয়ী!' মেয়েটির যেন ছায়াশরীর, ছায়াতেই মিলিয়ে যায়। প্রথম দিকে স্বপ্নের মধ্যে অমৃতাকে মনে করে তার যেমন রেতঃস্খলন হত, এখন আর তা হয় না। কিন্তু গভীর একটা মায়া, মমতা, অরিন্দমের তরফ থেকে অমৃতাকে ঘিরে আছে। সে-ই তার ইপ্সিতা অমৃত হরিণী। কিন্তু জীবন, প্রণয়, বিবাহ কোনওটাই এ জগতে খুব সরল ব্যাপার নয়। যাদের সরল, তাদের মধ্যে অরিন্দম পড়ে না। সে ভালবাসবে অমৃতাকে, কিন্তু কাছে যেতে পারবে না। কাছে যাবে লাবণির, কিন্তু ভালবাসতে হয়তো পারবে না। বিয়ে করবে লাবণিকেই। সে কথা দিয়েছে। আর বিয়ে তো একটা মানুষের সঙ্গেই শুধু হয় না। লাবণির মা, বাবা, তাকে আপন ছেলের মতো স্নেহ করেন। নিজেদের সঞ্চয়, আর্থিক ভবিষ্যৎ কী ভাবে সুরক্ষিত করবেন সে নিয়ে পর্যন্ত অরিন্দমের সঙ্গে আলোচনা করতে দ্বিধা করেন না। লাবণির ভাই অবন, একটা চার্মিং ছেলে। সে-ও তাকে দাদার মতোই দেখে। বিয়ের ব্যাপারে এদের কথাও তো তাকে ভাবতে হয়। আর এগুলোর চেয়েও বড় কথা বোধহয় সমাজের সম্মতিহীন কোনও কাজ করবার দুঃসাহসের অভাব। যে অমৃতার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে, যার কোলে তার পূর্বতন স্বামীর ছেলে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে গেলে যে কলজের জোরের দরকার হয়, সাধারণভাবে সাহসী ছেলে অরিন্দমের সে জোর নেই। এটা হয়তো অরিন্দম বোঝে না, নিজেকে কে আর কাপুরুষ ভাবতে চায়? তাই সে নিজের সপক্ষে একটা প্লেটনিক থিয়োরি খাড়া করেছে। বিয়ে করে গতানুগতিক একটা জীবন যাপন করবার যে সমাজসম্মত সমালোচনাহীন সোজা পথ সেই পথেই অধিকাংশ মানুষের চলাফেরা। কাজকর্মও তো আছে না কী? অসম্ভব প্রেশার কাজের। তার মধ্যে যদি বিবাহ নিয়ে, প্রণয় নিয়ে জটিলতা ঢুকে পড়ে তাহলে তা সামলানো শক্ত।

উপরন্তু সে রকম জমজমাট প্রেমময় বিবাহ আর কটা লোকের ভাগ্যে জোটে? যদি জমাট প্রেমের বিবাহ হয়ও সে প্রেম ঠিক সেই অনুপাতে কখনও বেশিদিন থাকে না। একটা সমঝোতা থাকে। একটা মমতা থাকে এই পর্যন্ত। যেমন তার মা-বাবার। তা, সে যদি সেই সমঝোতা, আর মমতা দিয়েই বিবাহিত জীবন আরম্ভ করে, ক্ষতি কী? সত্যি বলতে কী তার তো আরও অনেক মনোযোগের বিষয় আছে। সে ভালবাসে তার পেশাগত কাজের চ্যালেঞ্জ, সে ভালবাসে গান—নানা ধরনের, সে ভালবাসে পড়তে—শুধু গল্প-উপন্যাসও নয় আবার শুধু সায়েন্স জার্নালও নয়। সবরকম। তার ওপরে আছে তার রসিক মেজাজ। মজাদার ফাজলামো, বুদ্ধিমান ইয়ার্কি, সহৃদয় রসিকতা দিয়ে সে অনেক অনেক পাল্টে ফেলতে পারে তার চারপাশের আবহাওয়া। কাউকে বেশিক্ষণ মুখ গোমড়া করে থাকতেই দেবে না। নিজেকেও না। এমনি সুখী, সদানন্দ তার স্বভাব।

জানুয়ারিতে সুতরাং লাবণি-অরিন্দমের বিয়ের ঠিক হয়। রীতিমতো ঘটাপটার বিয়ে। সাবেকি সব রকম নিয়ম পালন করে। লাবণির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চারদিন নেমতন্ন। চঞ্চল আর নিশান তো গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এলেই ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাল। অবন বলল—চঞ্চলদা, নিশানদা বাজাল, তিলকদা তুমি একপাশে দাঁইড়ে দাঁইড়ে শুধু দেখলে? কেন?

তিলক গম্ভীরভাবে বলল—কারও বিয়েতে শাঁখ বাজালে আইবুড়োর নিজের বিয়ে হয় না।

চঞ্চল-নিশান তেড়ে এল সে কথা শুনে—আগে বলতে কী হয়েছিল? স্বার্থপর কোথাকার? এখন আমাদের কী হবে?

তিলক বলল—গোময় খেয়ে প্রাচিত্তির করে নিস। আসলে, কটা ট্রে পাঠাতে হবে দেখতে এত ব্যস্ত ছিলুম যে খেয়াল করিনি। মাফ করেছি, দোষ করে দে।

চঞ্চল বলল—তবে রে শালা, কটা ট্রে পাঠাতে হবে তার তুই কী জানিস? তার জন্যে লাবণির মা-বাবা-জামাইবাবু-কাকা-কাকিমা গুচ্ছের রয়েছেন। ফপরদালালি করার আর জায়গা পাসনি?

তিলক আবার গুরুগম্ভীর মুখে বলল—লাবণির বিয়ের ট্রে নিয়ে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। যে মাছ অন্যে খাবে তার দিকে নজর দিয়ে লাভ?

—কী বলতে চাইছ তিলকদা? অবন জিজ্ঞেস করে।

—আরে আমি দেখছি আমার বিয়েতে আমাদের কটা ট্রে পাঠাতে হবে। চল্লিশ হাজারি বরের বাড়ি থেকে এম.এ. সুন্দরীর বাড়িতে ক'টা ট্রে আসে, চার হাজারি বরের বাড়ি থেকে স্কুল-ফাইনাল ফেল খেঁদিপেঁচির বাড়িতে তো ঠিক তটা ট্রে যাবে না। হিসেবটা করেছিলুম। তা টেন পার্সেন্ট কমালেও দেখলুম আমার হিসেবে আসছে না।

—শ্শালা—নিশান বলল— বলে ভাত-মাংস খাবি? না আঁচাবো কোথায়? এম.এ.তে ফেল করবি কি পাশ করবি তার কিনারা হল না। চাকরি পাবি, অ্যাট অল পাবি, না কোচিং করে সারা জীবন চালাতে হবে তার কিনারা হল না উনি দেখছেন নিজের বিয়ের গায়ে হলুদের স্বপ্ন।

—অতটা না অতটা না, অবন তিলকদার হয়ে সাফাই গায়। —ও তো শুধু ট্রে গুনছিল। ট্রে আসবে তবে তো গায়ে-হলুদ হবে। দিদিকে তো সবে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হলুদ ট্রে থেকে আগে বার হোক! ওরিন্দমের গায়ের হলুদ!

শর্মিষ্ঠা, অনিন্দিতা, এমন কি চঞ্চল তিলক নিশান পর্যন্ত লাবণির গায়ে হলুদ মাখাল আচ্ছা করে। ছেলেগুলো বলল, হলুদ লাগাতে না দিলে কনের পিঁড়ি ওঠাব না।

এ তো আচ্ছা শয়তান! —লাবণির কাকিমা বললেন। ওরা তেল-হলুদ নিয়ে রৈ রৈ করে তেড়ে আসছে, লাবণি কনের লাজ লজ্জা ভুলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল—এই চঞ্চল, এই নিশান, খবরদার গায়ে মাখাবি না, হোলির মজা পেয়েছিস না? এই কপাল পেতে দিচ্ছি, যা খুশি করো।

নিশান ফক্কড় নাম্বার ওয়ান— বললে, যাঃ প্রিয় বান্ধবী বলে কথা, সবটাই অরিন্দম ঘোষ একাএকি পেয়ে গেল? গায়ে-হলুদের একটু নিষ্পাপ-নির্দোষ 'গা' সেটুকুও আমাদের জুটল না? ছ্যাঃ, কপালটাই গা প্লাস ধা'র।

লাবণি মুখভঙ্গি করে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ ছ্যাঃ! তোদের মতলব আমি বুঝি না ভেবেছিস? সব অরিন্দমকে বলে দেবো, দেবে তখন তোদের শয্যা-তুলুনির টাকা! তুড়ুং ঠুকে দেবে একেবারে।

এই সময়ে দোলা এসে হাজির হল। উদরের সামান্য স্ফীতিটুকু আড়াল করতে সে একটা জমকালো শাল গায়ে দিয়েছে। মুখটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। গাঢ় মেরুন শালের পটে ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো ফুটে আছে মুখটা। কানে দিয়েছে বড় বড় রিং। তাতে এক ফোঁটা মুক্তো টলটল করছে। দোলার কপালে ছোট্ট খুব ছোট্ট একটা তিলের মতো মেরুন টিপ। হাতে মোটা সোনার বালা, গলায় মফ চেন। তিন হালি করে পরেছে। সে সাধারণত সালোয়ার কামিজ, কিংবা মিডি-স্কার্ট পরত। বাইরে জিন্‌স। গয়নার ধার ধারত না। কানের নানারকম গয়নার শখ ছিল তার, ধুম্বো ধুম্বো আংটি, কিন্তু হাতে ও ঘড়ি ছাড়া কিছু পরবে না, গলায়ও না। সেই দোলা সোনার মোটা বালা, তিন হালির হার পরে এসেছে, কপালে ছোট্ট হলেও টিপ, সিঁথিতে সরু একটা লাল রেখা, তাকে দেখাচ্ছে একেবারে অন্যরকম।

লাবণিকে ছেড়ে সবাই এবার দোলাকে নিয়ে পড়ল।

—কী হল! হরতনের বিবি। তোর সাহেব কোথায়? —নিশান বলল।

—সাহেবদের সকালের দিকে চাকরি-বাকরি থাকে, তোদের মতো বেকার? দোলার জবাব।

—তা রাতে আসবে তো গুরু? একটু গায়ে গা ঠেকিয়ে নিতাম মাইরি!

ঈষৎ গর্বের সুরে দোলা বলল—তার চেয়ে একটু ব্যায়াম-ট্যায়াম করো দেখি! গায়ে গা ঠেকিয়ে নিতে হবে কেন? কে আমার এলেন রে?

—আহা হা, ব্যায়াম করে না হয় চাট্টি মাসকুল করলুম, কিন্তু স্ট্রাকচার? স্ট্রাকচার পাব কোথায়? অমন মলাট বলেই না তোর মতো মালদার বাপের একমাত্তর কন্যেকে গেঁথে তুলেছে!

—একমাত্র কোথায় আবার? আমার দিদি আছে, জানিস না?

—ওই হল। ওই হল। যাঁহা দুই মাত্তর তাঁহাই একমাত্তর। ছোট মেয়েকেই মেসোমশাই-মাসিমা বেশির ভাগ সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, দেখিস!

—যা না বলগে যা না আমার দিদিকে। কী করে দ্যাখ একবার।

দোলার আজ মেজাজ অসম্ভব ভাল। আগের মতো। পুরোপুরি নয়, অনেকটা। তাদের বাড়ি থেকে স্থির হয়েছে যত দিন না তার বাচ্চা হয় সে বাপের বাড়িতেই থাকবে। ক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি অবশ্য তাকে যেতে হয়েছিল। নাম তা ওয়াস্তে একটা বউভাত ও প্রীতিভোজের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে দোলার অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। তার শ্বশুরবাড়িটা একটা বাড়িই না।

টেবিলে ওঁরা এক সঙ্গে বসে প্রায় খানই না। বাবা সকালে আগে খেয়ে বেরিয়ে যান, মা ভোর থেকে রেওয়াজ শুরু করে খেতে বসবেন ঠিক এগোরোটা। অমিতাভ বেরিয়ে যায় কোনওদিন নটা। কোনওদিন দশটা। সেই সময়েই রান্নার লোক তার খাবার বেড়ে দেয়। দোলার এখন অখণ্ড অবসর। শরীরের মধ্যেও সর্বদাই খাই-খাই। শ্বশুরের খাওয়ার সময়ে সে একদফা জলখাবার খায়, শাশুড়ি নিজে খাবার সময়ে গম্ভীরভাবে বলেন—তুমি বরং পরে খেও। একটা নাগাদ রান্নার লোক এসে তাকে খেতে ডাকে। তখন খিদেয় তার বত্রিশ নাড়ি পাক দিচ্ছে। একদিন সে শুনেছিল রান্নার মাসি তার শাশুড়িকে বলছে—নতুন বউয়ের খাউন্তি দাউন্তি ভালই মা, মেয়েছেলের অতটা খাওয়া, ঘরে লক্ষ্মী থাকে কি না দেখেন। লোকটি নাকি এদের অনেকদিনের। শাশুড়ি শুধু বললেন—আচ্ছা আচ্ছা সে আমি বুঝব। তোমাকে আর কর্তাত্বি করতে হবে না।

রাত্রেও যে এরা একসঙ্গে খাবে তা প্রায় ঘটেই ওঠে না। হয় মা বাড়ি নেই, নয় বাবা এখনও ফেরেননি, নয় অমিত এত সকাল সকাল খেতে চাইছে না কি সে-ও ফেরেনি। দোলার খিদের কষ্টে চোখে জল এসে যায়, শাশুড়ি অনেক সময়ে তাকে খাটো গলায় বলেন—তুমি কারও জন্যে বসে থেকো না দোলন, খিদে পেলেই খেয়ে নেবে, তোমার এখন যা অবস্থা...। কিন্তু অপরের বাড়িতে গিয়ে তো আর অমন চেয়ে চেয়ে আগে আগে খাওয়া যায় না!

একদিন রাত্রে একসঙ্গে বসা হয়েছিল। অমিতাভ সবে একটা ট্যুর থেকে ফিরেছে। অমিতাভর বাবা বললেন—বিয়ে করেছ তুমি। বউকে আমাদের ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে তা হবে না। এ মাস থেকে পাঁচশো করে টাকা বেশি দিও।

—পাঁচশো? তুমি তো জানো বাবা তা হলে আমার চলবে না।

—আজকালকার দিনে একটা মানুষের খাইখরচ পাঁচশোর থেকে বেশিই হয় অমু...।

দোলা রাত্রে অমিতের বুকে মুখ রেখে বলেছিল—আচ্ছা অমিত, তোমার সেই বন্ধু, সেই সল্টলেকের? তিনি তো থাকেন না, আমরা কিছুদিন সেখানে থাকতে পারি না? কেয়ার-টেকার তো সবই দেখে, রান্নাটা যা হোক করে আমি চালিয়ে নেব!

—উপাধ্যায়ের বাড়ি? ওরে বাবা সে মহা জেলাস হাউজ-ওনার। দেখি, বলে দেখতে পারি। তবে ও বাড়িটা আমার একটা দুঃস্বপ্ন।

—দুঃস্বপ্ন কেন? আহত, বিস্মিত দোলা বলেছিল।

—ওই আর কি! একটা আনন্দ, একটা উপভোগ, যদি বাধ্যবাধকতায় এসে দাঁড়ায়...।

—এ কথা তুমি বলতে পারছ আমিত?

—আই ডোন্ট মীন টু হার্ট ইউ ডিয়ার, অমিত তৎক্ষণাৎ তাকে আদর করে। দোলাও আর কথা বাড়ায় না। কিন্তু কথাগুলো তার বুকে কাঁটার মতো বিঁধে থাকে।

এরপর বাবা-মা যখন প্রস্তাব করলেন বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত সে তাঁদের কাছেই থাকুক, কেউ আপত্তি করল না। দোলা বাঁচল।

অমিত উইক-এন্ডে এসে ঘুরে যায়। কিন্তু তার রাতে থাকাটা সুমনা খুব পছন্দ করেন না। জনান্তিকে মেয়েকে বলেন—এ সময়ে সাবধান থাকতে হয়। একবার চরম সংযমহীনতার পরিচয় দিয়েছ দোলা, সেটা সামলানো গেছে, বাড়াবাড়ি করলে তোমার এবং বাচ্চার দুজনেরই ক্ষতি হবে।

এর মধ্যে অমৃতার সঙ্গে দোলার আবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। অমৃতা এই অবস্থাটা সম্পর্কে

সব জানে, সে দোলাকে উপদেশ দেয়। ডক্টর রঞ্জন কার্লেকরই দোলাকেও দেখছেন। দোলার খালি একটাই ভয়। ভয়টার কথা সে নিজেকেও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। ভয়টা হল—এতদিন দোলা-সংসর্গহীন অমিতাভ কী করবে? কী করতে পারে? কালীপ্রসন্ন সিংহর 'মহাভারত' তার পড়া আছে। সবটা না হলেও বেছে বেছে মূল গল্পটা, আর যা যা ভাল লাগে সে পড়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করেছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের মনোরঞ্জন করত এক দাসী। অর্থাৎ গর্ভধারণের সময়ে স্ত্রীসংসর্গ না হলে স্ত্রীলোক-সংসর্গ দরকার হয় পুরুষদের। এই সময়টায় 'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান' মনে পড়ে তার পুরো শরীর-মন-গরল-সমান বলে মনে হয়। বিশেষত এই এত দিনেও অমিতাভর মনের নাগাল সে পায়নি বলে। কী আছে ওই রূপবান পুরুষের মনে? ওর বাবা বলেন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন, মা বলেন ও চঞ্চলস্বভাব, সব মানুষ যারা ওর অল্পস্বল্প সংসর্গে এসেছে তারা বলে ও চা-র্মিং, ফ্যানটাসটিক, বউভাতে ওর অফিসের কাউকে নেমতন্ন করেনি অমিত। বন্ধু-বান্ধবী কজন এসেছিল। বান্ধবীরা বলল 'দেখি ভাগ্যবতীটি কে? কেমন?' আর বন্ধুরা বলল সেই এক স্ট্যান্ডার্ড কথা, ক্লিশে,—'লাকি গাই। লটারির প্রাইজ জিতে গেলি রে শালা।' তার নিজের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ দোলা করতে পারে না। যদি ভাল না লাগত তবে কি আর অমন উন্মাদের মতো প্রেমে পড়ত সে? কিছুতেই সে ভুলতে পারে না, অমিত তার সেই উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে... না না অবশ্যই তারও অংশ আছে, আর কে এ কথা বলেছে যে অমিতও উন্মাদ হয়নি? তার সেই ফোনালাপ, হুগলি নদীর ধারে জেটিতে, জু-গার্ডেনে, ভিক্টোরিয়া বা মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের পাতা সিটগুলোয় কি স্তম্ভের অন্তরালে সে-ও তো এক অমিতকে দেখতে পেয়েছিল, যে তার প্রেমে উন্মাদ! তবু, দোলার গর্ভিণী হওয়ার সংবাদে সে অত বিরক্ত কেন? প্রেশারাইজ করার কথাই বা কেন তুলল সে? বিয়ের কথায় বিষণ্ণ হয়ে গেল কেন?

দোলার বিয়ের বাসর খুবই জমেছিল। দোলাকে ছাড়াই। কিছুক্ষণ হই-চই এর পর দোলার শরীর খারাপ লাগছিল, সুমনা তাকে অন্য ঘরে শোয়াতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকেই সে বাসর ঘরে অমিতের উল্লাসভরা গান, সমবেত শালা শালিদের উচ্ছ্বাস, চিৎকার যাকে বলে হট্টরোল, আর হাহা হিহি হুহু শুনতে পাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল তাকে যে-ভাবে সম্মোহিত করে ফেলেছিল অমিত, তার অ্যাপলো, না কি ডায়োনিসাস, ঠিক সেই একইভাবে সে সম্মোহিত করে ফেলছে এক ঘর মানুষ-মানুষীকে। অনেক মানুষ ঈর্ষা করছে ডায়োনিসাসকে তার রূপ, তার জমাবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে, কিন্তু সে আর কতটুকু? বড়র কাছে ছোটর তো হারই হয় সব ক্ষেত্রে। তাই আত্মসমর্পণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চেলা বনে যাচ্ছে ডায়োনিসাসের। অনেক মানুষীও ঈর্ষা করছে তাকে, দোলাকে, এই অপরূপকে সে পেতে যাচ্ছে বলে, ঈর্ষার কাঁটা বুকে নিয়ে তারা অন্তত একটা রাত এই বাসররাতটুকু তাকে, ডায়োনিসাসকে মুগ্ধ করবার জন্যে নানা ছলাকলা প্রয়োগ করছে, দেবদাসী বনে যাচ্ছে, এবং তুমুল হয়ে উঠছে গান, রসিকতা, ইয়ার্কি। আদিরসাত্মক। আর ভিন্ন ঘরে গাঁটছড়া সুদ্ধ তার ওড়না তার অমিতাভের উত্তরীয় বুকে জড়িয়ে তার মনে হচ্ছে ওই গাঁটছড়াটা লাল নয়, নীল, কিংবা সবুজ, তার ঈর্ষার গরলে। এত তো বন্ধু তার। কত জন তার চেয়ে রূপসী, তার চেয়ে লেখাপড়ায় ভাল, তার চেয়ে সফল, জনপ্রিয়, কিন্তু কারও ক্ষেত্রে এই সর্বগ্রাসী ঈর্ষা তো তাকে কখনও আক্রমণ করেনি। তার ইচ্ছে করে, গাঁটছড়াসুদ্ধ ওড়না তার উত্তরীয় দুটোকে সে ছুড়ে ফেলে দেয় এক কোণে, লাল টকটকে বেনারসি আর প্রচুর অপূর্ব-অপূর্ব গয়নায়-প্রসাধনে সত্যিকারের রানির মতো ক্রোধে, অধিকার বোধে, মর্যাদায়, আদেশে—আপাদমস্তক শরের মতো সোজা করে সে প্রবেশ করে ওই বাসর ঘরে, বলে, বন্ধ কর বন্ধ কর এই স্যাটার্নেলিয়া—এই অশ্লীল উৎসব, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা সবাই। ওই পুরুষ, রাজাই বলিস আর দেবতাই বলিস—ও আমার, একা আমার। বড় কঠিন মূল্যে ওকে জয় করেছি, তবু ভয় যেতে চাইছে না। তোরা যা-আ-আ।

কিন্তু যাবে কী! বমির ভাব তার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন সবকিছুতে সে একটা মারাত্মক

শ্বাসরোধী গন্ধ পায়, পেট বুক সব কিছু গুলিয়ে উঠছে রজনীগন্ধার গন্ধে, নানারকম সুগন্ধির সৌরভে, খাবারের গন্ধে। তার এই অবস্থার জন্য দায়ী পুরুষটি কেমন মুক্তমনে মুক্ত শরীরে মজা লুঠছে! সে, খালি সে, নারী বলে ওই পুরুষের সঙ্গে কামক্রীড়ার যাবতীয় দায় বহন এক ধনীর নিষ্পাপ আদরের দুলালী থেকে এক রোগগ্রস্ত, ভয়কাতর, ঈর্ষা-কাঙালিনী মানবীতে পরিণত হয়েছে। হে জিউস! হে ঈশ্বর! হে আল্লাহ্! এ তোমার কেমন বিচার?

ফুলের গয়নাগুলো ছুড়ে ছুড়ে খুলে ফেলে দেয় সে যেখানে সেখানে। সে, যে নাকি ফুল পাগল ছিল এককালে। ফুলের গন্ধে কেমন একটা বিশ্রী নারকীয় ভয়, যেন এ পৃথিবী মানুষের মন। ভূতের, পেত্নির, শাঁকচুন্নির, এখানে বড় বড় উনুনে বড় বড় কড়াইয়ে নরমাংস সেদ্ধ হচ্ছে।

এই সময়ে সুমনা আবার ঢুকলেন। সারাদিন মেয়েটাকে কঠিন কিছু খাওয়াতে পারেননি। এই মাঝরাত্তিরে নিজের হাতে চামরমণি চালের গলা গলা ভাত আর কইমাছের ঝোল নিয়ে এসেছেন। সময় মতো ঝোলটা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন, ভাতটা এইমাত্র করলেন প্রেশার-কুকারে, তিনি জানেন বাসমতী খেতে পারছে না দোলা। গন্ধঅলা জিনিস সে যত সুগন্ধই হোক, তার কাছে বিষ লাগছে।

মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। চারদিকে মালা, ওড়না ছড়ানো। যেন বিয়ের রাতেই বিধবা হয়েছে মেয়ে। তিনি কাছে গিয়ে বুঝলেন, দোলা চোখ বুজিয়ে আছে বটে কিন্তু ভেতরের কান্নার আবেগে তার ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। দোলা, তাঁরই দোলা, দোলনসুন্দরী।

তিনি নরম গলায় ডাকলেন—দোল।

অনেকদিন পরে মায়ের এই আদরের ডাক শুনতে পেল দোলা। তার কান্না আর বাধা মানল না। কূল ছাপিয়ে বন্যার মতো ফুঁসতে লাগল।

—দোল বড্ড কষ্ট হচ্ছে গন্ধে, না?

দোলা মায়ের বুকে মুখ গুঁজল। রুদ্ধস্বরে বলল—মা, আমার পেটে কে এসেছে? একটা রাক্ষস, না একটা দানো, না কী? যে আমার এমন...

তাকে জড়িয়ে ধরলেন সুমনা, বললেন—আমারও ঠিক এমনি হয়েছিল মা, ঠিক এমনি। কিন্তু জন্মালি তো তুই!

—সত্যি মা? তা হলে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি বলেই কি আমি এমন...

—দূর। সন্তান জন্মের সময়ে হরমোনের যে বদলগুলো হয়, তার জন্যেই এমন হয়। পুরো সিসটেমটাই... যাই হোক তুই খেয়ে নে।

—আমি খেতে পারব না মা।

—পারবি। ঠিক যা যা তোর ভাল লাগবে তাই-তাই আমি এনেছি।

আগে ফুলগুলো ঘর থেকে বার করে দিলেন সুমনা। বিয়ের সাজ খুলে ফেলে—একটা পুরনো নাইটি পরিয়ে দিলেন। তারপর নিজের কোলের ওপর একটা মেয়ের কোলের ওপর একটা তোয়ালে পেতে—কই মাছের ঝোল দিয়ে চামরমণি চালের গলা-গলা ভাত মেখে, বললেন—খা।

ঘুমের ঠিক আগে তন্দ্রার আবেশে মার কোমর জড়িয়ে শুয়ে দোলার আবছাভাবে মনে হচ্ছিল যুগ-যুগান্ত শুধু এই চেয়ে এসেছে সে। মায়ের কোল, মাতৃসঙ্গ, এর চেয়ে বড় চাওয়া আর পাওয়া তার জীবনে আর নেই। কিন্তু এমনই আয়রনি জীবনের যে এক পুরুষ-আসঙ্গ না ঘটলে সে তো আসতই না মায়ের জীবনে, মা তো মা-ই হত না। এবং এই আশ্রয় ছেড়ে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে, দিয়েছে, পুরুষেরই বাহুতে যে তার এত যন্ত্রণার মূল। এবং আবারও সে জন্ম দেবে হয়তো এক কন্যার যাকে সে ভালবাসবে, আশ্রয় দেবে, জীবনসর্বস্ব মনে করবে, এবং এত সব জেনে, উপলব্ধি করেও সেই কন্যা আবার পুরুষকেই চাইবে। যার থেকে হবে আরেক জন্ম, আরেক মা, আরেক যন্ত্রণা... এইভাবে যুগের পর যুগ, যুগের পর যুগ, যুগের পর যুগ..

অদ্ভুত! আজ কিন্তু দোলা লাবণির বিয়েতে এসেছে প্রাণভরে ওই সুগন্ধি, নতুন শাড়ি, রজনীগন্ধারই গন্ধ নিতে। আর খুব লজ্জার কথা সে বিশেষ করে এসেছে—খেতে। গায়ে হলুদের সকালবেলায় ঘরযোগে একটা ভারী সুন্দর খাওয়া হয়। উত্তর কলকাতায় যে সামান্য কটি বাড়িতে হালুইকর বামুনের ট্রাডিশন এখনও চলছে, লাবণিদের বাড়ি তাদেরই একটা। আজ সে খাবে ছ্যাঁচড়া, বোঁটাসুদ্ধ লম্বা বেগুন ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, কষে কষে কষে এইটুকু করে ফেলা বাঁধাকপির ঘণ্ট, ওপরে বড়ির গুঁড়ো ছড়ানো থাকবে, আর বড় বড় মাছের দাগা দিয়ে কালিয়া। কে জানে হয়তো ডিম-ভরা পার্শে মাছ ভাজাও পাতে পড়বে। ভাবতেই জিভে জল এসেছিল তার। আর তাই সে তাড়াতাড়ি সেজে-গুজে বাবার গাড়িতে করে চলে এসেছে লাবণিদের বাড়ি। এসেই গরম-কফি খেয়েছে, তার পরেই বড় বড় দুটো কমলাভোগ, গায়ে-হলুদের তত্ত্বের শিঙাড়া, নিমকি। খাচ্ছে সে, পাল্লা দিয়ে খাচ্ছে তিলক, চঞ্চল, নিশানদের সঙ্গে। চেটেপুটে। এবং কেউ কেউ লক্ষ করছেন টসটসে সুন্দর মুখশ্রীর রঙ-ফেটে পড়া জলুষদার মেয়েটির অস্বাভাবিক খাওয়া। গিন্নি-বান্নিরা পরস্পরকে বলাবলি করলেন—ছেলেপিলে হবে। জনান্তিকে মানে মেয়ে-মহলে তাঁরা মেয়েটিকে বাগে পেয়ে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। —'তোমার ক'মাস গো মেয়ে?'

দোলা লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে সরে যায়। বিয়ের রাতে সে আরও খাবে। তখন নাম-করা কেটারার। নিজের বিয়েতে যা-যা খেতে পায়নি, স-ব খাবে সে প্রাণ ভরে, আশ মিটিয়ে।

এবং রাতে আসবে তার অমিত, অমিতাভও। দুজনে আসবে যুবরাজ যুবরানির মতো সেজেগুজে হয়তো বা এ বাড়ির বর-কনেকে রূপজৌলুষে ম্লান করে দিয়ে।

'দোলা, দো-লা,' ট্যাকসিতে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল অমিতাভ। আইসক্রিম পিঙ্করঙের ছোট্ট ছোট্ট রুপোলি টিপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে দোলা, মুক্তোর গহনা। তার সোজা চুল খোলা, আয়রন করা। কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণধার কালো স্রোতের মতো মাঝ-পিঠ অবধি নেমেছে। অমন অপূর্ব রূপবতী তাকে বুঝি কখনও লাগেনি অমিতাভর। তার নেশা লাগছে। নেশার ঘোরে সে ভাল করে নিশ্বাস নিতে পারছে না। বিয়ে-বাড়িতে অত সুসজ্জিত মেয়েদের মধ্যে দোলাকেই বারে-বারে, ঘুরে-ঘুরে দেখেছে সে। যেন নতুন বউ। ট্যাকসি-ড্রাইভারকে আগেই দেড়শো টাকা দিয়ে রাখল সে। বলল, চলো গঙ্গার ধার দিয়ে। ট্যাকসির মধ্যেই অদ্ভুত কায়দায় মিলিত হল তারা।

—অমিত, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসো না...না?

—চুপ, চুপ এখন ওসব কথা বলে না।

—অমিত, একবার বলো তুমি শুধু আমার, আমাকে ছাড়া আর কাউকে...

—সাইলেন্স ডিয়ার। —আগ্রাসী চুম্বনে মুখ ভরে যায়, কথা থেমে যায়। ভীষণ জরুরি কথা সব।

অনেক রাতে বাড়ি ফেরে তারা। যেন বিবাহিত দম্পতি নয়। প্রেমিক-প্রেমিকা। ঠিক তেমনি গোপনতার সঙ্গে বাড়ির দরজায় তাকে ছেড়ে দেয় অমিত।

সুমনা-সব্যসাচীও ঘরবার করছেন।

—কী রে? এত দেরি?

—ওরা ছাড়ছিল না কিছুতেই।

—এত গয়না-টয়না পরে, আমার খুব ভয় হচ্ছিল দোলা—সুমনা বললেন।

—সোনা তো পরিনি মা, ওইজন্যেই আরও... কথা শেষ করে না দোলা। ওইজন্যেই, কী? সাহস? দেরি? ব্যাখ্যা করে না কিছুই।

—অমিত কোথায়? নামল না একবার?

—না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে! ওঁরাও তো ভাববেন।

ওঁরা বলতে কৃষ্ণা সেন এবং তাঁর স্বামী? একেবারেই ভাববেন না। সদরের আলাদা চাবি থাকে

অমিতাভর কাছে। সে কখন আসে, কখন যায়, আদৌ আসে কি না সে খবর ওঁরা রাখেন না। সাড়ে আটটায় ওঁদের রাতের খাওয়া, সাড়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়েন।

সুমনা বললেন—না হয় একদিন থেকেই যেত। একটা ফোন করে দিতাম।

—ছাড়ো তো।

দোলা আবার ফিরে এসেছে তার পুরনো মেজাজে, ফিরেছে গোপনতায়, মিথ্যায়, নির্লজ্জতায়, নইলে কী ভাবে সে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে...

মাঝরাত্তিরে তার ঘুম একটুর জন্য ভেঙে যায়, কে যেন বলে ওঠে 'আপনাকে তো বাইরে থেকে বেবুশ্যে বলে প্রত্যয় হয় না ; সেকালে ওই ছোকরাটাই বেবুশ্যে। খানকি একটা...।'

দোলা একবার চমকে ওঠে। তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

২৪

রেজাল্ট সম্পর্কে অনেক রকম গুজবে রটতে শুরু করেছে। কেউ বলছে শর্মিষ্ঠা পাইন ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, সে হলফ করে বলতে পারে, ভেতরের খবর। কেউ বলছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবারের ফলাফল, কে? কে? দোলার ফোনটা যখন এল অমৃতা এরকম কিছু গুজবই আশঙ্কা করছিল। মা ডেকে দিল। দোলার মনের মধ্যে এত তাড়া যে সে অমৃতার মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে গেছে।

—কে?

—আমি দোলা বলছি।

—বল, চঞ্চল ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে এই তো!

—না, না, ওসব না।

—তবে বল কেমন আছিস। দুজনে, না না, তিনজনে?

—ভাল না রে অমৃতা

—এখনও শরীরটা...

—শরীর ঠিকই আছে। মন...

—সে কী? কেন? —নিজের জীবনে চূড়ান্ত দুর্দৈব ঘটে গেছে, তবু যেন অমৃতার বিস্ময় আর ফুরোতে চায় না।

—একটু আসবি?

—তোদের বাড়ি? বড্ড দূর যে রে! টুটুলকে ছেড়ে অতক্ষণ

—তা হলে মাঝামাঝি কোথাও। ধর ব্লু-ফক্স?

—আমার সে রেস্ত কোথায় বল?

—খরচ তো করব আমি। তোর কী?

—ঠিক আছে।

ব্লু-ফক্সের আবহে অমৃতা আর দোলা। অমৃতার পছন্দের রং নীল, হালকা সমুদ্র-সবুজ, লাইল্যাক, দোলার পছন্দের রং কমলা, মেরুন, গোলাপি। অথচ দুজনেই আজ হলুদ বনের কলুদ ফুল হয়ে এসেছে। কলেজ হলে এই নিয়ে কত বিস্ময় কত উচ্ছ্বাসে ঘণ্টাখানেক তো কাটতই। সবই তো বুদবুদ, কথা ভাবের, ভাব মেজাজের। এখন বুদবুদ নেই, দুজনে একই রঙের শাড়ি পরে, সে সম্পর্কে একেবারে অচেতন হয়ে গ্রিল্‌ড্‌ ফিশ-এর সাজানো প্লেটের সামনে বসে আছে।

দোলার মুখ এমন যে আর দু-এক বছর আগে হলেই অমৃতা ভাবত দোলা এখ্‌খুনি বলে

উঠবে—জানিস অমৃতা, আমার তোর ওপর ভীষণ রাগ হয়েছে। তুই কেন...। চা, ক্ষমা চা। কিন্তু সেই ছেলেমানুষির মায়া আর বোধ হয় সে মুখে নেই।

সে বলল—এমন জরুরি তলব? কী ব্যাপার রে?

—অমৃতা, একটা বাচ্চাকে একা একা বড় করতে খুব কষ্ট, না রে?

—খুব কষ্ট, আবার খুব আনন্দও রে। পৃথিবীর সব মায়েরা কাজটা স্বচ্ছন্দে করে এসেছে। নইলে কি আর পারত!

—কিন্তু তাদের তো পাশে কেউ একজন থাকত! ন্যাপি-বদলে না দিলেও, ফিড না করলেও, একজন...। তুই এমন একা-একা...কথা শেষ করতে পারে না দোলা।

—হ্যাঁ, মাসি আছেন, মা-বাবা আছে, তবু শেষ পর্যন্ত আমি টুটুলের বাবা-মা দুটোই।

—কী করে পারিস?

—আমি তো গোড়ার থেকেই... জানতামই তো

—অমৃতা, তুই বিয়ের আগেও অনেক দায়িত্ব নিয়েছিস। নিতিস। হয়তো তাই পারছিস। কিন্তু আমি...আমার পক্ষে একা একা

অমৃতা চমকে বলল—একা? কেন?

দোলা মুখ নিচু করে ফেলেছে। ফর্সা মুখ কেমন রক্তহীন দেখাচ্ছে। সে বলল—কাউকে বলিস না অমৃতা, আমার কেমন মনে হচ্ছে বাচ্চাটাকে আমায় একা একাই মানুষ করতে হবে। ওর বাবা... ওর বাবা...

—ওর বাবা কী? ও কি তুই কাঁদছিস দোলা?

—বিয়েটা বোধহয় আমি ঠিক করিনি রে। সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার বাবা-মা, ওর বাবা-মা, দিদি-পার্থদা সব্বাই। কী জানি হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে, হয়তো এসব সংশয়ের কথা এখনই কাউকে বলাও আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু একমাত্র তোকেই বিশ্বাস করে বলতে পারি। —দোলার স্বর ভেঙে গেছে।

—ব্যাপারটা কী বলবি তো?

—ও তো গোড়ার থেকেই বাচ্চাটা চায়নি।

অমৃতার মুখ শক্ত হয়ে গেল নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে। সে বলল—তো?

—আমিও এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিয়ের আগেই...অমৃতা প্লিজ আমাকে খারাপ ভাবিসনি।

—ভাবছি না। তুই বল।

—আমি টার্মিনেট করতে চাইনি বলেই বিয়েটা হল।

অমৃতা তার চূড়ান্ত বিস্ময়কে যত কম পারে প্রকাশ করে বলল—টার্মিনেটট করা গেলে কি বিয়েটা হত না?

—আমি জানি না, জানি না অমৃতা—দোলার চোখে রুমাল। রুমালের আড়ালে চোখ রাঙা হতে থাকে।

—আমি ওকে বুঝি না। উন্মাদের মতো ভালবাসি ওকে। কিন্তু প্রতিদান পাই কি না বুঝতে পারি না।

উন্মাদের মতো? সে ব্যাপারটা কী রকম? নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলা কী অমৃতা জানে না। বইয়েতে পড়েছে, কবিতায়, উপন্যাসে কত গল্প লেখা হল এ নিয়ে, প্রচুর, প্রচুর। লিখেছে সে সেসবের কথা পরীক্ষার খাতায় খাতায়। কিন্তু কোনও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নেই তার। দোলা পারে। সে পারে না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত এক অবস্থানে পৌঁছচ্ছে। এই এক রঙের শাড়ির মতো। দোলার কমলা লাল উন্মাদনাও তাকে রক্ষা করতে পারছে না, তার শান্ত নীল প্রসন্ন সুমিত সবুজ কাণ্ডজ্ঞানও তাকে পারেনি। সে কী বলবে দোলাকে? কী বলবে এখন?

—দোলা, একটু ধৈর্য ধর।

—থাকেই না রে, কোথায় কোথায় ঘোরে জানি না। কতটা ওর কাজ, কতটা শখ...। ট্যুরে গেছে বলে জানি অথচ পার্থদা একদিন ওকে জে-ইউয়ের ক্যাম্পাস থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেরোতে দেখেছে। তিলক দেখেছে রবীন্দ্রসদনে।

—আর কেউ সঙ্গে ছিল?

—জানি না। তিলক বলল তোর রোমিওকে দেখলুম অথচ তুই জুলিয়েট পাশে নেই!...আমি ওকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না অমৃতা। এ যে কী কষ্ট, কী ভয়ানক যন্ত্রণা...বলতে বলতে দোলা একেবারে ভেঙে পড়ল।

এখন লাঞ্চের আগের সময়টা। টেবিলগুলো রেডি করা হচ্ছে। খুব বেশি লোক নেই ভেতরে। দু একজন বেয়ারা ফিরে তাকাল।

—দোলা প্লিজ

—অমৃতা, আমি যে এই অবস্থায় বাবা-মায়ের কাছে এতদিন আছি, ওর তো কিছু দেওয়া উচিত। বাবা-মাকে না-ই দিল, আমাকে? আমাকে তো দেবে? দেয় তো না-ই। উল্টে আমার কাছ থেকে পাঁচশো, পরের সপ্তাহে হাজার এমনি করে চায়। বলে শোধ দিয়ে দেব। অমৃতা এ আমি কী করলাম! এখন এই জালের মধ্যে থেকে...তা ছাড়া ওকে দেখলেই আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অমৃতা বলল—আমাকে কী করতে বলিস!

অমৃতা সেই অমোঘ বাক্য বলতে পারত। আমাকে জিজ্ঞেস করে তো এগোসনি, আমি কী বলব! কিন্তু বলতে পারল না। তার বিপদের দিনে দোলা ব্লু-ফক্স থেকে বেরচ্ছিল। কিন্তু তবু দোলা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—কিছু বল, কিছু অন্তত বল। তোর কী মনে হচ্ছে, কী মত!

—এখনই এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি দোলা, সে বলল, হয়তো তিলকে তাল করে দেখছিস। বাচ্চাটাকে নির্বিঘ্নে হতে দে। তবে...টাকাকড়ি আর একেবারেই দিস না। বলবি এক পয়সাও আর তোর কাছে নেই। তোকেই বরং ও কিছু দিয়ে যাক। মা-বাবার কাছে চাইতে তোর মানে লাগে। মানের কথাটা বেশি করে বলবি। যেগুলো নিয়েছে সেগুলোও তাড়াতাড়ি ফেরত দিক। কারও কাছে ও যেন ছোট না হয়ে যায়। তুই যে অবিশ্বাস করছিস, এটা জানতে না দেওয়াই ভাল বুঝলি দোলা? ঝগড়া, মান-অভিমান করিস না। হালকাভাবে জিজ্ঞেস করতে পারিস—পার্থদাকে ও জে.ইউয়ের গেটে দেখতে পেয়েছিল কি না, রবীন্দ্রসদনে কেন তিলককে চিনতে পারেনি। নিজেকে শান্ত রাখ দোলা। বাচ্চাটার ক্ষতি হবে নইলে। কোনও উন্মাদনার দোহাই দিয়েই বাচ্চাটার ক্ষতি করবার অধিকার তোর নেই।

মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল দোলা। অপরিমিত যৌন আকর্ষণ, সন্দেহ, নিরাপত্তাবোধের এই তছনছ হয়ে যাওয়া কীভাবে ভেতরের সেই ছোট্ট হতে থাকা মানুষটিকে প্রভাবিত করছে তাতে এখন তার বিন্দুমাত্র এসে যায় না। অন্তত এখনও না। হুঁশই নেই তার।

শেষে সে বলল—অমৃতা, ঈশ্বর, ঈশ্বরই তো এই আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এ তো একটা ফাঁদ দেখছি। প্রকৃতি চায় যেন তেন প্রকারেণ জন্ম হোক। আমাদের জন্য কোনও ভাবনা তো করে না! তা হলে হোক জন্ম—এই সন্দেহে, সংকটে, হোক, এভাবেই, যদি হয়।

চৌরঙ্গির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমৃতা ভাবছিল—কী আশ্চর্য! বুঝতে পারছে লোকটা সৎ নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নয়, তবু দোলা ছুটে যাচ্ছে? এ কী রকম ভালবাসা? একেই কি ভালবাসা বলে? প্রাকৃতিক, জৈবিক, রাসায়নিক! সংকট দেখে, ত্রিভুজ দেখে আয়েষা নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল, লাবণ্য নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল, অচলা পারেনি, যতই তাকে পরিস্থিতির শিকার করে এঁকে থাকুন না লেখক, সে পারেনি। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, টাকা নেয় এরকম চরিত্রেরা কি নায়ক হয়? শরৎচন্দ্রের

সেই 'শুভা'র স্বামী এরকমটা করত বটে। গোবিন্দলাল এবং নগেন্দ্র এবং মহেন্দ্রও অবিশ্বাসী হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ মিথ্যাবাদী, চোর বা ইতর ছিল না। অথচ জীবনের নায়কদের দেখো। এরা খল, প্রেমহীন, বিবেক ও মর্যাদাবোধশূন্য, সে অমিতাভ সেনই হোক আর অরিসূদন গোস্বামীই হোক।

লাল আলো জ্বলেছে। সে জেব্রা দিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। এখনও চিন্তামগ্ন।

—এত কী ভাবছেন? জওহরলাল নেহরু রোডে ভাবসমাধি? সর্বনাশ! চমকে সে ফিরে দেখে—অরিন্দম ঘোষ। তার ভঙ্গিতে খানিকটা গতিবেগ তখনও বোঝা যাচ্ছে।

লাল বাতিতে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। সারি সারি সারি। নিজের গাড়ি ছেড়ে ঝুঁকি নিয়ে নেমে এসেছে অরিন্দম।

—শিগগির আসুন, শিগগির...

এত তাড়া যে প্রতিবাদ করবার সুযোগই পেল না সে। অরিন্দমের পেছনে পেছন তার মারুতি এইট হানড্রেডের সামনের সিটে গিয়ে বসল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলেন? আপনাকে এখানে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেছি।

—পার্ক স্ট্রিটে এসেছিলাম, দোলার সঙ্গে।

—বাঃ খুব আড্ডা মারছিলেন? তা দোলা কই?

—ও তো সাউথে। চলে গেছে। আমি এখন সল্টলেক। তা আপনিই বা এমন উত্তরমুখো কেন? এই ঠিক দুপ্‌পুরবেলায়?

—বাঃ আমার শ্বশুরালয় যে গোয়াবাগানে। ভুলে গেলেন?

—দুপ্‌পুরবেলা...ছুটির দিন নয়...শ্বশুরবাড়িতে কেন যাচ্ছেন? ঢেলা মারতে?

—ঢেলাই বটে। আজ শনিবার ম্যাডাম, খেয়াল আছে? শনিবারগুলো আমাদের ছুটি থাকে। প্রজেক্টের কাজ পেন্ডিং থেকে গেলে অবশ্য যেতেই হয়। এ তো আর সরকারের খাস খিদমতের চাকরি নয়। তবে এ সপ্তাহে ফর্চুনেটলি আমার তেমন কিছু নেই। ছোট গিন্নি মানে আমার বউ বাপের বাড়িতে আছেন। রাত্তিরে খুব খ্যাঁট হবে। তারপর তাঁকে ট্যাকে নিয়ে বাড়ি ফিরব।

সুখী-সুখী, নতুন বিয়ে হওয়া, ফুরফুরে রসিক মেজাজের জামাই বেশ।

সে বলল—বউ তো বুঝলাম। ছোট গিন্নি কেন? আপনার কি দুই বিয়ে?

—ওহো! অরিন্দম হেসে উঠল—বাড়িতে আমার মাতৃদেবীই বড় গিন্নি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, লাবণির কাজে কাজেই ছোটগিন্নি হতে হয়। তা, দুই গিন্নিতে দিব্যি জমে গেছে দেখছি। এখনও পর্যন্ত। নারদ ঠাকুরকে ডাকতে হয়নি।

অমৃতা হেসে ফেলল।

—খুব আদর আপনার সব বাড়িতে? না? মায়ের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি?

—অর্জন করতে হয়! গর্বের ভাব অরিন্দমের গলায়। এমনি এমনি হয় না। কত তেল যে মারি! কী বাবা-মা, কী শ্বশুর-শাশুড়ি-শালাকে—তা যদি জানতেন?

—আর লাবণিকে?

—লাবণি! ওরে বাবা। তাকে তো তেলের ওপরই রেখেছি। ভাসিয়ে। তেল কইয়ের মতো। তা আপনার খবর বলুন? আপনার দেবশিশু কেমন আছে?

—ভাল। কিন্তু দেবশিশুর খবরে আপনার কাজ কী?

অরিন্দম সামান্য চমকাল। একটু মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। চিত্তরঞ্জন-হ্যারিসন রোডের বাঁকটা পেরিয়ে বলল—একথা কেন বললেন?

কেন যে বলল কথাটা অমৃতা জানে না। একটা সময় এসেছিল, যখন দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে সে বহুজনের সাহায্য ও মনোযোগ পেয়েছে। সেটা তো চিরকাল চলতে পারে না! অথচ কেমন একটা অভিমানের সুর তার কথাগুলোয়। এ অভিমান কার প্রতি? সে এমন অভিমান করতে চায়নি তো!

—এখনও যদি আপনাদের খবর নিতে যাই, আপনি বা অন্য কেউ হয়তো ভুল বুঝবেন, খুশি হবেন না। অরিন্দম আস্তে আস্তে বলল।

—সে আবার কী! আমি কেন অখুশি হব!

অরিন্দম হেসে বলল—অখুশি হয়তো হবেন না। কিন্তু খুব খুশি হয়ে উঠবেন, এমন মানুষ কি আমি? হয়তো ভুলেই যাবেন আমি এসেছি, বসে আছি...

এ-ও তো অভিমান!

অমৃতা বলল—এরকম করেছি বুঝি কখনও?

অরিন্দম আবারও হাসল, বলল—কী জানেন? সবাই তো নায়ক হবার ভাগ্য নিয়ে ভবরঙ্গমঞ্চে আসে না। সামান্য সহ-নায়ক, পার্শ্ব-চরিত্র বেশির ভাগই। দূতিয়ালির বেশি কিছু বরাতে জোটে না।

—অরিন্দমদা, জানি না নিজের অজান্তে আপনাকে কোনও... আপনার কাছে কোনও দোষ করে ফেলেছি কিনা, আপনি যা উপকার করেছেন, সে ঋণ আমি সারাজীবনেও...আপনি ভাববেন না সে সব আমি ভুলে যাব।

—আরে, আরে, অরিন্দম শশব্যস্ত হয়ে বলে—এসব কী বলছেন? দোষ-টোষ, কৃতজ্ঞতা, ঋণ-টিন! ছি! ছি!

অমৃতা এভাবে কখনও দাদা ডাকেনি অরিন্দমকে। না, লালটুদাও না, ঘোষদা তো নয়ই। হয়তো এই-ই ভাল। এই দাদা ডাক। এই কৃতজ্ঞতা, এই ঋণ স্বীকার!

অমৃতাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিল সে। নিজে কিছুতেই নামল না। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে সে, শ্বশুরবাড়ি বলে কথা!

—আপনি এলে, আপনারা এলে, আমি, আমরা ভীষণ খুশি হব—অমৃতা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল।

অরিন্দম ভাবল—এ-ও হয় তো ভাল। 'আপনি' থেকে চকিতে 'আপনারা'য় যাওয়া, 'আমি' থেকে এই 'আমরা'। এই খুশি হওয়ার প্রতিশ্রুতি। এই সুস্বাগতম জানানো। অভ্যাগতকে।

আর অমৃতা তার বাড়ির ঘন্টিতে হাত রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে 'জীবনে'র নায়কদের ব্যর্থতার কথা ভাবছিল না? এই অরিন্দম সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, ক্ষমতাবান, উদার, মার্জিত, দায়িত্বশীল—এ-ই তো জগৎ সিংহ? নাকি মানিকলাল? না কি বেহারি? শ্রী-বিলাস? কেন এমন নির্ভুল মানুষ নায়ক হতে পারে না? কিংবা হয়তো পারে। সে-ই জানে না।

২৫

–খুকি, শম্পা ডাকছে। টুটুলকে কোল থেকে নামিয়ে সে ফোন ধরল।

–শম্পা, বল? অনেক দিন তোর কোনও খবর পাই না।

–আমিও তো তোর...তুই আমাকে ভুলেই গেছিস।

–কে যে কাকে ভুলে গেছে সে কথা এখন মুলতুবি থাক। কেমন আছিস?

–ওই একরকম। অমৃতা, একদিন আমাকে একটু সময় দিতে পারবি?

–বেশ তো! চলে আয় না। সারাদিন খাব-দাব, গল্প করব।

–না বাড়িতে না। একটু প্রাইভেট কথা আছে।

–তবে কোথায়? তুই-ই বল।

–ধর, ধর ওয়লডর্ফ? আমি তোকে খাওয়াব কিন্তু।

–টুটুলকে ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।

–ঠিক আছে। ধর ঘণ্টাতিনেক। তোকে পৌঁছে দেব।

ওয়লডর্ফের ড্র্যাগনের তলায় বহুদিন পর শম্পা অমৃতা। এখন দুজনেরই শাড়ি, দুজনেরই এক বিনুনি।

প্রাথমিক দু চারটে কথাবার্তার পর শম্পা বলল—তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইব?

অমৃতা হেসে ফেলল, বলল—এখনও? দোলার কথাই মনে পড়ল তার। গম্ভীর হয়ে বলল—তোর তো এখন পরামর্শ দেবার লোকই হয়েছে।

শম্পা হাসল না। বলল—সমস্যাটা তো তাকে নিয়েই।

—সে আবার কী? অমৃতার বুক টিপটিপ করছে।

—জানিস, কিছুতেই আমার মাকে মেনে নেবে না। আমি দ্যাখ, নতুন সংসার করছি, ও-ও তো তাই। মা কিছু সাজেশান দিলেই গম্ভীর হয়ে যাবে, বলবে—বড্ড ইনটারফিয়ার করেন তোমার মা।

মা বেচারি ভাল মনেই আমাদের হেলপ্ করতে আসে। ও বলে—আমরা সাবালক হয়ে গেছি দুজনেই। আমাদের সমস্যা আমরাই সামলাব।

মা একদিন বলেছিল—তোমাদের থেকে অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছি, এটা তো অন্তত মানো? হয়তো তোমাদের মতো শিক্ষা নেই, বুদ্ধিও নেই, কিন্তু কত দেখলাম, শুনলাম, এ সবের থেকে একটা সমাধান করবার ক্ষমতা আপনা থেকে এসে যায়।

—ও বলল, আপনাদের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। দুটো আলাদা জেনারেশনের। প্লিজ মা, ডোন্ট ইন্টারফিয়ার...

মা সেদিন অপমানিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে।

অমৃতা বলল—তোর হাজব্যান্ড কিন্তু কথাগুলো মোটামুটি ঠিকই বলেছেন। যদিও বড্ড রূঢ়। অন্তত তেমনই শোনাল।

—সেটাই। আর মায়ের ইন্টারফিয়ারেন্স-এর নমুনা শুনবি? একদিন আমি অফিস থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরায়, আর লোক না আসায়, মা রান্না করে দিয়েছিল। ওর জন্মদিনে পায়েস-টায়েস গুচ্ছের রেঁধে এনেছিল, তো আমার মাইগ্রেন আছে, সে সময়টা ঘর অন্ধকার করে মাথায় বাম লাগিয়ে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলেছিল। এর কোনটা ইন্টারফিয়ারেন্স বল তো? মা অভিমান করে আর আমাদের বাড়ি আসে না। অথচ আমাকে না-দেখে মা'র থাকা বা আমার মাকে না দেখে থাকা, একেবারে অসম্ভব। আমার বুক ফেটে যায়।

ওয়েটার ওদের জন্যে চিকেন উইথ ডাম্পলিংস নিয়ে এসেছিল।

অমৃতা ন্যাপকিন বিছোতে বিছোতে বলল—খাই?

—নিশ্চয়ই।

—তুই হাত গুটিয়ে রয়েছিস কেন? এই নে আমি দিলাম, খা।

—বলবি তো কিছু?

—ইট ইজ সো অব্‌ভিয়াস।

—কী অব্‌ভিয়াস?

—তুই মায়ের মতো আর কাউকে ভালবাসিস না, এটা তো ঠিক শম্পা?

শম্পা একটু ভাবল, বলল—মায়ের প্রতি টানটা এক জাতের, সৌমিত্রর ওপর টানটা অন্য জাতের। তুই তো জানিস মা আমার কী? একাধারে মা, বাবা, বন্ধু, সব।

—খালি স্বামীটা না।

—ধ্যার।

—শম্পা তুই তোর মায়া-মমতা, তোর গভীর ভাবনা-চিন্তার, আদরের সবটা দিস মাসিকে। মাসিও তোকে তাই দেন, তাতে তুই ভীষণ রকম পরিতৃপ্ত হোস। হোস না?

—ইয়েস, অফ কোর্স।

—আর সৌমিত্রকে তুই দিস কেজো কথা, ছেঁদো গল্প, আর...আর...রাতটা।

—অমৃতা! ছিঃ।

—ছিঃ কেন? তুই তো পরামর্শ চেয়েছিলি। আমি জানি, আমি বুঝি রে শম্পা। ওই...ওই বাজে লোকটাও আমাকে ঠিক এই দিয়েছিল। আমি মানিয়ে নিয়েছিলাম। তোর সৌমিত্র মানতে পারছে না।

—তুই আমাকে অরিসূদনের মতো স্কাউন্ড্রেলের সঙ্গে তুলনা করলি?

—শোন, তুই স্কাউন্ড্রেল নোস, তোর কোনও মতলব নেই, তুই নিষ্ঠুর নোস। কিন্তু শম্পা বিশ্বাস কর, দেওয়া দেওয়ির এই ব্যাপারটা একই। এখন তোর সৌমিত্র ইজ গেটিং জেলাস অফ ইয়োর মাদার, জেলাস অফ হার হোল্ড অন য়ু।

কিছুক্ষণ চুপ করে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে রইল শম্পা। শূন্য চোখে। শেষে জলভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে কি আমাকে বেছে নিতে হবে একজনকে? অমৃতা!

—দূর পাগলি!

—তা হলে?

—তোকে আরও অনেক কঠিন কিন্তু অনেক সহজ একটা কাজ করতে হবে।

—কী সেটা? কঠিন আবার সহজ?

—তোকে অভিনয় করতে হবে, দ্বিচারিতা করতে হবে রে শম্পা। মায়ের কাছে বলবি সৌমিত্র মায়ের সম্পর্কে কত ভাল-ভাল কথা বলে, সারাজীবন অনেকে করেছেন তো! তাই ও মনে করে মায়ের আর তোদের জন্য দুর্ভাবনা, তোদের সেবা এসব করার দরকার নেই। সে মাকে মুক্তি দিতে চায়। ও খুব স্ট্রেইট-কাট। সোজা সরল হিসেব ওর। মায়ের যে করতে ভাল লাগে এ সেন্টিমেন্ট বোঝবার মতো মনই ওর নয়। কোনও দিন ফ্যামিলিতে থাকেনি তো!

—আর সৌমিত্র?

—সৌমিত্রকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবি। কী রান্না হবে থেকে, কী পরবি, কার সঙ্গে মিশবি, কে ভাল, কে মন্দ, আর...আর...নিজেকে অনেক অনেক বেশি করে দিবি!

—এত সব কথা তুই কী করে জানলি, অমৃতা? মোটে তিন বছর তো...

—শম্পা ওই তিন বছর আমাকে তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে। বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, মানব-চরিত্রের অনে-ক খুঁটিনাটি। জানিস, তবু, সমস্ত সয়ে, অত খেটে, ওদের সংসারটাকে মাথায় করে রাখবার পরও কেন আমায় প্রকারান্তরে খুন করতে চেয়েছিল—এটা আমি এখনও বুঝি না। ধর, আরেকটা বিয়ে করত, ডাউরি পেত—শুধু সেইটুকু? সেইটুকু? বাইরে থেকে শ্বশুর-শাশুড়িকে আনকালচার্ড, পজেসিভ টাইপ মনে হত, আর ওই লোকটাকে খুব প্র্যাক্টিক্যাল আনসেন্টিমেন্টাল টাইপ লাগত, কিন্তু ওর যে তিন-তিনটে বছরেও আমার ওপর এতটুকু মমতা জন্মায়নি, ও যে একটা শয়তান-স্বভাবের মানুষ এ আমি বুঝতে পারিনি। কাজেই শম্পা মনে করিস না মার বোঝাটা, আমার পরামর্শটাই চূড়ান্ত। আমি আমার বোঝাটুকু বললাম। এরপর তুই নিজে ভাব, নিজে লক্ষ কর, কার কোন ব্যবহারে অন্য জনের কী প্রতিক্রিয়া হয়। তার থেকে তুই তোর আচরণের ক্লু পেয়ে যাবি।

—তার মানে, সরল মনে আর বাঁচতে পারব না? শম্পার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—শম্পা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, সরল মনে আমরা কোনওদিন বেঁচে ছিলাম না। জটিলতাটা তখন আসত ভেতর থেকে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, এখন জেনেবুঝে জটিল হতে হবে, কপট হতে হবে—এই।

শম্পার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

অমৃতা বলল—কাঁদছিস কেন? তুই এভাবে ভাব না—লোকে অপরের ক্ষতি করবার জন্য কপটতা করে, তুই কপটতা করছিস নিজের এবং আরও দুটি প্রিয়জনের জন্যে। দুটো সম্পর্ককে বাঁচাবার জন্যে।

—জানিস, ও ওত জেলাস যে বাচ্চা চায় না।

—এই দ্যাখ, আমি তো তবে ঠিকই বুঝেছি।

—কিন্তু আমি যে চাই অমৃতা।

—কী বাহানা দেয় তোকে?

—বলবে, দুজনেই চাকরি করি, কী করে বাচ্চা মানুষ হবে? আমার অ্যাটেনশন তখন নাকি পুরোপুরি চলে যাবে বাচ্চার দিকে। নিজের কথা বলে না, বলে আমার কাজের কেরিয়ারের ক্ষতি হবে।

—তুই যতদূর পারিস অসাবধান হয়ে যা বুঝলি? বাচ্চাটা যখন সত্যি-সত্যিই এসে পড়বে, তখন দেখবি সৌমিত্র বদলে গেছে। ভালবাসার আরেকটা মানুষ পেয়ে বেঁচে গেছে। আর মাসিরও সম্ভবত তাই-ই হবে। আফটার অল সৌমিত্র তো অরিসূদন নয়!

তার অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অমৃতার।

শম্পা সন্তর্পণে বলল—তোর এখনও অরিসূদনের কথা মনে পড়ে? মানে...

দূর... অমৃতা বলল—আমার দুঃখ হয় ভেবে যে জীবনের তিন তিনটে বছর আমার বাজে খরচ হয়ে গেছে। অরিসূদনকে আমি মন থেকে কোনওদিনই ভালবাসিনি। এখন ওটাকে শরীর থেকেও মুছে ফেলেছি। শম্পা, আমার ওর সঙ্গে সহবাসেরও কোনও স্মৃতি নেই। সেটাই তো জানতে চাইছিস?

—সেটা কি সম্ভব? অ্যাট অল সম্ভব অমৃতা? একটা দাগ, একটা স্কার থেকে যায় না।

অমৃতা বলল—নেই। নেই। আমি এখন কুমারী। মনে মনে এত বেশি যে শরীরেও তাই হয়ে গেছি।

—তোর যে একটা ছেলে রয়েছে রে!

—তাতে কী! ও তো আমার, আমার মায়ের। ও সীমান্ত। সত্যি বলছি শম্পা, আমার কুমারী অনুভব হয়। সেই মহাভারতে পড়েছি না সূর্যর ঔরসে কুন্তীর কোলে কর্ণ এলেন। তারপর তিনি আবার আগের মতো, অক্ষতযোনি কুমারী হয়ে গেলেন! সেই রকম!

—তুই আবার বিয়ে কর অমৃতা!

উত্তরে অমৃতা হাসল, বলল—ন্যাড়া বেলতলায় এর মধ্যেই? তা ছাড়া বিয়ে কি হাতের মোয়া? সবৎসা গাভীর যে দাম, সবৎসা মেয়ের কি সেই দাম?

অমৃতা-শম্পা এবার দুজনে দুদিকে যাবে। শম্পা যাবে দক্ষিণে—মেঘনাদ সাহা সরণি, অমৃতা যাবে পুবে, সল্টলেক, করুণাময়ী।

সল্টলেকে মা-বাবার কাছেই এখন থাকে অমৃতা। ছেলে সাড়ে পাঁচ মাসের মতো হয়েছে। মা-বাবার কাছে থাকাটাই তার স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিকটা কিছুতেই ঘটছিল না। তার গাফিলতিতে, মাসির আন্তরিক অনিচ্ছায়। সে প্রায়ই বলত—মাসি, আর কেন? এবার আমাকে যেতে দাও।' মাসির চোখ ভারী হয়ে আসত—'আমাকে' বলিসনি, বল 'আমাদের'। তোকে আটকে রাখি এমন কী অধিকার আমার আছে?

—অমন কথা বোলো না মাসি, মা না হয়েও তুমি আমার মা-ই।

—বলছিস?

—বলছি। আরও বলছি, খুব কষ্ট হচ্ছে তবু বলছি, তুমি আমার মায়েরও বাড়া, বাবারও বাড়া। প্রোটেকশন, সন্তানের যে প্রোটেকশন দরকার হয়, তা আমার মা বাবা কোনওদিন আমাকে দিতে পারেনি। বেচারি। এ কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না মাসি, কিন্তু আমার মনে হয় ওঁরাই যেন

আমার কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে এসেছেন বরাবর। সত্যিকার প্রোটেকশন—বাচ্চাকে বুক দিয়ে আগলানো, এ আমি পেলাম তোমার কাছে। এটা কী জিনিস জানতামই না।

শিবানী বললেন—তাহলেই বোঝ তুই চলে গেলে, টুটুল চলে গেলে আমার কেমন দিন কাটবে।

এই কথার উত্তরস্বরূপই যেন সম্পদ এল। অমৃতার দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে, তার সন্তান জন্মানো, পরীক্ষা—সব কিছুই তাকে জানাতেন শিবানী। আর কে-ই বা আছে তাঁর, জানাবার? সম্পদ আসবার সুযোগ পায়নি, বিশেষ করে অমৃতা রয়েছে বলেই সে যেন আরও নিশ্চিত হয়ে ছিল। তার প্রণয়পর্ব কতটা এগোল, এসব নিয়েও সে অমৃতাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত পরামর্শ চেয়ে। যেন তাদের লিঙ্গ আলাদা হলেও এক।

"তোরা মেয়েরা কি যাকে ভালবাসিস তাকে ঠোনা মারিস?

তটিনী আমাকে যখন-তখন ঠোনা মারে, ঠাট্টা-তামাশা করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এটা ন্যাচারাল না কি রে?"

কিংবা,

"কী ধরনের উপহার তোরা পছন্দ করিস রে? ফুল না আইসক্রিম?

শাড়ি-ফাড়ি দেওয়া আমার আসবে না। আমার দ্বারা অতটা গেরস্ত হওয়া সম্ভব না।"

জানুয়ারি নাগাদ সম্পদ ক্যাম্পাস-ইন্টারভিউতে চাকরি পেয়ে গেল। তার মা এম.টেক. করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও সে কান দিল না একদম।

চাকরি বম্বেতে। কিছুদিন কলকাতায় থেকে বম্বে চলে যাবে। সম্পদ একা এল না। তটিনীও এল। ওয়াই.ডাবলু.সি.এ-তে উঠল, তবে বেশিরভাগ সময়টাই কাটাত ডোভার লেনে। সম্পদের সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে, সম্পদের সঙ্গে বাইরে খেতে যাচ্ছে, সম্পদের সঙ্গে কোনও বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে। এক-আধবার অমৃতাকেও সম্পদ অনুরোধ করেছিল। শিবানীকেও, বিশেষ করে বাইরে খেতে যাবার সময়ে। দুজনেই এড়িয়ে গেছেন। শিবানী বাড়িতে রান্না করে খাইয়েছেনও মেয়েটিকে। খুব ভদ্র, কিন্তু একটু যেন দূরে দূরে থাকতেই ভালবাসে তটিনী। অমৃতা যে তার সমবয়সী আরেকটি মেয়ে আছে বাড়িতে, তার সঙ্গে বন্ধুতা হওয়াটাই স্বাভাবিক, এটা তটিনীকে দেখলে মনে হয় না। যখন সকলে একসঙ্গে বসে, তটিনী শুধু সম্পদের সঙ্গেই কথা বলে, অমৃতাকে যেটুকু গুরুত্ব দেবার সেটুকু দেয় সম্পদ।

—আরে, অমৃতা, সেদিনের খুকি তুই, তোর আবার একটা টুটুল। ভাবতেও পারছি না!

—তোর কি মনে হয় অমৃতা, তটিনী যদি অন্য জায়গায় চাকরি পায়, তাহলে কেরিয়ারে স্যাক্রিফাইসটা কে করবে? আমি না ও?

তটিনী বলে—উই'ল ক্রস দা ব্রিজ হোয়েন উই কাম টু ইট।

একদিন অমৃতা টুটুলকে সবে ঘুম পাড়িয়েছে, ঘড়িতে আন্দাজ রাত দশটা, তার ঘরে ভারী পর্দা টানা। সে শুনতে পেল তটিনী নিচু গলায় জিজ্ঞেস করছে—বাট হু ইজ দিস অমৃতা? —ও হয়তো মনে করেছে অমৃতা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত দশটা বেজে গেছে তো।

সম্পদ বলল—ইটস আ লং হিস্ট্রি তটিনী, বাট শী ইজ লাইক মাই সিস্টার।

তটিনী বলল—লাইক, বাট নট রিয়্যালি, আই থিংক আই ক্যান স্মেল কাফ-লাভ।

সম্পদ খুব হালকা হেসে বলল—দা কোয়েশ্চেন ডাজন'ট অ্যারাইজ। এনি ওয়ে হোয়াট ডাজ কাফ-লাভ মীন হোয়েন য়ু হ্যাভ রিয়্যাল, গ্রোন-আপ লাভ?

তটিনী বলতে বলতে গেল—ওয়ান নেভার নোজ। ইয়োর মাদার সিমস টু হ্যাভ আ ফিক্সেশন অন হার। আই ডোন্ট ফীল কম্‌ফ...

বাকিটা আর শুনতে পেল না সে।

সে ঠিক করল, আর না, কিছুতেই না, আরও অপ্রিয়-কিছু ঘটবার আগে তাকে সল্টলেকে চলে যেতে হবেই।

শিবানী বললেন—এই সময়টাই যে তোকে আমার দরকার ছিল। বিয়ের বাজার-টাজার করতে হবে।

—আমার কথা যদি শোনো মাসি, বাজারটা তটিনীর পছন্দমতো করো। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমি তো আছিই। আসা-যাওয়া করব। কী আছে?

সম্পদের বিয়ে হল হায়দ্রাবাদে, রিসেপশন হল কলকাতায়, হনিমুন কেরালায় এবং বসবাস বম্বে। তটিনীও একই ফার্মে কাজ পেয়ে গেল। কয়েকদিনের উৎসব, হইচই, লোকজনের ভিড় থিতিয়ে গেলে শিবানী যে একা সেই একা।

অমৃতা আসে, থাকেও হয়তো একটা দিনরাত। কিন্তু সে এখন সল্টলেকেরই বাসিন্দা। শিবানী মনে মনে জানেন, অমৃতা ঠিকই করেছে, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পান না।

ওয়ালডর্ফের গেট দিয়ে বেরোচ্ছে অমৃতা আর শম্পা, ঢুকছেন ডক্টর কার্লেকর। সঙ্গে একজন মহিলা।

আরে! অমৃতা যে! রম্ভা এই মেয়েটি আমার পেশেন্ট। আর তুমি তো বুঝতেই পারছ ইনি আমার ধর্মপত্নী।

অমৃতা শম্পার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ডক্টর কার্লেকরের। পরে বেরিয়ে বলল—কী করে সৌমিত্রকে ফাঁকি দিয়ে একটা বাচ্চা বানিয়ে নিবি, সে বিষয়ে ডক্টর কার্লেকরের পরামর্শ নিতে পারিস।

শম্পা বলল—ধ্যাঃ, তোর মুখে আজকাল কিচ্ছু আটকায় না।

রঞ্জন কার্লেকরের রগের কাছটা শাদা হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু খুবই ফিট ভদ্রলোক। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের বেশি বয়স হবে কী? চলাফেরা করেন একেবারে যুবকের মতো।

শম্পা বলল—এই ডাক্তারই তোর জন্যে এত করলেন। কী ভাল না?

হ্যাঁ খুব—অন্যমনস্কভাবে বলল অমৃতা। সে আসলে মনে মনে দেখছিল ভাবছিল রম্ভাকে। ভদ্রমহিলা লম্বায় কার্লেকরের কাছ পর্যন্ত চলে যান। ম্যাজেস্টিক, যেন কুঁদে তৈরি করেছে কেউ গ্র্যানাইট থেকে। মাথার চুলগুলো কোঁকড়া, গাঢ়, হেনারঙ, খুব একটা কায়দাদুরস্ত ছাঁট, ঘাড় ঢেকে ছোট্ট ছোট্ট থলোতে নেমেছে, চকচকে শ্যাম গাত্রবর্ণের সঙ্গে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন বিষাদপ্রতিমা, অথচ রানির মতো। কোথায় যেন এমন রানির কথা পড়েছে, ক্লিওপেট্রা? কুইন ক্রিস্টিনা? জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পরের নূরজাহান? সে ঠিক মনে করতে পারছে না।

আজকাল সে সল্টলেকে থাকে বলে ডক্টর কার্লেকরের গাড়িটা প্রায়ই দেখতে পায়। উনি তাদের বাড়ির রাস্তায় ঢুকে বাঁদিকে চলে গেলেন, কিংবা ডানদিকের গলিতে। হয়তো তাদের বাড়িই আসছেন মনে করে সে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। নাঃ, উনি চলে যাচ্ছেন। তবে টুটুলকে দেখতে উনি প্রায়ই আসেন। কিন্তু ওঁর মিসেসকে কখনও দেখা হয়নি তার। যেন ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর সবসময়েই একজন ডাক্তার। একজন দেবদূত। তাঁর অন্য কোনও পরিচয় নেই। বা থাকলেও অবান্তর। আজ মিসেস রম্ভা কার্লেকরকে দেখে সে যেন হঠাৎ বুঝতে পারল ডক্টর কার্লেকরের একটা অন্য জীবন, অন্য পরিচয় আছে। খুব শক্তিশালী সেই অন্য জীবনের প্রভাব তাঁর ওপরে। রম্ভা যেন চুম্বক-টানে অমৃতার সমস্ত মনোযোগ টেনে নিচ্ছেন। এমন ঋজু অথচ অমন বিষণ্ণ কেন? শক্তি যেন ওঁর সমস্ত আকৃতিতে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে? তবে? ওই ডাক্তারের মতো সফল, সুপুরুষ রসিক স্বামী যাঁর...? সে সিসটার মাধুরীর কাছে শুনেছে ওঁদের দুই ছেলেমেয়েই বাইরে পড়ে। সেইজন্য কী? আশ্চর্য লোক তো এঁরা! টাকা রোজগার করে মানুষ কী জন্য? সুখে, শান্তিতে, সপরিবারে থাকবে বলে তো? তা সেই পরিবারের

সবচেয়ে চমৎকার সদস্যদের বাইরে রাখতে হলে আর পরিবারেই বা কাজ কী! অত রোজগারই বা কেন? তবে, ধনী লোকেদের আদত এরকমটাই! তার টুটুলকে ছয় কি সাত বছর বয়স হলে সে কি বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিতে পারবে? অথচ তাকে তো চাকরি করতে হবেই। হয়তো সর্বক্ষণ টুটুলকে সঙ্গ দেওয়া যাবে না। তাতে কী? তার সমাধান তাকে তার মায়ের সঙ্গ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করা? হস্টেলে রেখে মানুষ করলেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত, চমৎকার চরিত্রের জোর এ সব লাভ হয়, ফলে সফল হওয়ার স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। মানল। কিন্তু তাহলে একজন মানুষীর গর্ভে একজন মানুষের ঔরসে কেন সন্তান আসে! কেন আসে অত প্রাণ গলা স্নেহ-মমতা? না, ডক্টর কার্লেকর এটা ঠিক করেননি। অত হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী, মানুষ হিসেবে অত চমৎকার ডাক্তারের স্ত্রী নইলে অমন অসুখী হবেন কেন? সে শুনেছে ডক্টর রম্ভা কার্লেকর ডাক্তারি করেন না, তবে ওঁর অনেক অন্য কাজকর্ম আছে, হেল্‌থ ক্লাব-টাব। এগুলো কি দু দুটো টুটুলের চেয়েও জরুরি?

২৬

সেইদিনই বাড়ি ফিরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখবরটা পেল অমৃতা। তার, তিলকের দুজনেরই ফার্স্ট ক্লাস এসেছে। শর্মিষ্ঠা বেচারি চার নম্বরের জন্য পায়নি। লাবণি মোটামুটি, দোলা কোনওমতে। চঞ্চল, নিশানেরও খুবই ভাল হয়েছে। ইংরেজিতে নিশান শতকরা ছাপান্নরও বেশি পেয়েছে, রীতিমতো ভালই বলতে হবে। এই ফলাফল সে আর তিলক আশা তো করছিলই। তবু, যতক্ষণ না হচ্ছে একটা কিন্তু থেকে যায়ই। তিলকই তাকে ফোন করে জানিয়েছিল খবরটা। সে সর্বপ্রথম জানাল শিবানী মাসিকে।

মাসি বললেন—কম খেটেছিলি? তার দাম পেয়েছিস। তারপর করল জয়িতাদিকে। উনি বললেন—খুব, খুব ভাল লিখেছ অমৃতা।

—দিদি, আপনি তো জানেন কৃতিত্বটা কার!

—আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। কিন্তু আয়ত্ত করার কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই তোমার। একটা ভাল কলেজে লেকচারশিপ পাওয়ার আর কোনও বাধা তোমার রইল না। নেট-স্লেট-এ বসো। ইচ্ছে হলে আই.এ.এস.-ও দিতে পারো। কিন্তু তাতে বোধহয় টুটুলের অসুবিধে হবে।

তৃতীয় ফোনটা শম্পাকে।

শম্পার গলা ভিজে, বলল—কত যে আনন্দ হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না রে। অমৃতা, যত বাধাই আসুক, তুই অনে-ক অনে-ক দূর যাবি।

—একটা রেজাল্ট থেকেই এই কংক্লুশনে এসে গেলি?

—আমার কেন মনে হচ্ছে রে। তা ছাড়া, এটা আমার উইশ-ও বটে। যেন যাস। যেন অনেক উঁচুতে উঠিস অমৃতা!

তারপরের ফোনটা সে করল ডক্টর কার্লেকরকে। সকাল আটটা, এই সময়ে ওঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

—ডক্টর কার্লেকর আছেন?

—কে বলছেন?

রম্ভার গলা সে শোনেনি, কিন্তু শুনেই বুঝতে পারল। কণ্ঠস্বরেও যে এমন বিষাদের স্পর্শ থাকতে পারে, আগে কখনও বোঝেনি অমৃতা।

—আমার নাম অমৃতা চক্রবর্তী, আমি এম.এ.-তে খুব ভাল রেজাল্ট করেছি, তাই ওঁকে জানাচ্ছিলাম।

—আচ্ছা, আমি বলে দেব।

অমৃতা হঠাৎ বলে ফেলল—আপনাকেও, আপনাকেও জানাচ্ছি।

—কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

—আপনি ভাল আছেন দিদি? ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল অমৃতা।

ও পক্ষ চুপ। কিছুক্ষণ পর টেলিফোনটা রেখে দেবার শব্দ হল। উনি কি কিছু মনে করলেন? এত অন্তরঙ্গ সম্বোধন, অন্তরঙ্গ প্রশ্ন কি তার করা উচিত হয়নি! ওদের মহলে এ রকম কি কেউ করে না? একটা মাখামাখি করবার চেষ্টা সে করেছে এমনটাই কি মনে করলেন উনি? ছি! ছি! এমন ভুল তো সে কখনও করেনি! ওঁর ব্যক্তিত্ব এত উঁচু দরের এত জোরালো যে খানিকক্ষণের জন্য যেন তাকে অভিভূত, ছোট্ট ছেলেমানুষ করে দিয়েছিল। ছেলেমানুষ হবার সুযোগ যে কারও কাছেই পায়নি সে। না। মা, বাবার কাছেও না। এত দাম্ভিক উনি! স্নব। কেন যেন তার বোধিসত্তা বারবার বলতে লাগল না, না, দম্ভ নয়, এ দম্ভ নয়, আর কিছু।

পরদিন, তখন খুব সুন্দর শীত-শেষ প্রথম-বসন্তের অপূর্ব সকাল, আকাশে-বাতাসে কোথাও যেন কোনও মালিন্য নেই, সে বেরোচ্ছিল শিবানী মাসির কাছে যাবে বলে। সাফল্যের হর্ষ ছোঁয়া লাগিয়েছে তার দেহে মনে, সুদ্ধু একটু সামান্য ধূসরতা, রম্ভা কার্লেকরের রহস্যময় আচরণের কারণে, ডক্টর কার্লেকরের গাড়ি এসে থামল।

—কী? ফার্স্টক্লাস হয়েছে?

—ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট।

—ওহ্‌, ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। থ্যাংক গড। তিনি তোমাকে দেখছেন অমৃতা। গাড়ির বুট থেকে একটা মস্ত কিছু টেনে বার করলেন উনি। বললেন, টুটুল কোথায়?

—টুটুল মায়ের কাছে।

—দাঁত বেরোল?

—হুঁ, দুটো। ওল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে, পিছলে পিছলে সর্বত্র যাচ্ছে...

—ওর জন্যে একটা প্লে পেন এনেছি।

—প্লে-পেন?

—হ্যাঁ, ওটা ফোল্ডিং, ফাইবারের তৈরি, লাগবে টাগবে না, খুলে চার-চৌকো করে পেতে ওকে ভেতরে বসিয়ে দেবে, ভেতরে খেলনা রাখবে, টীদিং রিং রাখবে একটা, দেখবে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

—ও, পাশ করলাম আমি, আর উপহার এল টুটুলের।

—টুটুল আমার ছেলে না হয়েও ছেলেই, এটা বোধহয় তুমি বুঝতে পারো না, না?

—বুঝি বইকি। আপনিই তো ওকে বাঁচিয়েছেন। ...আমাকেও।

—না অমৃতা, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন ওকে, তোমাদের। কিন্তু তার জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন আমাকে। দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে...।

—আপনার কবিতাও মনে আছে!

কোনও উত্তর দিলেন না কার্লেকর। আহত দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে। তারপর বললেন—গিফ্‌ট তোমার জন্যেও আছে। নেবে?

অমৃতা কিছু বলবার আগেই পেছন ফিরলেন কার্লেকর, তারপর গাড়ির ভেতর থেকে এক বিশাল লাল গোলাপের তোড়া বার করে তুলে দিলেন অমৃতার হাতে। আর ঠিক সেই সময়েই ফাটল অ্যাসিড বাল্‌বটা।

বাঁদিকের শাড়ি তার কুঁকড়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে তার বাম অঙ্গ। অ্যাসিডের বিকট ঝাঁঝালো

গন্ধে, যন্ত্রণায় সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, ডক্টর কার্লেকর বিদ্যুৎগতিতে তাকে তুলে নিলেন গাড়িতে। শোফারকে বললন—পি.জি., ছোটাও কুইক।

দুঃসহ যন্ত্রণার একটা গাছ। তার ডালে ডালে আগুনের ফল। পাতাগুলো সেঁকো বিষের। শিকড় চারিয়ে গেছে বুঝি অনেক গভীরে যেখানে পৃথিবী স্বয়ং জ্বলছে। মাটিতে আগুন, আকাশে আগুন, বাতাসে ড্রাগনের নিশ্বাস। আগুনের শিখাগুলো ছোট ছোট ছেলেদের মতো দাপাদাপি করছে।

তিনদিন তিনরাত। জ্ঞান ফিরলে যে শুধু কোনওমতে বলল—'টুটুল।'

—টুটুল তোমার মাসির কাছে। ভেবো না অমৃতা। ও ঠিক আছে। —সামনে ডাক্তারের সর্বরোগহর সেই মুখ দেখে সে চোখ বুজল।

চাপা কান্নার শব্দ। মা বোধহয়, ঘোরের মধ্যে ভাবল সে। কান্নাই মায়ের একমাত্র সম্বল। মায়ের নামে সে ছেলের নাম দিয়েছে সীমান্ত। শম্পা, শম্পা, সৌমিত্র কি বুঝল? দোলা তুই ধৈর্য ধরিস? কী করছে তোর রোমিও? লাবণি তুই আমাকে এত ভালবাসতিস...জানতাম না, অরিন্দমদা উঃ মাফ করুন। কী যে আনন্দ তুই ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হয়েছিস, তিলক! এবার একটা ভাল চাকরি পাবি...কলেজ সার্ভিস কমিশন, জয়িতাদি আপনার নোটসগুলো এবার ফেরত নিন...কী ভাল, কী ভাল তোরা সবাই। উঃ, মা-আ-আ।

নেট, স্লেট পরীক্ষার বিজ্ঞাপন বেরোল। ফর্ম জমা দেবার তারিখ পেরিয়ে গেল, তিলক-শর্মিষ্ঠা-নিশান বসল। তখনও অমৃতার চিকিৎসা চলছে। ফলাফল বেরোল, তারপর ভাইভা। তিলক নিশানের চাকরি হয়ে গেল, শর্মিষ্ঠাকে নর্থ বেঙ্গলে দিয়েছিল বলে সে গেল না, তখনও অমৃতার চিকিৎসা চলছে। কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে, কেউ তার কাছে যেতে পারে না। অসম্ভব যত্নে, সেবায়, ওষুধে সতর্কতায় প্রথম পি.জি., তারপর উজ্জীবন', আবার পি.জি. অবশেষে ঘা শুকোল। বাঁ হাতের পোড়া অংশ প্লাস্টিক সার্জারি। হাসপাতাল থেকে অবশেষে যখন ছাড়া পেল, কার্লেকর বললেন—মিসেস দত্ত, আপনার কাছে না হলে তো ...

শিবানী বললেন—কী আশ্চর্য! সে তো বটেই...

—টুটুলকে নিয়ে পারবেন? না একজন সিসটার...

—রাখাই যায়, তবে টুটুলের তো প্লে-পেন আছে।

কথা শুনে এত কষ্টেও রোগিণী এবং তার ডাক্তার হাসলেন।

সীমা বললেন—টুটুলকে বরং আমি নিয়ে যাই।

—বাচ্চা ছেলের ধকল কখনও তুমি সামলাতে পারো?—বিশ্বজিৎ বললেন। অবসাদে চোখ বুজল অমৃতা।

সেই সময়ে সন্ধ্যার ভিজিটিং আওয়ারে ওরা সবাই দেখতে এসেছিল তাকে। শম্পা-সৌমিত্র, লাবণি-অরিন্দম, দোলা-অমিতাভ, তিলক, শর্মিষ্ঠা, নিলয়, চঞ্চল, নিশান সবাই। কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না। সব একেবারে চুপচাপ। রোগিণীই ক্ষীণ হাসল, ভাল ডান হাতটা একটু তুলল।

অনেক যন্ত্রণা দেখেছেন রঞ্জন। তাঁর পেশাটা তো যন্ত্রণা দেখারই! কত রকম ভঙ্গি দেখেছেন যন্ত্রণা সইবার। কিন্তু এত সাহস, এমন শান্ত সাহস একটি এই বয়সী মেয়ের—এ তিনি কখনও দেখেননি যেন। ও তো বলছে না একবারও—কেন এমন হল? কেন আমার কপালেই বারে বারে হয়! আমাকে মেরে ওদের কী লাভ? যতদিন ওদের কাছে ছিলাম, ওদের উপকারই তো করেছিলাম। তাহলে কেন? কিন্তু ও কিচ্ছু বলছে না। ফরিয়াদ বুঝি ফুরিয়ে গেছে আজ ওর। ও ধরে নিয়েছে এটাই, এরকমটাই ওর হবে। ও শুধু লড়ে যাচ্ছে। অবশ্যই ডাক্তাররা আছেন, নার্সরা আছেন, শিবানী

মাসি আছেন! কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চাপা ভয়ঙ্কর লড়াইটা তো ওর একারই! অথচ জীবনের কোনও পর্বেই ও নিজের হাতে নির্বাচন তুলে নেয়নি। না বিবাহ, না সন্তানধারণ। এমনকি আইনি-লড়াই ও বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটেছে যেন কারণ ও ফলাফলের স্বাভাবিক যুক্তিতে। যে অত্যাচার, যে যন্ত্রণা ও ভোগ করল, করে চলেছে, তার কোনও দায়ভাগ ওর নেই। ও যদি আজ বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক এই সমাজকে প্রশ্ন করে—কেন? তো করতেই পারে। যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে চায় সব, ধ্বংস চায় তো চাইতেই পারে। তখন কারও কাছে কোনও উত্তর থাকবে না। সমাধান থাকবে না।

সেই কথাটাই আজ তিনি বলেছিলেন রম্ভাকে। বলছিলেন সেই কাচের জানলার সামনে বসে। সেখান থেকে খোলা আকাশ দেখা যায়, দেখা যায় গাছপালার এক সবুজ সমৃদ্ধ রূপ। প্রথমটা বলছিলেন বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গিতে, তারপর আবেগে আপ্লুত হয়ে—

বোঝ তো রম্ভা? শক! সুদ্ধু শকেই ওর মরে যাওয়ার কথা! কী প্রাণ যে মেয়েটাকে দিয়েছিলেন ঈশ্বর।

অনেক, অনেক দিন পর নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভব, বিস্ময়, শ্রদ্ধার কথা অকপটে রম্ভার কাছে পেশ করলেন তিনি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অমৃতা। দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়। কখন তিনি আসবেন। এ যদি ডোভার লেনের জানলা হয় তা হলেও আসবেন, যদি করুণাময়ীর জানলা হয় তা হলেও আসবেন। একটা ধূসর রঙের মারুতি একটিম। জানলার কাছে এসে গাড়ির স্মোক্‌ড গ্লাস একটু নামাবেন, ওপর দিকে তাকাবেন, ডান হাতটা ঈষৎ তুলে। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে, ডান হাতটা একটু তুলবে। আবার একটা পুরো দিনের প্রতীক্ষা। ইতিমধ্যে আছে মা-বাবা এবং শিবানী মাসি, শম্পার ফোন, দোলার আর্তি, সম্পদের চিঠি, লাবণি-অরিন্দমের এক আধ দিনের আসা-যাওয়া, আছে তিলক, আছেন জয়িতাদি আর আছে টলটল পায়ে টুটুল, সীমান্ত। আগে ছিল তার রক্তের মধ্যে একটা ওতপ্রোত কর্তব্যবোধ, দায়িত্বনিষ্ঠা। সন্তোষ ছিল না, সবটাই শুষ্ক, এমন নয়। কোনও কাজ সময়মতো, সুন্দর করে শেষ করতে পারলে মনটা খুশি হত। অদ্ভুত একটা স্বস্তিবাচন শুনতে পেত ভেতরে। কিন্তু এ অন্যরকম। এ বেদনা, এ যন্ত্রণা, এ আনন্দও, অসীম অপার রোমাঞ্চক। সারা দিনের মধ্যে 'উজ্জীবন' যাবার পথে তিনি একটিবার এই পথ দিয়ে ঘুরে যাবেন। ওপর দিকে তাকাবেন। বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু মনে হবে নির্নিমেষ, অনন্তকাল। তাঁর আত্মার গভীরে চোখ রাখবেন তিনি। এমন একটা কিছুর বিনিময় হবে যার অস্তিত্বের কথা সে-ও জানত না, তিনিও জানতেন না। এই প্রথম যেন সেটা আবিষ্কৃত হল পৃথিবীতে। অ্যান্টি-বায়োটিকের মতো, কোয়ার্কের মতো। রঞ্জন তো তাদের বাড়িতে আসেনই। আসেন টুটুলকে দেখতে, চোখের দেখা এবং ডাক্তারের দেখা, দেখেন তাকেও—'কী অমৃতা! কনুইয়ের কাছে সেই পেইনটা নেই তো আর? কী বললে? ডান কনুইয়ে? এঃ, ওটা তোমার কল্পনা।' বাম বুকের ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঝলসে আংরা হয়ে গিয়েছিল। অসীম কষ্টে ও ধৈর্যে হাত সুদ্ধ ওপর দিকটা প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে। দপদপে যন্ত্রণা এখনও ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু সেটা বাঁ দিক। ডান দিকের কোনও ব্যথাকে স্বীকার করতে দেবেন না তিনি।

—মিসেস দত্ত নার্সিংটা পড়ে নিতে পারতেন, সুদ্ধু কতকগুলো টেকনিক্যাল জিনিস...দেখি গভীর করে নিশ্বাস নাও—হ্যাঁ ঠিক আছে।

—কী বিশ্বজিৎবাবু আপনাকেও একটু দেখে দেব না কি? আমার তো মনে হয় মিসেসের চেয়ে আপনারই ব্লাড-প্রেশারটা বেশি যাচ্ছে আজকাল। —টুটুলকে কোলে তুলে তিনি হাসবেন।

দুই পরিবারেরই বন্ধু। প্রায় পারিবারিক চিকিৎসক। ছোটখাটো হাসি-ঠাট্টা, টুটুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আধা-সিরিয়াস জল্পনা, মাঝেমাঝেই ঘোষণা—'টুটুল কিন্তু আমারই, সে আপনারা মানুন, আর নাই মানুন।'

অমৃতাও স্বাভাবিক। চা কিংবা কফি এনে দিচ্ছে।—আজ টুটুলের দু বছর পূর্ণ হল, পায়েস, মানে পরমান্ন, খাবেন না কি?

—সুগার-ফুগার আবার হয়নি তো? কী? মিসেস দত্ত?

—আপনার সুগার হয়েছে কি না আমি কেমন করে জানব?

—আমার কী হয়েছে, না হয়েছে জানবার সুযোগ পাই না কি? এই এরা, অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল—'এরা' সে সুযোগ দেয়? একদিন ধড়াস করে পড়ব আর মরব। —বলেই চোখ গোল করে ফেলবেন—এ কী! 'ষাটষাট, এ আবার কী কথা, যেটের বাছা ষাট' এ সব কিছু বললেন না? নাঃ আধুনিককালের মাসি-পিসিরাও দয়ামায়ায় খাটো হয়ে পড়ছেন।

কিন্তু জানলার সামনে যখন গাড়িটার গতি ধীর হয়ে আসে। কাচ নামিয়ে উর্ধ্বমুখ হন যে রঞ্জন, তিনি অন্য রঞ্জন, যিনি কথা জানেন না, হাসি জানেন না, যাঁর শুধু চোখ ছাড়া আর অন্য ইন্দ্রিয় নেই। অমৃতাও স্থাণু হয়ে থাকে সেই দৃষ্টির সামনে। সে-ও তখন কথা হারা, দৃষ্টি, শুধু দৃষ্টি, আর কিছু না, কিচ্ছু না।

সেদিন গিয়েছিলেন 'উজ্জীবন' থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে অন্য একটি নার্সিংহোমে, আবার 'উজ্জীবন'। অপারেশন করতে হয়েছে ছোটয় বড়য় মিলিয়ে সাতটা। বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেছে। প্রায় এগারোটা। ভয়ানক ক্লান্ত তিনি আজ। না, এরকম শিডিউল চলবে না, চলবে না আর। চান করলেন, রম্ভা নামল না। একটা হুইস্কি নিলেন, রম্ভা নামল না।

—মেমসাব কোথায়?—তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মেমসাব' কথাটা তিনি পছন্দ করেন না আদৌ, কিন্তু তাঁর কেতাদুরস্ত বেয়ারারা করে। তাই তাঁকেও...। কত কাজই যে নিজের পছন্দের বিরুদ্ধে করতে হয় মানুষকে।

—কী জানি! জানি না তো! নামেননি।

আস্তে আস্তে ওপরে উঠলেন তিনি, অবসন্ন পা টেনে টেনে। কেন নীচে এল না রম্ভা যেমন আসে, কেন পানীয় নিয়ে বসল না, যেমন বসে? সবই তো দিয়েছেন তাকে। মেনে নিয়েছেন সন্তানসম্পর্কহীন, সদা-সতর্ক, প্রশ্ন আর সন্দেহের কূট স্পট-লাইটের তলাকার দিনরাত। এতেও কি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? এত দিনেও? ও কি জানে না ডাক্তারের জীবন? ডাক্তারের দায়? তবু এই অর্থহীন অবুঝ অভিমান? তাঁকে খুবই ক্লান্ত করে এসব আজ।

রম্ভা! রম্ভা! শোবার ঘরের ঠিক দোরগোড়ায় দুজনের দেখা হয়ে গেল। দ্রুত আসছে রম্ভা, উল্লাসের সুরে বলছে—রঞ্জন, রঞ্জন, আমার আবার হচ্ছে।

—কী হচ্ছে?

—বুঝতে পারছ না? আমি আবার যৌবন ফিরে পাচ্ছি, আবার কনসীভ করব, মা হব, রঞ্জন এই দ্যাখো...

রক্তরঞ্জিত একটা পেটিকোট রঞ্জনের দিকে জয়ের রক্তনিশানের মতো তুলে ধরেন রম্ভা।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎগতি আসে রঞ্জনের অবসন্ন দেহে। লুকোনো ভাঁড়ার থেকে সঞ্চিত শক্তি কৌটোর ঢাকনা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে।

—রম্ভা, রম্ভা কী বলছ? ঠিক? এ সত্যি?

স্বামীর কাঁধে মাথা পৌঁছয় রম্ভার। গলার স্বর থরথর করে কাঁপতে থাকে, ভীষণ যেন শীত শীত করছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

—ঠিক রঞ্জন, ঠিক। চার বছর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসেছে। —স্বামীর

কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন রম্ভা—আবার আমি তোমাকে সন্তান উপহার দিতে পারব। আবার পারব যা বলো সব, স-ব।

কী বলছে রম্ভা? একটা কোয়ালিফায়েড ডাক্তার সে এর মানে বোঝে না? পলিপ? ফাইব্রয়েড? হিস্টেরেকটমি? নাকি—ঈশ্বর, হে ঈশ্বর! তিনি ডাক্তার কিন্তু সব সময়ে তাঁর ঈশ্বরের কথা মনে হয়। সমস্তরকম বিপদে। সম্পদে।

—কবে? কবে থেকে এমন হচ্ছে?

—কতদিন, কতকাল তুমি কাছে আসো না, কত দিন বন্ধ করে দিয়েছ তোমার দ্বার সে আর আমার হিসেব নেই রঞ্জন। সাহস শুধু সাহসে বুক বেঁধে...

—রম্ভা, আমার সোনা, আমার মণি।—তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেন তাঁর প্রথম প্রণয়িনীকে। বোঝেন এই তাঁর প্রথম, এবং এই তাঁর শেষও। এবার ডায়াগনস্টিক ডি.সি, তারপর অপারেশন, অপারেব্‌ল না হলে রেডিয়েশন বা কেমো বা রেডিওপ্লাস কেমো, এখানে, না হলে যত দূর দূরান্তেই হোক, যদি থাকে, যদি কোথাও এতটুকু অস্ফুট আশাও থেকে থাকে!

সোমবার। সকাল সাড়ে নটা। শাদার ওপর গোলাপি ডুরে শাড়ি পরা অমৃতা। চান করে চুল মেলে দিয়েছে। এখন আর কিছু সামনে নেই। শুধু একটি জানলা। আধঘণ্টা পার হয়ে যায়, পঁয়তাল্লিশ মিনিট, ধূসর এসটিম আসে না।

টুটুল ডাকে—ম্ মা-আ।

—কী সোনা?

—আমায় কোলে।

সে দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। চুমো খায়।

টুটুল ফিরে চুমো খায় তাকে। কপালে, গালে মিষ্টি মিষ্টি শব্দ করে। নাকে নাক ঠেকিয়ে।

মঙ্গলবার। নটা। সে নীলের ওপর শাদা ফুটি-ফুটি একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। যদি আগে চলে যান! এরকম হয় না, তবু... যদি...আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট, পঞ্চাশ মিনিট...

—খুকি, আজ যে তোর ইন্টারভিউ, ভুলে গেছিস?

—যাই মা!

বুধবার। দশটা। হয় না, তবু কোনও কারণে হয়তো কদিন দেরি হচ্ছে। ঘিয়ে রঙের ওপর তুঁতের আলপনা দেওয়া একটা ছাপা শাড়ি পরেছে সে। কপালে টিপ দিতে ভুলে গেছে। চুল ভালো করে আঁচড়ায়নি।

—বারোটা বাজল।

—টুটুল খেয়েছে মাসি?

—খুব ভাল করে খেয়েছে। এবার তুই বোস।

বৃহস্পতিবার। যেমন তেমন একটা শাড়ি। পরতে হয়, তাই পরা, চুলে চিরুনি চলেনি। ভুলে গেছে। নটা বাজল, দশটা বাজল, এগারোটা বাজল। টুটুল আবদার করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে ঘুম পাড়াচ্ছে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে...খাজনা দেবো কিসে।

শুক্রবার। সে সল্টলেকের বাড়ির বাঁশের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। রোদ্দুর মাথায় করে। আজও না।

—'উজ্জীবন' নার্সিহোম?

—হ্যাঁ, বলুন।

—সিসটার মাধুরী সেনকে একবার দেবেন?

—ডাকছি।

—হ্যালো।

—মাধুরীদি, আমি অমৃতা, ডক্টর কার্লেকরকে একবার পাওয়া যাবে?

—উনি তো নেই! আসছেন না।

—সে কী! কেন? অসুস্থ?

—উনি নন। ওঁর স্ত্রী। গত পরশু বম্বে রওনা হয়ে গেছেন।

—কী হয়েছে?

—কী আর! দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ টেলিফোনের তার তোলপাড় করে এসে পৌঁছয়।

রিসিভারটা অসাড় হাত থেকে খসে যায়। তার বোধিসত্তা বলে—রম্ভা কার্লেকর ফিরবেন না। রঞ্জন, রঞ্জন কার্লেকরও ফিরবেন না আর। এখন আর প্রতীক্ষা নেই, এখন আর জানলা নেই। এখন সব অন্ধকার। শিথিল হাতে ভবিষ্যযাত্রার সরু পেনসিল-টর্চটা সে হাতে তুলে নেয়।